

দুর্যোগকোষ



খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি)

দুর্যোগকোষ Disaster Dictionary

পাণ্ডুলিপি রচনা
মুহাম্মদ সাইদুর রহমান
পরিচালক, বিডিপিসি

সম্পাদনা সমন্বয়
ড. এস এম মোর্শেদ
সিনিয়র প্রজেক্ট এক্সপার্ট
সিডিএমপি

প্রকাশক
সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি)
৯২-৯৩ মহাখালী, ঢাকা-১২১২
ফোন : ৯৮৯০৯৩৭, ৮৮২১২৫৫, ৮৮২১৪৫৯
ফ্যাক্স : ৯৮৯০৮৫৪, ইমেইল: info@cdmp.org.bd
www.cdmp.org.bd

প্রচ্ছদ
মাকসুদুর রহমান মিলন

প্রকাশকাল
জুলাই ২০০৯

মুদ্রণ
ম্যাস্-লাইন প্রিন্টার্স
১/১৫ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১২৫০৭৭, ৮১২৩৪৪৬
office@masslineprinters.com

কৃ ত জ্ঞ তা

(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

মোঃ আবদুল ওয়াজেদ যুগ্ম সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
মোঃ আবু সাদেক উপ সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
ড. আমিনুল ইসলাম এসিসট্যান্ট কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউএনডিপি
মনজু মোরশেদ ডেপুটি টিম লিডার, সৌহার্দ প্রোগ্রাম, কেয়ার বাংলাদেশ
তাপস রঞ্জন চক্রবর্তী পরিচালক, সিএনআরএস
জাকির হোসেন আকাশ প্রোগ্রাম অফিসার, বিডিপিসি
কাজী শহীদুর রহমান সমন্বয়ক, নিরাপদ
মোহাম্মদ আমিনুর রহমান শিক্ষক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সিএমই, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
নিতাই চন্দ্র দে সরকার সহকারী পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
ড. শান্তনা হালদার পরামর্শক, সিডিএমপি
আ ন ম ওয়াহিদুর রহমান পরামর্শক, সিডিএমপি
ড. শাহাদৎ হোসেন মাহমুদ পরামর্শক, সিডিএমপি
এ কে এম মামুনুর রশীদ পরামর্শক, সিডিএমপি
ওটিন দেওয়ান পরামর্শক, সিডিএমপি
শওকত ওসমান পরামর্শক, সিডিএমপি
মোহাম্মদ মহিউদ্দীন পরামর্শক, সিডিএমপি
ড. মাহমুদুল ইসলাম পরামর্শক, সিডিএমপি
ড. এস এম মাকসুদ কামাল পরামর্শক, সিডিএমপি
তাসদিক আহমদ, আইসিটি স্পেশালিষ্ট, সিডিএমপি
মোঃ শহিদুল ইসলাম পরামর্শক, সিডিএমপি
মোঃ মনোয়ার হোসেন পরামর্শক, সিডিএমপি
বিদ্যুৎ কুমার মহলদার পরামর্শক, সিডিএমপি
মোঃ তারিকুল ইসলাম কমিউনিকেশন অফিসার, ডিআরএফ, ইউএনডিপি
কায়েদ বিন ওয়াহিদ মনিটরিং এসিসটেন্ট, সিডিএমপি
শেখ বেলাল হোসেন টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট, সিডিএমপি
জাকির হোসেন গবেষক, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
এ কে এম শরীফুল হক গবেষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়



সম্পাদনায় যারা
সহযোগিতা
করেছেন

প্রাক্কথন

বাংলাদেশে উন্নয়ন অধ্যয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে তথ্যসেবা জোরদার করার অব্যাহত প্রয়াসের একটি ধারাবাহিক উদ্যোগ ‘দুর্যোগকোষ’ এর প্রকাশনা। প্রথম প্রয়াস হিসেবে এর নানামুখী সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশন ও সহজেবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন ‘দুর্যোগকোষ’-কে একটি নান্দনিক প্রকাশনায় উপনীত করেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কর্মরত বিশেষজ্ঞদের অনেকেই দুর্যোগকোষ রচনা ও সম্পাদনায় নানাভাবে সহায়তা করেছেন। বিশেষত কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) এর পরামর্শকগণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর কর্মকর্তাবৃন্দ এ কোষ রচনায় অবদান রেখেছেন। দেশের বাইরে কর্মরত কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কিছু বিষয়ে তথ্য, উপাত্ত দিয়ে এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করতে সহযোগিতা করেছেন যা আমাদেরকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদের অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এ প্রকাশনায় আর্থিক সহযোগিতা করেছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

দুর্যোগকোষ এর পাণ্ডুলিপি রচনার জন্য বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্র (বিডিপিসি) এর পরিচালক জনাব মুহাম্মদ সাইদুর রহমানকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

দুর্যোগকোষ এর বাংলা প্রকাশনার পাশাপাশি এ বছর এটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে পৃথকভাবে প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি এ প্রকাশনা পাঠককূলে সমাদৃত হবে।



মোঃ মোখলেছুর রহমান

সচিব

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

এবং

ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর

সিডিএমপি

অ ব ত র ণি কা

ভৌগোলিক অবস্থার কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বিভিন্ন কারণে দুর্যোগ আমাদের নিত্যসঙ্গী। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা, ভূমিকম্প প্রভৃতি দুর্যোগের সাথে লড়াই করেই আমাদের টিকে থাকতে হবে। আমরা দুর্যোগকে বন্ধ করতে পারব না কিন্তু পূর্ব প্রস্তুতির মাধ্যমে এর ঝুঁকি অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব। ফলে সম্পদ, প্রাণহানি ও আর্থসামাজিক ক্ষয়ক্ষতিও কমে আসবে। তাই আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। আর এজন্য এমন একটি গ্রন্থ প্রয়োজন যেখানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ থাকবে। মূলত এ প্রয়োজনবোধ থেকেই খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি)-এর আওতায় ‘দুর্যোগকোষ’ প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির একক দায়িত্ব নয়। এটি একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত বিষয়। তাই এ সামাজিক দায়িত্ব পালনে এবং জনগণের তথ্য চাহিদা পূরণে দুর্যোগকোষ সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

‘দুর্যোগকোষ’ এর শেষাংশে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার ওয়েব এড্রেস সন্নিবেশন করা হয়েছে যা ব্যাপকতর ও বিস্তৃত পরিসরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে ও জানাতে সহায়ক হবে এবং সর্বোপরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে।

‘দুর্যোগকোষ’ রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সবাইকে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।



মোঃ ফরহাদ উদ্দিন

মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
এবং
ডেপুটি প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর, সিডিএমপি

CONTENTS

সূ চি প ত্র

Acronyms	XXI
AFFORESTATION বনায়ন	৩৩
Agricultural Afforestation কৃষি বনায়ন	৩৩
Social Afforestation সামাজিক বনায়ন	৩৪
Community Afforestation সমাজভিত্তিক বনায়ন	৩৪
Homestead Afforestation বাড়ির আঙিনায় বনায়ন	৩৪
Deforestation বন উজাড়করণ	৩৫
ARSENIC আর্সেনিক	৩৬
Arsenic Contamination আর্সেনিক দূষণ	৩৬
Arsenicosis আর্সেনিকোসিস	৩৭
Melanosis মেলানোসিস	৩৭
Keratosiis কেরাটোসিস	৩৭
Final Symptoms of Arsenicosis রোগের সর্বশেষ স্তরের উপসর্গ	৩৮
Arsenic-prone Areas of Bangladesh বাংলাদেশের আর্সেনিকপ্রবণ এলাকাসমূহ	৩৮
BIODIVERSITY জীববৈচিত্র্য	৩৮
Biodiversity Extinction জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তি	৩৯
Biodiversity Preservation জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	৪০
Climate Change and Biodiversity জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য	৪১
Convention on Biodiversity জীববৈচিত্র্য-সংক্রান্ত সনদ	৪১
BUILDING CODE বিল্ডিং কোড	৪২
The Building Constructions Act-2006 ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৬	৪২
CLIMATE জলবায়ু	৪৩
Climate of Bangladesh বাংলাদেশের জলবায়ু	৪৩
Climate Change জলবায়ু পরিবর্তন	৪৪

Climate Change and Vulnerability of Bangladesh	
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের বিপদাপন্নতা	৪৪
Adaptation অভিযোজন	৪৫
Adaptation to Climate Change জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন	৪৫
Different Types of Adaptation বিভিন্ন ধরনের অভিযোজন	৪৬
Global Warming বৈশ্বিক উষ্ণায়ন	৪৬
Global Warming and Changes in Rainfall	
বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন	৪৬
United Nations Framework Convention on Climate Change	
জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর জাতিসংঘের কর্মকাঠামো সনদ	৪৭
National and International Initiative for Addressing	
Climate Change জলবায়ু পরিবর্তন : জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোগ	৪৮
Green House Gas গ্রিন হাউস গ্যাস	৪৮
Green House Effect গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া	৪৮
Atmospheric Pressure বায়ুমণ্ডলীয় চাপ	৪৯
National Adaptation Plan of Action জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা	৪৯
Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan	
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা	৫০
Atmospheric Pressure and Air Stream বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও বায়ুপ্রবাহ	৫০
Absolute Humidity চরম আর্দ্রতা	৫০
Arctic Wind কুমেরু বায়ু	৫০
Climatic Divide জলবায়ুর বিভাজিকা	৫০
Condensation ঘনীভবন	৫১
Climatic Region জলবায়ুর অঞ্চল	৫১
Cloud মেঘ	৫১
Cloudness মেঘাচ্ছন্নতা	৫১
Depression নিম্নচাপ	৫২
Dew শিশির	৫২
Dew Point শিশিরাত্মক	৫২
Evaporation বাষ্পীভবন	৫২
Evapo-transpiration বাষ্পীভবন-প্রস্রাবন	৫২
Fog কুয়াশা	৫২
Climate Factors জলবায়ুর নিয়ামকসমূহ	৫২

Gravity Winds অভিকর্ষ বায়ুপ্রবাহ	৫৩
Ground Water ভূগর্ভস্থ পানি	৫৩
Heat Balance তাপ সমতা	৫৩
Humidity আর্দ্রতা	৫৩
Relative Humidity আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৫৩
Hydraulic Erosion জলীয় ক্ষয়সাধন	৫৩
High Latitude উচ্চ অক্ষাংশ	৫৪
Horse Latitude অশ্ব-অক্ষাংশ	৫৪
Temperature of Bangladesh বাংলাদেশের তাপমাত্রা	৫৪
Irregular Winds অনিয়মিত বায়ু	৫৪
Snow তুষার	৫৫
Temperature Zone তাপমণ্ডল	৫৫
Torrid Zone উষ্ণমণ্ডল	৫৫
Thermal Anomaly তাপের বিচ্যুতি	৫৫
COAST উপকূল	৫৫
Coastline তটরেখা	৫৫
Beach সৈকত বা সমুদ্রতীর	৫৬
Coastal Erosion উপকূলীয় ভাঙন	৫৬
Offshore Island উপকূলবর্তী দ্বীপ	৫৬
Sea-level সমুদ্রপৃষ্ঠ	৫৬
Coastal Plain উপকূলীয় সমভূমি	৫৭
Bay of Bengal বঙ্গোপসাগর	৫৭
E-line ই-লাইন	৫৭
E-zone ই-জোন	৫৭
Bay উপসাগর	৫৭
COLD WAVE শৈত্যপ্রবাহ	৫৮
Causes of Cold Wave শৈত্যপ্রবাহের কারণসমূহ	৫৯
COMMUNITY সমাজ	৫৯
Community Volunteer সামাজিকভাবে স্বেচ্ছাসেবক	৬০
Community Action Plan (CAP) সামাজিকভাবে কর্মপরিকল্পনা	৬০
Community Based Disaster Coping Mechanism	
সামাজিকভাবে দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশল	৬০

Community Based Organizations সমাজভিত্তিক বা স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাসমূহ	৬১
Community Based Disaster Risk Reduction Fund	
সামাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস তহবিল	৬১
Community Based Disaster Risk Management	
সামাজভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৬২
COPING খাপ খাইয়ে নেয়া	৬২
Coping Capacity খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা	৬৩
Coping Mechanism খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল	৬৩
Coping Capacity at Family Level	
পারিবারিক পর্যায়ে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল	৬৪
Coping Capacity at Community level	
সমাজ পর্যায়ে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল	৬৪
COMMUNITY RISK ASSESSMENT (CRA)	
সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ	৬৪
Community Risk Reduction Planning সমাজভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা	৬৫
Implementation of CRA Method সিআরএ পদ্ধতির বাস্তবায়ন	৬৫
Participants of CRA সিআরএর অংশগ্রহণকারী	৬৬
Important Steps of CRA সিআরএর গুরুত্বপূর্ণ ধাপসমূহ	৬৬
Use of CRA সিআরএর ব্যবহার	৬৬
CONTINGENCY PLAN আপদকালীন পরিকল্পনা	৬৭
Basis of Contingency Planning আপদকালীন পরিকল্পনার ভিত্তি	৬৭
CYCLONE ঘূর্ণিঝড়	৭১
Causes of Cyclone ঘূর্ণিঝড়ের কারণসমূহ	৭২
Eye of Cyclone ঘূর্ণিঝড়ের চোখ	৭৩
Duration and Speed of Cyclone ঘূর্ণিঝড়ের স্থায়িত্ব ও গতি	৭৪
Tidalsurge জলোচ্ছ্বাস	৭৪
Cyclone Prone Areas in Bangladesh	
বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাসমূহ	৮১
Tropical Cyclone উষ্ণমণ্ডলীয় বা ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়	৮২

CYCLONE PREPAREDNESS PROGRAM (CPP)	
ঘূর্ণিঝড় পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি	৮২
Committee কমিটি	৮৪
Unit Committee ইউনিট কমিটি	৮৪
Union Committee ইউনিয়ন কমিটি	৮৪
Upazila Committee উপজেলা কমিটি	৮৪
Operational Method কার্যপ্রণালি	৮৪
Training of Volunteers স্বেচ্ছাকর্মীদের প্রশিক্ষণ	৮৫
Warning Equipment and Gears for Volunteers	
স্বেচ্ছাকর্মীদের সরঞ্জাম এবং সতর্কীকরণ যন্ত্রপাতি	৮৬
DISASTER দুর্যোগ	৮৬
Capacity সামর্থ্য	৮৬
Hazard আপদ	৮৭
Biological Hazard জৈবিক আপদ	৮৭
Geological Hazard ভূতাত্ত্বিক আপদ	৮৭
Hydro Meteorological Hazard	৮৭
Chronic Hazard তীব্র আপদ	৮৭
Technological Hazard প্রযুক্তিগত আপদ	৮৮
Hazard Analysis আপদ বিশ্লেষণ	৮৮
Hazard Mapping আপদ মানচিত্র	৮৮
Hazard Assesment আপদ নিরূপণ	৮৮
Vulnerability বিপদাপন্নতা	৮৮
Risk ঝুঁকি	৮৮
Steps of Disaster Management Activity দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধাপসমূহ	৮৯
Causes of Disaster দুর্যোগের কারণসমূহ	৮৯
Slow-Onset Disaster ধীর গতিসম্পন্ন দুর্যোগ	৮৯
Rapid-Onset Disaster দ্রুত গতিসম্পন্ন দুর্যোগ	৮৯
Disaster and Gender দুর্যোগ ঝুঁকিতে নারী-পুরুষের সমতা বিবেচনা	৯০
Disaster and Poverty দুর্যোগ ও দারিদ্র্য	৯০
DISASTER MANAGEMENT দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৯১
Elements of Disaster Management দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপাদানসমূহ	৯২
Comprehensive Disaster Management সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৯২

Disaster Management Model দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল	৯২
Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP)	
সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি)	৯৩
Disaster Risk Management দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৯৪
NATIONAL AND INTERNATIONAL DRIVERS OF DISASTER MANAGEMENT	
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চালিকাশক্তিসমূহ	৯৪
International Drivers আন্তর্জাতিক চালিকাশক্তিসমূহ	৯৪
United Nations Millennium Development Goals	
জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন কৌশলসমূহ	৯৪
World Conference on Disaster Reduction দুর্যোগ হ্রাসে বিশ্ব সম্মেলন	৯৫
International Strategy for Disaster Reduction	
দুর্যোগ হ্রাসে আন্তর্জাতিক কৌশল	৯৫
National Drivers জাতীয় চালিকাশক্তিসমূহ	৯৬
Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র	৯৬
Standing Orders on Disasters দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি	৯৬
National Plan for Disaster Management	
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জাতীয় কর্মপরিকল্পনা	৯৭
DISASTER MANAGEMENT COMMITTEE	
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	৯৭
National Disaster Management Council	
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল	৯৮
National Disaster Management Advisory Council	
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কাউন্সিল	৯৯
Interministerial Disaster Management Co-ordination Committee	
আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি	১০০
Ministry of Food and Disaster Management	
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	১০২
MoFDM Corporate Plan '05-09	
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের কর্পোরেট প্ল্যান '০৫-০৯	১০৪
Disaster Management Bureau দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	১০৫
Directorate of Relief and Rehabilitation ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর	১০৬

City Corporation Disaster Management Committee	
সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	১০৭
District Disaster Management Committee	
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	১০৭
Upazila (Subdistrict) Disaster Management Committee	
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	১০৯
Municipal Disaster Management Committee	
পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	১১২
Union Disaster Management Committee	
ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	১১৬
DISASTER PREPAREDNESS দুর্যোগ প্রস্তুতি	
Preparedness প্রস্তুতি	১১৯
Disaster Preparedness দুর্যোগ প্রস্তুতি	১১৯
Disaster Preparedness at Personal Level ব্যক্তি পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি	১২০
Disaster Preparedness at Family Level পারিবারিক পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি	১২০
Disaster Preparedness at Social Level সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি	১২১
Disaster Preparedness at Organizational Level	
সংগঠন পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি	১২১
Disaster Preparedness at Institutional Level	
প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি	১২১
DROUGHT খরা	
Causes of Drought খরার কারণসমূহ	১২২
Mitigation Measures প্রশমন পদক্ষেপসমূহ	১২৩
Drought Prone Areas in Bangladesh	
বাংলাদেশের খরাপ্রবণ এলাকাসমূহ	১২৪
EARTHQUAKE ভূমিকম্প	
Fault চ্যুতি	১২৫
Fault Plane চ্যুতি তল	১২৫
Richter Scale রিখটার স্কেল	১২৬
Focal Depth কেন্দ্রীয় গভীরতা	১২৬
Epicenter উপকেন্দ্র	১২৬
Seismograph ভূকম্পলেখ	১২৬

Seismogram সিসমোগ্রাম	১২৬
Seismic Wave ভূকম্পন ঢেউ	১২৬
Seismic Focus ভূকম্পন কেন্দ্র	১২৬
Mainshock মূল অভিঘাত	১২৬
Earthquake Hazard ভূকম্পনীয় আপদ	১২৭
Plate Tectonic প্লেট টেকটোনিক	১২৭
Earthquake Related Disasters ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগসমূহ	১২৮
Seismic Zone ভূকম্পন বলয়	১২৮
Earthquake Prone Regions ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাসমূহ	১২৮
Earthquake Risk in Bangladesh ভূমিকম্পে বাংলাদেশের ঝুঁকি	১২৯
Previous Record of Earthquake ভূমিকম্পের অতীত ইতিহাস	১২৯
Urban Volunteer for Earthquake Management	
ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনায় নগরভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল	১৩০
EMERGENCY RESPONSE জরুরি সাড়া	১৩০
Early Warning পূর্বসতর্কতা	১৩১
Evacuation স্থানান্তর করা	১৩২
Search and Rescue অনুসন্ধান ও উদ্ধার করা	১৩২
Need and Loss Assessment চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ	১৩২
Emergency Relief Activities জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম	১৩২
Emergency Medical Response জরুরি চিকিৎসা সহায়তা	১৩৩
Emergency Rehabilitation জরুরি পুনর্বাসন	১৩৩
Emergency Situation জরুরি অবস্থা	১৩৪
ENVIRONMENT পরিবেশ	১৩৫
Environmental Degredation পরিবেশ অবনয়ন	১৩৫
Environmental Planning and Management	
পরিবেশ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা	১৩৫
Environment and Development Planning পরিবেশ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা	১৩৬
Environmental Crisis পরিবেশগত সংকট	১৩৬
Environmental Impact Assessment (EIA) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ	১৩৬
Environment Law পরিবেশ আইন	১৩৬
FLOOD বন্যা/বান/প্লাবন	১৩৭
Flood Season বন্যার সময়কাল	১৩৭
Monsoon Flood মৌসুমি বন্যা	১৩৭

Flood Risk Management বন্যা-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	১৩৭
Dry Flood-Proofing	১৩৮
Wet Flood-Proofing	১৩৮
Flood Protection বন্যা প্রতিরক্ষা	১৩৮
Flood Control বন্যা নিয়ন্ত্রণ	১৩৮
Flash Flood আকস্মিক বন্যা	১৩৮
Flood Warning বন্যার সতর্কসংকেত	১৩৯
Flood Forecasting and Warning Centre	
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র	১৪০
Preparedness Activity বন্যার প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড	১৪০
Pre-flood Activity বন্যা-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড	১৪০
During-flood Activity বন্যাকালীন কর্মকাণ্ড	১৪১
Post-flood Activity বন্যা-পরবর্তী কর্মকাণ্ড	১৪১
Decisions of the workshops on 'Mitigation Measures to Reduce the	
Loss of Flood Risk in Bangladesh' 'বাংলাদেশে বন্যার ঝুঁকি এবং	
ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপায় বিষয়ক জাতীয় কর্মশালার সিদ্ধান্তসমূহ	১৪১
FIRE আগুন	১৪২
Causes of Fire অগ্নিকাণ্ডের কারণসমূহ	১৪২
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS	
ভৌগোলিক তথ্যব্যবস্থা	১৪৩
Use of GIS in Bangladesh বাংলাদেশে GIS-এর ব্যবহার	১৪৪
LAND ভূমি	১৪৪
Landslide ভূমিধস	১৪৪
Causes of Landslide ভূমিধসের কারণসমূহ	১৪৪
Land Degradation ভূমি অবনয়ন	১৪৫
Statue and Severity of Land Degradation	
ভূমি অবনয়নের পরিস্থিতি ও তীব্রতা	১৪৫
Causes of Land Degradation ভূমি অবনয়নের কারণসমূহ	১৪৬
Land Use ভূমি ব্যবহার	১৪৬
Land Use Planning ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা	১৪৬
Land Use Changes and Degradation	
ভূমি ব্যবহার-ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও অবনয়ন	১৪৬

PARTICIPATORY VULNERABILITY ASSESSMENT

অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা নিরূপণ ১৪৭

Participatory অংশগ্রহণমূলক ১৪৭

Participatory Vulnerability Assessment

অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ১৪৭

Areas of PVA অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রসমূহ ১৪৮

PVA Tools অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ উপকরণসমূহ ১৪৮

Focus Group Discussion (FGD)

কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দলীয় আলোচনা ১৪৯

Livelihood Matrix Tool লাইভলিহুড ম্যাট্রিক্স টুল ১৪৯

Institutional Mapping tool ইনস্টিটিউশনাল ম্যাপিং টুল ১৪৯

Risk and Resource Map ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র ১৫০

Seasonal Calendar ঋতুভিত্তিক পঞ্জিকা ১৫০

Social Mapping সামাজিক মানচিত্রায়ণ ১৫০

Transect Walk পরিভ্রমণ ১৫১

Time and Seasonal Calendar সময় ও ঋতু পঞ্জিকা ১৫১

POLLUTION দূষণ ১৫১

Environmental Pollution পরিবেশ দূষণ ১৫১

Reasons of Environmental Pollution পরিবেশ দূষণের কারণসমূহ ১৫২

Air Pollution বায়ুদূষণ ১৫৪

Source and Causes of Airpollution বায়ুদূষণের উৎস ও কারণসমূহ ১৫৪

Air Pollution Controlling Means বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ ১৫৫

Legal Means আইনসম্মত উপায় ১৫৫

Technological Means প্রযুক্তিগত উপায় ১৫৫

Personal Means ব্যক্তিগত উপায় ১৫৬

Water Pollution পানিদূষণ ১৫৬

Sound Pollution শব্দদূষণ ১৬০

Causes of Sound Pollution শব্দদূষণের কারণ ১৬১

Sea Pollution সমুদ্রদূষণ ১৬২

Industrial Pollution শিল্পদূষণ ১৬৩

Persistent Organic Pollutants (POPs) ১৬৩

Soil Pollution মাটিদূষণ ১৬৪

Radiation Pollution তেজস্ক্রিয়তা দূষণ ১৬৪

HSU-Hartridge Smoke Unit এইচএসইউ ১৬৫

RAINFALL বৃষ্টিপাত ১৬৫

Artificial Rainfall কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ১৬৬

Conventional Rainfall পরিচলন বৃষ্টিপাত ১৬৬

Hailstorm শিলাবৃষ্টি ১৬৬

RIVER নদী ১৬৭

Tributary উপনদী ১৬৭

Superimposed River আরোপিত নদী ১৬৭

Confluence নদীসঙ্গম ১৬৭

Wadi পাথুরে নদী খাত ১৬৭

River Terrace নদী সোপান ১৬৮

Levee বন্যা প্রতিরোধী বাঁধ ১৬৮

Rapids নদীপ্রপাত ১৬৮

River Bank নদীতট ১৬৮

River Basin নদী অববাহিকা ১৬৮

River Bed নদীগর্ভ বা নদীতল ১৬৮

River Capture নদী গ্রাস ১৬৮

Rills ক্ষুদ্র নালা ১৬৯

Sandy Land চর ১৬৯

Cusec কিউসেক ১৬৯

Course নদীর গতিপথ ১৬৯

Cut-off ছিন্নবাক ১৬৯

Cataract খাড়া জলপ্রপাত ১৬৯

Wetland জলাভূমি ১৭০

RISK ঝুঁকি ১৭২

Risk at Different Sectors বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঝুঁকিসমূহ ১৭৩

Risk Assessment Model ঝুঁকি নিরূপণ মডেল ১৭৩

Risk Environment Management ঝুঁকির পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ১৭৪

Elements of Risk Environment Management ১৭৪

ঝুঁকির পরিবেশ ব্যবস্থাপনা করার উপাদানসমূহ ১৭৪

Risk Reduction Plan ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা	১৭৫
Risk Avoidance ঝুঁকি এড়ানো	১৭৬
Risk Removal ঝুঁকি দূর করা	১৭৬
Risk Reduction ঝুঁকি হ্রাস করা	১৭৬
Risk Transfer বিপদ/ঝুঁকি স্থানান্তর	১৭৭
Risk Management ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	১৭৭
RIVER BANK EROSION নদীভাঙন	১৭৭
Causes of River Bank Erosion নদীভাঙনের কারণ	১৭৯
Human Induced Causes for River Bank Erosion	
নদীভাঙনের মানবসৃষ্ট কারণসমূহ	১৭৯
Preparedness Activities to Cope with River Bank Erosion	
সম্ভাব্য নদীভাঙন মোকাবেলায় প্রস্তুতিসমূহ	১৭৯
SEASON ঋতু	১৮০
Summer গ্রীষ্মকাল	১৮১
Rainy Season বর্ষাকাল	১৮১
Autumn শরৎকাল	১৮১
Late Autumn হেমন্তকাল	১৮২
Winter শীতকাল	১৮২
Spring বসন্তকাল	১৮২
TORNADO টর্নেডো	১৮৩
Causes of Tornado টর্নেডোর কারণ	১৮৩
Duration of Tornado টর্নেডোর স্থায়িত্ব	১৮৩
Sound of Tornado টর্নেডোর শব্দ	১৮৪
Effects of Tornado টর্নেডোর প্রভাব	১৮৪
Preparedness প্রস্তুতি	১৮৪
Nor-wester কালবৈশাখী	১৮৪
Tsunami সুনামি	১৮৬
Recent Tsunami Incidents সাম্প্রতিককালের ভয়ঙ্কর সুনামি	১৮৬
Tsunami and Bangladesh সুনামি ও বাংলাদেশ	১৮৭
DISASTER RELATED OTHER WORDS	১৮৮
Advocacy অধিপরামর্শ	১৮৮
Agenda 21 এজেন্ডা ২১	১৮৮

Barrage বাঁধ	১৮৯
Beneficiary উপকারভোগী	১৮৯
Capacity সক্ষমতা	১৮৯
Change Agent চেইঞ্জ এজেন্ট	১৮৯
Evaluation মূল্যায়ন	১৯০
El-Nino এল-নিনো	১৯০
Embankment বেড়িবাঁধ	১৯০
Empowerment ক্ষমতায়ন	১৯১
Ecosystem প্রতিবেশ	১৯১
Famine দুর্ভিক্ষ	১৯১
Thunderstorms বজ্রঝড়	১৯২
Global Warming বৈশ্বিক উষ্ণায়ন	১৯২
HIV/AIDS এইচআইভি/এইডস	১৯৩
Hot Spring উষ্ণ প্রস্রবণ	১৯৩
Lanina ঠাণ্ডা বাতাস	১৯৩
Lithosphere অশ্বমণ্ডল	১৯৪
Latitude অক্ষাংশ	১৯৪
Marshland বিল	১৯৪
Monsoon মৌসুমি বায়ু	১৯৫
Mock or Simulation মক বা মহড়া	১৯৬
Poverty দারিদ্র্য	১৯৬
Region অঞ্চল	১৯৭
Mainstreaming মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ	১৯৮
Benefit of Mainstreaming Risk Reduction	
ঝুঁকি হ্রাসকে মূলধারায় সঙ্গে সম্পৃক্ত করার সুবিধাসমূহ	১৯৮
Mist কুজ্জটিকা	১৯৮
Micro-climate ক্ষুদ্রাঞ্চলীয় জলবায়ু	১৯৮
North Hemisphere উত্তর গোলার্ধ	১৯৮
Negative Land অনন্বীতমূলক ভূমি	১৯৯
Ozone Layer ওজোন স্তর	১৯৯
Public Awareness জনসচেতনতা	১৯৯
Emergency Response জরুরি সাড়া	১৯৯
Code of Conduct for Relief Operation ত্রাণ কাজের আচরণ বিধি	১৯৯
Sustainable Development টেকসই উন্নয়ন	২০০

Salinity লবণাক্ততা	২০০
Tides জোয়ার	২০১
Volcanic Bomb আগ্নেয় গোলক	২০১
Volcanic Neek আগ্নেয় গ্রীবা	২০১
Great Firey Ring আগ্নেয় মেখলা	২০১
Igneous Rock আগ্নেয় শিলা	২০১
Vulnerability বিপদাপন্নতা	২০১
Vulnerable Group Development (VGD) ভিজিডি	২০২
Water Balance জলস্থিতি	২০২
Waterfall জলপ্রপাত	২০৩
Weather আবহাওয়া	২০৩
Wild Fire দাবানল	২০৩
Work Plan কর্মপরিকল্পনা	২০৪
Hoar হাওর	২০৪

MAJOR DISASTER EVENTS IN BANGLADESH

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য দুর্যোগের তথ্যসমূহ	২০৫
Cyclone ঘূর্ণিঝড়	২০৫
Flood বন্যা	২১০
Drought খরা	২১২
Landslides ভূমিধস	২১৩

DISASTER MANAGEMENT WEBSITES

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট	২১৪
---	-----

REFERENCE

তথ্যসূত্র	২১৭
-----------	-----

ACRONYMS

ADAB	Association of Development Agencies in Bangladesh
ADB	Asian Development Bank
ADP	Annual Development Program
ADPC	Asian Disaster Preparedness Center
ADRC	Asian Disaster Reduction Center
ADRRN	Asian Disaster Reduction and Response Network
AEGDM	Asian Experts Group on Disaster Management
AFD	Armed Forces Division
AGMP	Agriculture Meteorology Program
APD	Academy for Planning and Development
ALITE	Augmented Logistic Intervention Team for Emergencies
ARPDM	ASEAN Regional Program on Disaster Management
ART	Alternative Risk Transfer
ASEAN	Association of South East Asian Nations
AUDMP	Asian Urban Disaster Mitigation Program, ADPC, Thailand
AUSAID	Australian Government Aid
Aus DIN	Australian Disaster Information Network
BARD	Bangladesh Academy for Rural Development
BANBEIS	Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BCS	Bangladesh Civil Service
BCAS	Bangladesh Centre for Advanced Studies
BCC	Behavioral Change Communication
BCHEPR	Bangladesh Center for Health Emergency Preparedness and Response
BDPC	Bangladesh Disaster Preparedness Centre
HRC	Hazard Research Centre
BFSCD	Bangladesh Fire Service and Civil Defence
BFE	Brahmaputra Flood Embankment

BFWMS	Bangladesh Flood and Water Management Strategy
BGS	British Geological Survey
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies
BIMSTEC	Bengal Initiative for Multi-sector Technical and Economic Cooperation
BIWTA	Bangladesh Inland Water Transport Authority
BMA	Bangladesh Medical Association
BMA	Bangladesh Military Academy
BMD	Bangladesh Meteorological Department
BNBC	Bangladesh National Building Code
BNCC	Bangladesh National Cadet Core
BNDV	Bangladesh National Disaster Volunteers
BPATC	Bangladesh Public Administration Training Centre
BPDB	Bangladesh Power Development Board
BPKS	Bangladesh Pratibondhi Kolyan Somity
BR	Bangladesh Railway
BRE	Brahmaputra Right Embankment
BS	Bangladesh Scouts
BUET	Bangladesh University of Engineering and Technology
BUP	Bangladesh Unnoyon Parishad
BWDB	Bangladesh Water Development Board
BWP	Bangladesh Water Partnership
CAMI	Central American Mitigation Initiative
CARDIN	Caribbean Disaster Information Network
CARE	Cooperation for Assistance and Relief Everywhere
CAT	Catastrophe Bonds
CATEX	Catastrophic Risk Exchange
CBDRM	Community Based Disaster Risk Management
CBO	Community Based Organization
CBRI	Central Building Research Institute, India
CCA	Common Country Assessment
CCC	Climate Change Cell
CCOP	Coordination Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programmes in East and Southeast Asia, Thailand
CCP	Cluster Cities Project

CLCSSR	Community Level Collapsed Structure, Search and Rescue
CCDMC	City Corporation Disaster Management Committee
CDA	Chittagong Development Authority
CDM	Clean Development Mechanism
CDMP	Comprehensive Disaster Management Program
CDRN	Citizen's Disaster Response Network, Philippines
CEGIS	Centre for Environmental Geographic Information Services
CEOS	Committee on Earth Observation Satellites
CEP	Coastal Embankment Project
CEPR	Centre Europeen de Prevention des Risques (European Center for Risk Mitigation), France
CEPT	Center for Environmental Planning and Technology, India
CESE	Centre for Environmental Science and Engineering
CFAB	Climate Forecasting Application in Bangladesh
CFIS	Community-Based Flood Information System
CGIAR	Consultative Group for International Agricultural Research
CGMW	Commission for the Geographical Map of the World
CHT	Chittagong Hill Tracts
CIDA	Canadian International Development Agency
CIRDAP	Centre for Integrated Rural Development for Asia and the Pacific
CIS	Commonwealth of Independent States
CMEPC	Civil Military Emergency Planning Council
CMI	Census of Manufacturing Industries
CMSD	Central Medical Stores Department
CNC	Community Nutrition Centers
CNRS	Center for Natural Resource Studies
CNOR	Corporate Network for Disaster Reduction
CNHAP	Canadian Natural Hazards Assessment Project
COEN	Committee for National Emergency
COMPASS	Comparability of Technological Risk Assessment Methodologies
CONREO	National Coordinator for Disaster Reduction
COP	Conference of Parties
COPUOS	United Nations Committee for Peaceful Use of Outer Space
CPP	Cyclone Preparedness Programme
CPP	Compartmentalization Pilot Project

CPPIB	Cyclone Preparedness Program Implementation Board
CRA	Community Risk Assessment
CS	Civil Surgeon
CSC	Coastal Service Centre, NOAA, USA
CSD	Commission for Sustainable Development
CSDC	Countries in Special Development Situations
CSDDWS	Committee for Speedy Dissemination of Disaster Related Warning Signals
D&SCRN	Disaster and Social Crises Research Network
DAE	Directorate of Agricultural Extension
DANA	Damage and Needs Assessment
DCC	Dhaka City Corporation
DDMC	District Disaster Management Committee
DDMP	District Disaster Management Plan
DEM	Digital Elevation Model
DEPI	Division for Environment Policy Implementation
DESA	Dhaka Electric Supply Authority
DEWA	Division for Early Warning and Assessment
DFID	Department for International Development, UK
DGOF	Director General of Food
DHA	Department of Humanitarian Affairs
DHI	Danish Hydraulic Institute
DIAB	Dubai International Award for Best Practices to Improve the Living Environment
DIFP	Dhaka Integrated Flood Protection
DIFPP	Dhaka Integrated Flood Protection Project
DIPECHO	Disaster Preparedness. European Commission's Humanitarian Office
DIRA	Disaster Impact and Risk Assessment
DIT	Dhaka Improvement Trust
DMAIUDP	Dhaka Metropolitan Area Integrated Urban Development Project
DMB	Disaster Management Bureau
DMC	Disaster Management Committee
DMDP	Dhaka Metropolitan Development Planning
DMIC	Disaster Management Information Center, Bangladesh
DMIN	Disaster Management Information Network
DMIS	Disaster Management Information System

DMT	Disaster Management Team
DNA	Designated National Authority
DND	Demra Narayangonj Dam
DoE	Department of Environment
DoF	Department of Fisheries
DoF	Department of Forest
DPE	Department of Primary Education
DPHE	Department of Public Health Engineering
DPPI	Disaster Preparedness and Prevention Initiative
DPT	Diphtheria Pertussis Tetanus
DPP	Development Project Proforma
DRBA	Disaster Recovery Business Alliance
DRI	Disaster Risk Index
DRR	Directorate of Relief and Rehabilitation
DRR	Disaster Risk Reduction
DRF	Disaster Response Facility
DRRO	District Relief and Rehabilitation Officer
DRRP	Disaster Reduction and Recovery Program
DTCB	Dhaka Transport Coordination Board
DTW	Deep Tube Well
DUTP	Dhaka Urban Transport Project
DWASA	Dhaka Water Supply and Sewerage Authority
DWS	Disaster Warning System
ECHO	European Commissions Humanitarian Office
ECMWF	European Centre for Medium Range Weather Forecast
ECNEC	Executive Committee of National Economic Council
EGIS	Environmental and GIS Support Project
EIA	Environmental Impact Assessment
EMIN	Environmental Monitoring Information Network
ENSO	El Nino Southern Oscillation
EOC	Emergency Operation Center
EPR	Emergency Preparedness and Response
ERD	Economic Relations Division
ERS	Early Response System

FAP	Flood Action Plan
FBCCI	Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industries
FCD	Flood Control and Drainage
FCDI	Flood Control Drainage and Irrigation
FEJB	Forum of Environmental Journalists of Bangladesh
FF	Flood Forecast
FFE	Food for Education
FFW	Food for Works
FFWC	Flood Forecasting and Warning Centre
FFWS	Flood Forecasting and Warning System
FGD	Focus Group Discussion
FMM	Flood Management Model
FMRSP	Flood Management Research Support Project
FNB	Federation of NGOs in Bangladesh
FP	Facilitating Partner
FPCO	Flood Plan Coordination Organization
FPMLJ	Flood Planning and Monitoring Unit
FPOCG	Focal Point Operational Coordination Group
FRS	Flood Response System
FRSS	Fisheries Resources Survey System
FSMF	Fish Seed Multiplication Farm
GEF	Global Environment Facility
GF	Global Fund
GHG	Greenhouse Gas
GI	Galvanized Iron
GIS	Geographical Information System
GMS	Geo-stationary Metrological Satellite
GO	Government Organization
GoB	Government of Bangladesh
GPS	Global Telecommunication System
GR	Gratuitous Relief
GSB	Geological Survey of Bangladesh
HBRI	Housing and Building Research Institute
HFL	Highest Flood Level

HIES	Household Income and Expenditure Survey
ICDDR	International Centre for Diarrhoeal Diseases Research, Bangladesh
ICG	International Consultancy Group
ICID	International Commission on Irrigation and Drainage
ICT	Information and Communication Technology
IDDR	International Day for Disaster Reduction
IDEAL	Intensive District Approach to Education for All
IDNDR	International Decade for Natural Disaster Reduction
IDRC	International Development Research Centre
IEDCR	Institute of Epidemiology, Diseases Control and Research
IFCDR	Institute of Flood Control and Drainage Research
IFPRI	International Food Policy Research Institute
IFRCRS	International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
IGA	Income Generating Activities
IIFC	Infrastructure Investment Facilitation Centre
IK	Indigenous Knowledge
ILRI	International Livestock Research Institute
IMD	Indian Metrological Department
IMDMCC	Inter-Ministerial Disaster Management Coordination Committee
IMF	International Monetary Fund
INSAT	Indian Geostationary Multi-function Satellite
IWM	Institute of Water Modeling
INSARAG	International Search and Rescue Advisory Group
IPCC	Intergovernmental Panel for Climate Change
IPH	Institute of Public Health
IPHN	Institute of Public Health Nutrition
ISDR	International Strategy for Disaster Reduction
ISP	Internet Service Provider
IT	Information Technology
IUGG	International Union of Geophysics and Geodesy
IWRM	Integrated Water Resources Management
JICA	Japan International Cooperation Agency
JRC	Joint River Commission
KDA	Khulna Development Authority

LDC	Least Development Countries
LDRRF	Local Disaster Risk Reduction Fund
LG	Local Government
LGD	Local Government Division
LGED	Local Government Engineering Department
LGI	Local Government Institute
LGO	Local Government Organization
LGRD	Local Government and Rural Development
LGRD & C	Local Government, Rural Development and Cooperatives
LLP	Low Lift Pump
LSD	Local Supply Department
LW	Low Water
M&PDC	Malaria & Parasitic Disease Control
MCM	Million Cubic Meter
MDG	Millennium Development Goals
MDIP	Meghna Dhanagota Irrigation Project
MEMR	Ministry of Energy of Mineral Resources
MIDAS	Micro-Industries Development and Assistance Service
MIS	Management Information System
MISM	Management Information System and Monitoring
MLGRD&C	Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives
MoA	Ministry of Agriculture
MoD	Ministry of Defence
MODS	Maintenance, Operations, Distribution and Services
MoEF	Ministry of Environment and Forests
MoFDM	Ministry of Food and Disaster Management
MoFL	Ministry of Fisheries and Livestock
MoHFW	Ministry of Health and Family Welfare
MoPME	Ministry of Primary and Mass Education
MOU	Memorandum of Understanding
MoWCA	Ministry of Women and Children Affairs
MoWR	Ministry of Water Resources
MP	Member of Parliament
MSL	Mean Sea Level

MSMEs	Micro, Small and Medium Enterprises
MT	Metric Ton
NAPA	National Action Plan for Adaptation
NCA	Net Cultivable Area
NCS	National Conservation Strategy
NDMC	National Disaster Management Council
NDMTI	National Disaster Management Training Institute
NDSC	National Disaster Surveillance Centre
NE	North East
NFL	Normal Flood Level
NGO	Non-Government Organization
NGOCC	NGO Co-ordination Committee
NIPSOM	National Institute of Preventive and Social Medicine
NMCC	National Metrological Communication Centre
NNIP	Narayanganj-Norsingdi Irrigation Project
NNP	National Nutrition Program
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration
NORP	National Oral Rehydration Projects
NTU	Natural Temperature Unit
NW	North West
NWMP	National Water Management Plan
NWMPP	National Water Management Plan Project
NWP	National Water Plan
NWP	National Water Policy
NWRC	National Water Research Centre
NWRD	National Water Resources Database
NIDM	National Institute of Disaster Management
O&M	Operation and Maintenance
ODA	Overseas Development Assistance
OMS	Open Market Sale
OPV	Oral Polio Vaccine
ORS	Oral Rehydration Solution
PAP	Public Awareness program
PAPR	Partnership Agreement on Poverty Reduction

PBSs	Palli Biddut Samities
PCP	Project Concept Paper
PEAP	Poverty Eradication Strategic Action Plan
PEP	Production and Employment Programme
PFDS	Public Food Distribution System
PIC	Project Implementation Committee
PIRDP	Pabna Irrigation Rural Development Project
PLA	Participatory Learning Action
PMD	Pakistan Meteorological Department
PMIS	Program Management Information System
PMOE	Participatory Monitoring and Ongoing Evolution
PNGO	Partner Non Government Organisations
PPR	Public Procurement Regulation
PPWS&H	Physical Planning, Water Supply and Housing
PRA	Participatory Rural Appraisal
PRSP	Poverty Reduction Strategy Paper
PSF	Pond Sand Filter
PSPMP	Primary School Performance Monitoring Project
PVCA	Participatory Vulnerability and Capacity Assessment
PWD	Public Works Department
PGDM	Post Graduate Program in Disaster Management (BRAC University Bangladesh)
QPF	Quantitative Precipitation Forecast
R&D	Research and Development
RADAR	Radio Detection and Ranging
RADARSAT	RADAR Satellite (developed by RADARSAT International in Canada)
RAJUK	Rajdhani Unnayan Katnipakhaya
RCC	Regional Consultative Committee
RD	Rural Development
RDA	Rural Development Authority
RDI	Rural Development Institutions
REB	Rural Electrification Board
RHD	Roads & Highways Department
RMG	Ready Made Garments
RRAP	Risk Reduction Action Plan
RS	Remote Sensing

RWP	Rural Works Programme
SAARC	South Asian Association for Regional Cooperation
SADIS	Satellite Display System
SARDI	SAARC Agriculture Research and Development Institute
SDC	Swiss Agency for Development and Cooperation
SEI	Socio-Economic Infrastructural Division
SFNTC	Social Forestry Nurseries and Training Centres
SFPC	Social Forestry Plantation Centres
SIDA	Swedish International Development Agency
SMRC	SAARC Metrological Rescareh Centre
SMS	Short Message Service
SOD	Standing Orders on Disasters
SOP	Standing Operating Procedure
SPARRSO	Space Research and Remote Sensing Organisation
SSB	Special Security Branch
SSDP	Support to the Strengthening Disaster Preparedness
STD	Subscribes Trunk Dialling
SWMC	Surface Water and Modeling Centre (now IWM)
SWSMP	Surface Water Simulation Modeling Program
TAP	Technical Assistance Project
TAPP	Technical Assistance Project Proforma
T&T	Telegraph and Telephone
TBA	Traditional Birth Attendant
TIP	Thana Irrigation Program
TOR	Term of Reference
TR	Test Relief
TT	Tetanus Toxoid
TTDC	Thana Training and Development Centres
UDMP	Union Disaster Management Plan
UHF	Ultra High Frequency
ULO	Upazila Livestock Officer
UNCED	United Nations Conference on Environment and Development
UNCHD	United Nations Conference on Human Development
UNCHS	United Nations Centre for Human Settlements-Habitat
UNDP	United Nations Development Programme
UNDRO	United Nations Disaster Relief Co-ordinator

UNEP	United Nations Environment Programme
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFCCC	United Nations Framework Convention of Climate Change
UNFPA	United Nations Population Fund
UNICEF	United Nations Children Fund
UNISDR	United Nations International Strategy for Disaster Reduction
UNO	Upazila Nirbahi Officer
UP	Union Parishad
UPI	Unit for Policy Implementation
UPL	University Press Limited
USAID	United States Agency for International Development
USF	Unclassified States Forest
UDMC	Union Disaster Management Committee
UDMC	Upazila Disaster Management Committee
VCA	Vulnerability and Capacity Assessment
VDP	Village Defence Party
VGd	Vulnerable Group Development
VGf	Vulnerable Group Feeding
WAP	Wireless Application Protocol
WAPDA	Water and Power Development Authority
WARPO	Water Resource Planning Organisation
WASA	Water and Sewerage Authority
WB	World Bank
WCED	World Commission on Environment and Development
WDPC	Word Disaster Preparedness Committee
WFP	World Food Programme
WHO	World Health Organization
WMO	World Meteorological Organization
WPS	Water Purifying Solution
WPT	Water Purifying Tablet
WPW	Works Programme Wing
WRP	Water Resources Planning
WRS	Water Resources System
WSS	Water Supply and Sanitation

AFFORESTATION বনায়ন



Afforestation বনায়ন

সাধারণত পতিত জমি, পাহাড়ি এলাকা, নদী ও রাস্তার পাড় প্রভৃতি এলাকায় বিভিন্ন ফলমূল ও অর্থকরী গাছ রোপণ করে বন সৃষ্টি করাকে বনায়ন বলে। অন্যভাবে বলা যায়, বিশ্বের প্রতিটি দেশে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে বৃক্ষ বা গাছপালার বহুমুখী গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিকল্পিত এবং সুবিন্যস্তভাবে বৃক্ষরোপণ করাকে বনায়ন বলে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে দেশের মোট ভূমির ২৫% বনভূমি থাকা আবশ্যিক। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ১৮% বনভূমি রয়েছে। তবে ২০১৫ সালের মধ্যে বনভূমির পরিমাণ ২০% করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

Agricultural Afforestation কৃষি বনায়ন

কৃষি বনায়ন হচ্ছে কৃষি ও বনের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে জমির ব্যবহার। এর প্রধান উদ্দেশ্য ফসলের সঙ্গে বৃক্ষ বা অনুরূপ কোনো দ্রুত বর্ধনশীল উদ্ভিদ জন্মানো। কৃষি বনায়ন উদ্যান, বন ও পশুপালন কার্যক্রমসহ বিভিন্ন ধরনের কৃষিকাজের জন্য একই জমির যুগপৎ ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল। কখনো কখনো এটা সামাজিক বনায়ন ও বসতবাড়ির বনায়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কৃষি বনায়নের ধারণা বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ছাড়াও কৃষি বনায়ন কোনো স্থানের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। খাদ্য সমস্যার সমাধান, মরুভূমিরোধ, গ্রামীণ ও শহরতলির প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন, বনসংরক্ষণ ও কর্মসংস্থান সম্পর্কিত জাতীয় সমস্যা নিরসনে একটি অর্থ-সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে এবং বিভিন্ন ভূমিস্তরের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের জন্যই কৃষি বনায়ন আবশ্যিক। কৃষি বনায়ন পদ্ধতি বনজ বৃক্ষ ও ফসল-উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির সুযোগ ঘটিয়ে প্রাকৃতিক স্থিতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। সম্প্রতি কৃষিজমির আশপাশে বিভিন্ন জাতের গাছ আরও অধিক পরিমাণে লাগানোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এজন্য নিবিড় গবেষণা শেষে কয়েকটি প্রজাতিকে নির্বাচন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বাবলা, খয়ের, নিম, খেজুর, কাঁঠাল, তাল ও আম প্রধান এবং শিমুল, নারিকেল, সুপারি, লিচু ও কয়েক ধরনের বাঁশও রয়েছে।

Social Afforestation সামাজিক বনায়ন

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের আর্থ-সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত বনায়ন কার্যক্রমকে সামাজিক বনায়ন বলে। সামাজিক বনায়নের লক্ষ্য ‘কেবল গাছ নয়, গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন।’ অর্থাৎ শুধু গাছ লাগানো এবং সেসব গাছের যত্ন নেয়ার জন্য নয়, বরং গাছ রোপণকারীরা যাতে রোপিত গাছের সুফল পাওয়ার আগ পর্যন্ত সসম্মানে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, তারও নিশ্চয়তা বিধান করা এই কার্যক্রমের একটি মহৎ উদ্দেশ্য। শিল্পভিত্তিক বৃহদায়তনের বনায়ন এবং শুধুমাত্র কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক উন্নয়ন-সহায়ক বনায়ন সামাজিক বনায়ন নয়, বরং গোষ্ঠীভিত্তিক বনায়নে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানকল্পে বনশিল্প ও সরকারি প্রচেষ্টায় পরিচালিত কর্মকাণ্ড সামাজিক বনায়নের অন্তর্ভুক্ত। দারিদ্র্য দূরীকরণে সামাজিক বনায়ন নানামুখী ভূমিকা রাখে। যেমন- অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন, জনগণের খাদ্যের যোগান, পশুখাদ্য যোগান, জ্বালানি উপকরণ সরবরাহ, কর্মসংস্থানের সুযোগ, যৌতুক ও বিবাহে সহায়তা, ওষুধশিল্পে সহায়তা, কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা, জরুরি সংকট মোকাবিলা, ঋণ পরিশোধ, শিক্ষার ব্যয়ভার মেটানো, গৃহনির্মাণ সামগ্রীর যোগান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে সহায়তা ইত্যাদি।

Community Afforestation সমাজভিত্তিক বনায়ন

সামাজিক বনায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল আলোচিত কর্মসূচি হলো সমাজভিত্তিক বনায়ন। এই কর্মসূচি প্রথম গ্রহণ করা হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের নিবিড় বনের একচেটিয়া নিধন প্রক্রিয়া থেকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য। সরকারি বন অধিদপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে কিছু অসৎ ঠিকাদার এবং স্থানীয় প্রভাবশালী মহল অবৈধ ও নির্বিচারে গাছ কাটা শুরু করে। ফলে সত্তরের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি প্রায় বিরান হয়ে যায়। বৃক্ষনিধনের এ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বিকল্প রোপণ কর্মসূচি প্রবর্তন করার লক্ষ্যেই স্থানীয় কৃষক সমিতির মাধ্যমে সমাজভিত্তিক বনায়ন কার্যক্রমের সূত্রপাত। শুরুতে বেতাগীর ১০১টি পরিবারকে পৃথক পৃথকভাবে ৩২ শতাংশ করে জমি বিনা মূল্যে দেয়া হয়। এ জমিতে বৃক্ষ রোপণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে এবং পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের জন্য কৃষি ব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে। পরবর্তীতে অন্যান্য সংস্থাও এ ধরনের কাজে সম্পৃক্ত হয়।

Homestead Afforestation বাড়ির আঙিনায় বনায়ন

সামাজিক বনায়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীবিভাগ হলো বাড়ির আঙিনার বনায়ন বা Homestead Afforestation। যেমন- ফুলের বাগান, ফলের বাগান ইত্যাদি। তাই বলা যায়, বাড়ির আঙিনায় যেসব গাছপালা

রোপণ করে সযত্নে লালন-পালন করা হয় তাকে Homestead Afforestation বলে। দারিদ্র্য দূরীকরণে এ বনায়ন সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে। দরিদ্র, বিশেষ করে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক চাহিদা মেটাতে বাড়ির আঙিনায় বনায়নের বিকল্প নেই।

Deforestation বন উজাড়করণ

গাছপালা কেটে ফেলা এবং বিরান হয়ে যাওয়া বনভূমি এলাকাগুলোর পুনরায় বনভূমি হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা না থাকাই হচ্ছে বনভূমি অবনয়ন বা বন উজাড়করণ। গাছ জন্মানোর ক্ষমতার চেয়ে অধিক বৃক্ষ কর্তনের ফলে বনভূমি হ্রাস পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বনভূমির গাছপালা কাটা হয়, কিন্তু বাংলাদেশে অবৈধভাবে বৃক্ষনিধনের ঘটনাও ঘটে। বন উজাড়করণ ও জলবায়ুর পরিবর্তন মরুত্বের প্রধান কারণ। বাংলাদেশে এই দুটি নিয়ামক বিদ্যমান থাকায় সমস্যাটি দিনে দিনে প্রকট হয়ে উঠছে।

শুষ্ক মৌসুমে উজানের দেশ কর্তৃক গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যায়। ফলে বাংলাদেশের সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মৃত্তিকার পানি উচ্চহারে নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং এর পরিণতিতে ওই অঞ্চল মরুত্বের প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত হয়। এই বিপর্যয় এড়ানোর জন্য দেশের অভ্যন্তরে পানি সঞ্চয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

মরুত্বের প্রক্রিয়ার প্রধান নিয়ামক ও কারণসমূহ জৈব, ভৌত, আর্থ-সামাজিক

এবং ঐতিহাসিক বিষয়াদির ভিত্তির ওপর নিহিত। ভূমিরূপ যা মৃত্তিকাক্ষয় প্রক্রিয়া, পানিসাম্য পরিবর্তন, পানিসম্পদের অধিক ব্যবহার, কৃষিকাজের নিবিড়করণ, জনসংখ্যার চাপ, নগরায়ণ ও শিল্প সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়কে আনুকূল্য প্রদান করে ভূমির অবনয়ন ঘটায়। ধাপে ধাপে ভূমি অবক্ষয় প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে মরুত্বের প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে এবং ধাপগুলো সাধারণত নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণে হয়ে থাকে-

- মৃত্তিকায় গাছপালার আচ্ছাদন ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়া
- মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া
- মৃত্তিকা সংযুক্তির বিকীর্ণণ ও মৃত্তিকাপৃষ্ঠ বন্ধ হয়ে যাওয়া
- পৃষ্ঠ গড়ানো পানি ও মৃত্তিকা বস্তুর স্থানান্তর
- মৃত্তিকা অবনয়নের চূড়ান্ত পর্যায় তথা মরুত্বের প্রক্রিয়া

বর্তমান কালের মরুত্বের প্রক্রিয়ার অধিকাংশই সাম্প্রতিক বা দূরবর্তী সময়কালের ঐতিহাসিক ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট। এসব নিয়ামক ও কারণসমূহ বিভিন্ন স্থানিক (Spatial) ও কালিক (Temporal) প্রেক্ষাপটে মরুত্বের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াসমূহকে প্রভাবিত করে। স্থানভেদে মরুত্বের প্রক্রিয়ার হারে ভিন্নতা ঘটে। প্রধানত বৃষ্টিপাত এবং জৈব-জলবায়ুগত স্থিতিমাপসহ জলবায়ুর পার্থক্য এবং পরিবেশের ওপর মানুষের ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডের তীব্রতার পার্থক্যের কারণে মরুত্বের প্রক্রিয়াও স্থানভেদে ভিন্ন তথা কমবেশি হয়ে থাকে।

ARSENIC আর্সেনিক



Arsenic আর্সেনিক

আর্সেনিক হলো এক ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ। আর্সেনিক সব সময়ই কোনো না কোনো পদার্থের সঙ্গে যৌগরূপে বিরাজ করে। একদিকে অক্সিজেন, গন্ধক, ক্লোরিন, কার্বন ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে এবং অন্যদিকে সিসা, পারদ, সোনা ও লোহার সঙ্গে যৌগরূপে আর্সেনিক অবস্থান করে। প্রকৃতির প্রায় সর্বত্রই, যেমন— মাটি, পানি, বাতাস, সামুদ্রিক মাছ, খাদ্যশস্য, শাক-সবজি ইত্যাদিতে বিভিন্ন মাত্রায় আর্সেনিক থাকে। কঠিন অবস্থায় এর বর্ণ সাদা বা হালকা ধূসর বর্ণের হয় এবং খুব সামান্য রসুনের গন্ধ থাকে। কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় আর্সেনিকের কোনো বর্ণ, গন্ধ বা স্বাদ থাকে না।

Arsenic Contamination আর্সেনিক দূষণ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুযায়ী খাওয়ার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা হলো প্রতি লিটারে ০.০১ মিলিগ্রাম। বাংলাদেশের জন্য আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা ধারা হয়েছে ০.০৫ মিলিগ্রাম। প্রত্যেক দেশ নিজ নিজ দেশের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করে থাকে। আর্সেনিক যখন নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি হয় তখন তাকে আর্সেনিক দূষণ বলে।

বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মতের একটি মত হচ্ছে পানিতে আর্সেনিক দূষণের প্রধান কারণ অধিক মাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন। প্রাকৃতিকভাবে আর্সেনিক আকরিক হিসেবে অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং তা বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে মুক্ত হয়ে পানিতে মিশে যায়। অতিমাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। যার ফলে মাটির কণার ক্ষুদ্র গহ্বরগুলোতে যে ফাঁকা স্থানের সৃষ্টি হচ্ছে সেই ফাঁকা স্থানকে দখল করছে বায়ু। বায়ু প্রবেশের ফলে ওই স্তরে সঞ্চিত আর্সেনোপাইরাইট এবং আর্সেনিকযুক্ত পাইরাইট বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে আর্সেনিককে ভূগর্ভস্থ পানিতে মিশিয়ে দিচ্ছে। আরেকটি মত হচ্ছে, শিল্প-কারখানাগুলোর বর্জ্য পদার্থের মাঝে আর্সেনিক আছে এবং আমাদের দেশে নদীতে ওই বর্জ্য নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে। ফলে ওই পানির মাধ্যমেও আর্সেনিকের সংক্রমণ ঘটেতে পারে।

Arsenicosis আর্সেনিকোসিস

পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন এবং অদাহ্য গুণাবলির জন্য আর্সেনিক সহজেই খাদ্য ও পানীয় এর সাথে মানব-শরীরে প্রবেশ করতে পারে। আর্সেনিকের প্রভাবে মানবদেহে সৃষ্ট ক্ষত থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। বায়ু আর্সেনিক দ্বারা দূষিত হলে বাতাসের মাধ্যমে মানবদেহে আর্সেনিক দূষণ ঘটে। সাধারণত এই বায়ুদূষণ ঘটে কলকারখানা এলাকায়, যেখানে কাঁচামাল হিসেবে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক কারণে খাদ্যের মাধ্যমে, যেমন— শাকসবজি, জলজ উদ্ভিদ বা সামুদ্রিক মাছ, ইত্যাদি খাবারের মাধ্যমে আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করতে পারে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ খাদ্যের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ০.০২৫ মিলিগ্রাম থেকে ০.০৫ মিলিগ্রাম আর্সেনিক গ্রহণ করতে পারে। তবে এই জৈব আর্সেনিক মানুষের শরীরে প্রবেশের পর প্রধানত মূত্রপথে বেরিয়ে যায়। ফলে খাদ্যদ্রব্য থেকে গৃহীত জৈব আর্সেনিক মানুষের শরীরে সাধারণত কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক অনেক দিন গ্রহণ করলে বিভিন্ন কলাতন্ত্রে জমা হতে হতে যখন সহনীয় মাত্রা অতিক্রম করে তখন শরীরে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়।

সাধারণত একজন স্বাভাবিক পুষ্টিমান-সম্পন্ন মানুষ আর্সেনিক-দূষিত পানি পান করতে আরম্ভ করার পর ৮ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে তার শরীরের ত্বকে রোগের লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে। এই দূষণের কারণ যদি খাবার পানি হয়, তাহলে

আর্সেনিকের পরিমাণ, ব্যক্তির শারীরিক পুষ্টির মান, অভ্যস্তরীণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং কত দিন ধরে আর্সেনিক-দূষিত পানি পান করছেন, ইত্যাদির ওপর রোগের লক্ষণ প্রকাশের কাল নির্ভর করবে। সহনীয় মাত্রার অধিক আর্সেনিক দীর্ঘদিন ধরে মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে মানব-শরীরে যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় তাকে ‘আর্সেনিকোসিস’ রোগ বলে। তিনটি স্তরে রোগের উপসর্গ প্রকাশ পায়।

Melanosis মেলানোসিস

এটি আর্সেনিকোসিস রোগের প্রথম উপসর্গ। এতে আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বকের স্বাভাবিক রং বদলে ক্রমশ কালচে হয়ে যায়। প্রথমে হাত ও পায়ে এবং পরে সমস্ত শরীরে পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনকে ‘ডিফিউজ মেলানোসিস’ বলা হয়। আর যদি ত্বকে ছোট ছোট সাদা-কালো দাগ দেখা যায়, তবে তাকে ‘স্পটেড মেলানোসিস’ বলে।

Keratosis কেরাটোসিস

এটি আর্সেনিকোসিস রোগের দ্বিতীয় স্তরের উপসর্গ। এতে হাত ও পায়ের তালু ক্রমশ কঠিন হয়ে যেতে থাকে। হাত ও পায়ের তালু শক্ত হয়ে যাওয়াকে ‘ডিফিউজ কেরাটোসিস’ বলে। এই সময়ে অনেক রোগীর শরীরে আঁচিলের মতো শক্ত গোটা দেখা দেয়। এই ধরনের গোটাকে ‘স্পটেড কেরাটোসিস’ বলা হয়। এই অবস্থায় ব্যথা বা চুলকানি অনুভূত না হলেও ধীরে ধীরে তালুতে ঘা দেখা দেয়।

Final Symptoms of Arsenicosis

রোগের সর্বশেষ স্তরের উপসর্গ

আর্সেনিকোসিস রোগের ফলে হাত-পায়ের পচন এবং শেষ পর্যন্ত ত্বকের ক্যান্সার দেখা দেয়। আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ফলে মানব-শরীরে ক্ষুদ্র রক্তনালিতে ক্ষত সৃষ্টি হয়। এই ক্ষতের কারণে হাত-পায়ে ঘা অথবা পচন দেখা দিতে পারে। এ ছাড়াও শারীরিক দুর্বলতা, অরুচি, রোদে চোখমুখ জ্বালাপোড়া করা, বেশি গরম অনুভব, দীর্ঘমেয়াদি কাশি, ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

Arsenic-prone Areas of Bangladesh

বাংলাদেশের আর্সেনিকপ্রবণ এলাকাসমূহ

বাংলাদেশের নলকূপগুলোতে আর্সেনিকের মাত্রা এবং সহনসীমা অতিক্রমকারী নলকূপের বস্তুনিষ্ঠ্যসিদ্ধি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম। কিছু অঞ্চলে শতভাগ নমুনাতেই এই সীমা অতিক্রম ধরা পড়েছে, আবার কোনো কোনো অঞ্চলে একেবারেই অতিক্রম করেনি। সর্বোচ্চ দূষণযুক্ত জেলাগুলো হচ্ছে চাঁদপুর (৯০%), মুন্সিগঞ্জ (৮৩%), গোপালগঞ্জ (৭৯%), মাদারীপুর (৬৯%), নোয়াখালী ৬৯%), সাতক্ষীরা (৬৭%), কুমিল্লা (৬৫%), ফরিদপুর (৬৫%), শরীয়তপুর (৬৫%), মেহেরপুর (৬০%) ও বাগেরহাট (৬০%)। সবচেয়ে কম দূষণযুক্ত জেলাগুলো হচ্ছে ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, নাটোর, লালমনিরহাট, পটুয়াখালী ও বরগুনা। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অর্ধেক অংশই আর্সেনিক-দূষণযুক্ত, কিন্তু উত্তর-পূর্বে সামান্য কয়েকটি এলাকাতে দূষণের ঘটনা জানা গেছে।

BIODIVERSITY

জীববৈচিত্র্য



Biodiversity

জীববৈচিত্র্য

উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবসহ গোটা জীবসম্ভার, তাদের অন্তর্গত জিন ও সেগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্রকে Biodiversity (জীববৈচিত্র্য) বলে। বস্তুত ক্রমবিবর্তন এবং পৃথিবীতে জীবের বিকাশ লাভের ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। জীববৈচিত্র্য প্রজাতি বিলুপ্তি ঠেকাতে সহায়তা যোগায়, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে। জীববৈচিত্র্যের একটি মৌলিক উপাদান হলো ‘মানব প্রজাতি’। অন্যান্য উপাদানের মতো প্রাকৃতিক উপায়ে মানব প্রজাতিরও অভিযোজন ঘটেছে। এই মানব প্রজাতি তার নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে জীববৈচিত্র্যের অন্যান্য প্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব বা উপযোগিতা বুঝতে জীববৈচিত্র্যের উৎস থেকে উৎপাদিত মানুষের কয়েকটি

গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় উপাদান ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন,

খাদ্যশস্য : বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ২৫০ হাজার সপুষ্পক উদ্ভিদ রয়েছে। এর মধ্যে কয়েক হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ প্রত্যক্ষভাবে মানুষের, গৃহপালিত পশুপাখি এবং খামারজাত প্রাণীর খাদ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার সকল গৃহপালিত পশু এবং খামারজাত প্রাণী কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যও মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আনুমানিক ২০০টি উদ্ভিদ প্রজাতি ‘খাদ্য উদ্ভিদ’ হিসেবে চাষাবাদ করা হয় এবং এই ২০০টির মধ্যে ১৫-২০টি প্রজাতির বিশেষ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

কাঠ : যেসব বস্তু মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক এবং বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিকৃত তার মধ্যে কাঠ উল্লেখযোগ্য। কাঠ ব্যবহৃত হয় ঘরবাড়ি নির্মাণ, আসবাবপত্র ও কাগজ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে। সর্বোপরি জ্বালানি শক্তি হিসেবে কাঠের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অরণ্য বা বন হলো প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট কাঠের প্রধান উৎসস্থল। বাড়িঘর নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় নরম কাঠ পাওয়া যায় অরণ্যে। অপরদিকে শক্ত ও অতি মূল্যবান কাঠ যেমন- শাল, সেগুন, মেহগনি, নিম প্রভৃতি যা আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয় তা মূলত প্রাকৃতিক অরণ্য এবং কিছু ক্ষেত্রে স্বল্প পরিচালনায়ুক্ত অরণ্যে উৎপন্ন হয়।

মাছ : মাছ এবং মাছ থেকে পাওয়া খাদ্য উপাদান প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ। মাছের উৎপাদনের মধ্যে বেশি অবদান সমুদ্রের। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্র, বিশেষ করে ঘের, পুকুর, নালা নর্দমা, খাল-বিল এবং নদী নালায় মাছ

উৎপাদন করা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট নানা কারণে দিন দিন পানিদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিরল প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে অর্থাৎ জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে।

কৃষিসংক্রান্ত ‘জিন’ সম্পদ : স্থানীয় আদিম শস্য প্রজাতি এবং পশু-সম্পত্তির মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ‘জিন’ মানব প্রজাতির অস্তিত্ব ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ। জীব-প্রযুক্তি এবং প্রজনন-সংক্রান্ত প্রজাতির প্রধান উৎসস্থল হলো এই জিনপুল। আদিম বৈচিত্র্যপূর্ণ জিনপুলের অপর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা যেকোনো প্রাকৃতিক পরিবেশে অঙ্কুরিত হতে পারে এবং রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। আদিম শস্য এবং পশু-সম্পত্তির বৈচিত্র্যপূর্ণ জিনের সংরক্ষণ এবং বাণিজ্যিকীকরণ অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Biodiversity Extinction

জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তি

সাধারণত একক কোনো কারণ বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয় না বরং বিভিন্ন কারণে জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়। জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির কারণসমূহ হচ্ছে :

জলবায়ু পরিবর্তন : জলবায়ুর পরিবর্তন একটি দেশের সার্বিক পরিবেশ-প্রতিবেশ পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে। কোনো একটি নির্দিষ্ট বাসস্থানে জলবায়ুর পরিবর্তন ওই বাসস্থানের প্রজাতির বস্তুতন্ত্রকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। জলবায়ু পরিবর্তনের পরোক্ষ প্রভাবের কারণে বাংলাদেশ থেকে রাজকাঁকড়া, বনবিড়াল এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

দাবানল : বায়ুতে যখন আদ্রতা খুব কমে যায় তখন বাতাস শুষ্ক হয়ে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে বনে গাছে গাছে ঘর্ষণজনিত কারণে আগুন ধরে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়াতে উল্লেখযোগ্য দাবানল দেখা যায়।

ভূসংস্থান, জলজ ও স্থলজের আকার : প্লেট টেকটোনিক প্রক্রিয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে ভূপৃষ্ঠের মহাদেশ ও মহাসাগরের অবস্থান ও আয়তনের পরিবর্তন ঘটেছে। তাই পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে ভূমির গঠন যেমনটি ছিল তা ক্রমশ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে নানা প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে। যেমন, সমুদ্রের তলদেশে নানা প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রবাল ও মাছ বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

জনবসতির প্রসারতা ও সম্পর্ক : বিভিন্ন প্রকার জীবজগতের সঙ্গে মানুষের আবাসস্থলের একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু এই আবাসস্থল যখন প্রসার লাভ করে তখন তাদের বসবাসের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচুর বনভূমি ছিল এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ওই অঞ্চলের সমস্ত জীবজগতের একটি গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। কিন্তু ক্রমশ তাদের পদচারণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রজাতির জীব ও গাছগাছালির বিলুপ্তি ঘটেছে। বন্য হাতির বিলুপ্তির উদাহরণ এখানে দেয়া যেতে পারে।

Biodiversity Preservation জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

সাধারণত যেসব স্তরের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের মূল্যায়ন করা হয় সেসব স্তরের দ্বারাই জীববৈচিত্র্যের রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। অর্থাৎ প্রজাতি, বাস্তুতন্ত্র ও জিন-এই তিনটি স্তরের দ্বারা জীববৈচিত্র্যের

সংরক্ষণ করা যেতে পারে। নিম্নে সংক্ষেপে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষণ : প্রজাতি বিলুপ্তি প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রজাতি বৈচিত্র্যের রক্ষণ করা সম্ভব। আর এই উপায় বা মাধ্যম প্রজাতির রক্ষণ বা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রধান বিষয়। ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে প্রাকৃতিক আবাসের সংরক্ষণ করাই হলো উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয়। সাধারণত স্বাভাবিক আবাসে প্রজাতি রক্ষণকে ইনসিটু কনজারভেশন (Insitu Conservation) এবং প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আবাস থেকে দূরবর্তী ভিন্ন আবাসে প্রজাতি রক্ষণকে এক্সসিটু কনজারভেশন (Exsitu conservation) বলে। এ ছাড়াও বিশ্ব সংরক্ষণ সংস্থা বা World Conservation Union-এর Red Data Books-এ পৃথিবীর সকল সংরক্ষণযোগ্য প্রজাতির সার্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বাস্তুতন্ত্র বৈচিত্র্য রক্ষণ : সাধারণত কোনো বাস্তুতন্ত্র গঠনকারী প্রজাতিসমূহের রক্ষণকে ঐ বাস্তুতন্ত্র বৈচিত্র্যের রক্ষণ বলে। বাস্তুতন্ত্রে কোনো বিশেষ বাস্তুতন্ত্র বা গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক আবাস সংরক্ষণ করে বাস্তুতন্ত্র বৈচিত্র্যের রক্ষণ করা সম্ভব।

জিন বৈচিত্র্য রক্ষণ : একটি প্রজাতির অভ্যন্তরস্থ জিনপুলের রক্ষণ বলতে ঐ প্রজাতির রক্ষণকে বোঝায়। পূর্ববর্তী কৃষিরীতি অনুসরণ করে এবং বীজ সরবরাহের জন্য স্থানীয় জিনপুল সংরক্ষিত বা সঞ্চিত করে স্থানীয় শস্য প্রজাতির রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব। তা ছাড়া জীবদেহের বাইরে কলা সঞ্চিত জিন অধিকোষ, বীজ অধিকোষ তথা এক্স-সিটু (Ex-situ)

সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায়ের মাধ্যমেও শস্য প্রজাতির সংরক্ষণ করা যায়। অন্যদিকে, প্রাণীদের ক্ষেত্রেও জিন-সংক্রান্ত বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ সম্ভব।

Climate Change and Biodiversity

জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য

জলবায়ু পরিবর্তন এবং মরুভূমির দৃষ্টি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া হলেও একটি অবিরত আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। জলবায়ুর পরিবর্তন মরুভূমির অবস্থা নির্ধারণ করে এবং মরুভূমির প্রক্রিয়া বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন প্রভাবকারী শক্তি ও পানির প্রবাহ বিভাজন ক্রিয়ায় পরিবর্তন করে থাকে। মানুষের কর্মকাণ্ড দ্বারা উভয়ের বিবর্তন প্রভাবিত হয়। বিগত শতাব্দীতে প্রধানত মানবসভ্যতার উন্নয়নের ফলে জলবায়ু ও জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ ছাড়াও জলবায়ুগত পরিবর্তন তথা বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং খরার মধ্যকার সহযোগিতামূলক আন্তঃক্রিয়া মরুভূমির অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে থাকে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমাঞ্চলে এই পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে বিগত কয়েক দশকে খরা সংঘটন, ভূগর্ভস্থ পানির অত্যধিক উত্তোলন এবং মৃত্তিকা লবণাক্তকরণ প্রক্রিয়াসমূহ সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। গঙ্গার উজানে অবস্থিত দেশ কর্তৃক একতরফাভাবে নদীর পানি প্রত্যাহারের ফলে ভাটি অঞ্চলের মাটির পানি নিঃশেষ হচ্ছে। ফলে এসব এলাকার পরিচিত গাছ ও অনেক প্রজাতির প্রাণীর টিকে থাকা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, যেগুলো দেশের জীববৈচিত্র্যের

সমৃদ্ধতায় অনেক অবদান রাখছে। জলবায়ুর পরিবর্তন জীববৈচিত্র্যের ওপর হুমকিস্বরূপ। জলবায়ু পরিবর্তন ইতোমধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যকে প্রভাবিত করেছে এবং এটা চলতে থাকবে।

Convention on Biodiversity জীববৈচিত্র্য-সংক্রান্ত সনদ

জীববৈচিত্র্য-সংক্রান্ত কনভেনশন হচ্ছে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য গৃহীত একটি আন্তর্জাতিক দলিল। ১৯৯২ সালের মে মাসে রিও সম্মেলনকে সামনে রেখে এই চুক্তি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এর উদ্যোক্তা ছিল জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি। পরিবেশ ও উন্নয়নবিষয়ক সম্মেলনের আগেই সেটি চূড়ান্ত করে স্বাক্ষরের জন্য ধরিত্রী সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৫৪টি দেশ তাতে স্বাক্ষর করে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৭৯টি দেশ এ চুক্তি অনুমোদন বা স্বাক্ষরের মাধ্যমে এর সদস্য হয়েছে। বাংলাদেশও এই কনভেনশনে স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে। এই কনভেনশন অনুযায়ী জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার বলতে বোঝায় যে, জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার এমন নিয়ন্ত্রিতভাবে করতে হবে, যাতে দীর্ঘমেয়াদে এই সম্পদ সংকুচিত না হয়। সে সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। নিজ নিজ জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রতিটি দেশের পূর্ণ অধিকার আছে। এই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও তার টেকসই ব্যবহারের ব্যাপারে তাদের দায়িত্বও রয়েছে। জীববৈচিত্র্য-সংক্রান্ত কনভেনশন সচিবালয় কানাডার মন্ট্রিলে অবস্থিত।

BUILDING CODE বিল্ডিং কোড

Building Code বিল্ডিং কোড

বিল্ডিং কোড হচ্ছে জাতীয়ভাবে অনুমোদিত নীতিমালা, যা আদর্শ অবকাঠামোর ডিজাইন ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে তৈরি। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিরাপত্তা, যথাপযোগিতা ও কার্যকারিতার আলোকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে এবং দেশের ভূতাত্ত্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বাংলাদেশ বিল্ডিং কোড গৃহীত হয়েছে।

ইমারত নির্মাণে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে নিরাপদ, সহজ ব্যবহার-উপযোগী, স্বাস্থ্যসম্মত জনকল্যাণমুখী অবকাঠামো নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৫২ গৃহীত হয়। এই বিধিমালা অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইমারত নির্মাণ করলেও তা যথাপযুক্ত বলে মনে হয়নি। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সনে গঠিত কমিটি বিধিমালা পর্যালোচনা করে। পরবর্তীতে এটিকে আরো আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকের মাধ্যমে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রযুক্তি ও অর্থের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে দেশীয় প্রযুক্তিতে সশ্রমী নির্মাণের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক নির্বাহী কমিটির নিকট একটি প্রস্তাবনা পেশ করে, যা পরবর্তী সময়ে কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

স্টিয়ারিং কমিটি একটি খসড়া বিল্ডিং কোড

তৈরির জন্য Development Design Consultant Limited-কে দায়িত্ব প্রদান করে এবং প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯২ সালের ১ জুন থেকে এ বিষয়ে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ‘The Committee of Experts on Earthquake Hazards Minimization’ নামে সরকারিভাবে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট ‘Seismic zoning map of Bangladesh and outline of a code for earthquake resistant design of structures’ নামে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোডে ভূকম্পন থেকে রক্ষার জন্য কার্যকরী নকশা বিশদভাবে উল্লেখ করা আছে। দ্য হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের যৌথ উদ্যোগে এটি প্রকাশিত হয়।

The Building Constructions Act-2006 ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৬

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ অষ্টম জাতীয় সংসদে ‘দি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট-২০০৬’ শীর্ষক বিল অনুমোদিত হয়। এই বিলের আলোকে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৬ গত ১৫ নভেম্বর, ২০০৬ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং এ বিষয়ে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অপচয়রোধ এবং নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী ইমারত নির্মাণের স্বার্থে ‘বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড’ প্রণয়ন করা হয়েছে। সমসাময়িক সময়ে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত কোডগুলোর অনুসরণে নিরাপদ ভবন নির্মাণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সামগ্রিক

তথ্য-উপাত্তের সমন্বয়ে নির্মাণ ব্যবস্থাপনায় পালনীয় নীতি ও বিধানগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে এই কোডে। এই কোড অনুসরণ করে যেকোনো ইমারত নির্মাণ বা অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাধ্যতামূলক। এই বিধিমালা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানাসহ শাস্তির বিধান রয়েছে।

CLIMATE জলবায়ু



Climate জলবায়ু

ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানের দীর্ঘ সময়ের দৈনন্দিন আবহাওয়ার সাধারণ বা গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে। জলবায়ুর উপাদানসমূহ হলো তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ু, মেঘ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, বায়ুচাপ ইত্যাদি। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক অবস্থা সে দেশের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

Climate of Bangladesh বাংলাদেশের জলবায়ু

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ২০° ৩৪' উত্তর থেকে ২৬° ৩৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ০১' পূর্ব থেকে ৯২° ৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। পর্বতময় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ব্যতীত দেশটি মূলত সুবিস্তৃত সমভূমি দ্বারা গঠিত। উত্তর-পূর্বে আসামের পর্বতমালা, উত্তরে মেঘালয় মালভূমি ও অধিকতর উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি ও গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের বিস্তৃত ভূমি বাংলাদেশকে ঘিরে রয়েছে। বাংলাদেশের জলবায়ু সাধারণভাবে ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু নামে পরিচিত। এ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আর্দ্রতা, নাতিশীতোষ্ণতা এবং সুস্পষ্ট ঋতুগত বৈচিত্র্য। দেশের জলবায়ুর সবচেয়ে লক্ষণীয় দিকটি পরিলক্ষিত হয় গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পরস্পর বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহে, যা দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের বায়ুপ্রবাহ-ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ষড়ঋতুর দেশ হিসেবে পরিচিত হলেও বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে বছরে প্রধানত তিনটি ঋতুর উপস্থিতি চিহ্নিত করা যায়, যথা- শুষ্ক শীতকাল যা নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়, মার্চ থেকে মে পর্যন্ত স্থায়ী প্রাক মৌসুমি বায়ুপর্ব গ্রীষ্মকাল; এবং জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বিস্তৃত বর্ষাকাল। প্রাক মৌসুমি বায়ুর পূর্ববর্তী গ্রীষ্মকালের বৈশিষ্ট্য হলো অধিক তাপমাত্রা ও বজ্র-বিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টির ঘটনা। এপ্রিল মাসকে উষ্ণতম মাস হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এই মাসে দেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে তাপমাত্রা

২৭° সেলসিয়াসে এবং পশ্চিম-মধ্যভাগে তা ৩১° সেলসিয়াসে পৌঁছায়। পশ্চিমাঞ্চলে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা কখনো কখনো ৪০-৪৩° সে. পর্যন্ত উঠে থাকে। এপ্রিল মাসের পরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার কারণে আর্দ্রতা বেড়ে যায়, অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা শীতকালীন বায়ুপ্রবাহ ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুর বা বর্ষা মৌসুমের (জুন-সেপ্টেম্বর) দক্ষিণা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করে। এই মৌসুমের শুরুতে বায়ু না খুব তীব্র হয়, না স্থায়ী হয়। তবে এ মৌসুমের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর গতিবেগ যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে তেমনি তা অধিক স্থায়ী হয়ে ওঠে। প্রাক-বর্ষা মৌসুমের প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত একটি সংকীর্ণ অনিয়মিত বায়ুপুঞ্জ বিস্তৃত হয়। এই সংকীর্ণ অনিয়মিত বায়ুপুঞ্জটি উচ্চতর গাঙ্গেয় সমভূমি থেকে আসা উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুপ্রবাহ এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু-প্রবাহের মধ্যবর্তী অঞ্চলেও অবস্থান করে। ঋতুর অগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে এই বায়ুপুঞ্জ অঞ্চলটি ক্রমশ দুর্বল হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে যায় এবং মৌসুমের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে এর চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। এর মাধ্যমে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের ক্ষেত্র তৈরি হয়। গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে যুগপৎ আগমনকারী বর্ষা ঋতু দক্ষিণা অথবা দক্ষিণ-পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহ, অত্যধিক আর্দ্রতা, ভারি বৃষ্টিপাত এবং মাঝে মাঝে কিছু শুষ্ক দিনের বিরতিসহ একটানা কয়েক দিন বৃষ্টিপাত প্রভৃতি ঘটনা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বঙ্গোপসাগর থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা ক্রান্তীয় নিম্নচাপের প্রভাবে এই মৌসুমে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়ে থাকে।

Climate Change জলবায়ু পরিবর্তন

একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহের স্বল্প কয়েক দিনের গড় বা ১ থেকে ৭ দিনের গড় ফলকে আবহাওয়া বলা হয়। বায়ুমণ্ডলের উপাদান বলতে বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও তার গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘের পরিমাণ ও মেঘের প্রকারভেদ ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদিকে বোঝায়। আর কোনো স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘকালের (৩০ বছর বা তারও বেশি সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়ার পর্যালোচনা করে বায়ুমণ্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর যে সাধারণ অবস্থা দেখা যায়, তাকে ওই স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে। বিজ্ঞানীদের মতে, বহুকাল আগে থেকেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। পৃথিবীর সকল শক্তির মূলেই রয়েছে সূর্য। সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীর সকল প্রাণীর জীবনধারণে সাহায্য করে। পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরণ পৌঁছায়, ভূপৃষ্ঠ তা শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মের এই শোষণ-বিকিরণ প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে।

Climate Change and Vulnerability of Bangladesh জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের বিপদাপন্নতা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে বিপন্ন। বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাজুক অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক

সম্পদের উপর অধিক নির্ভরতা এ বিপন্নতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

- বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা গত ১৪ বছরে (১৯৮৫-১৯৯৮) মে মাসে ১ ডিগ্রি সে এবং নভেম্বর মাসে ০.৫ ডিগ্রি সে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বাংলাদেশে মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি ৮৩০, ০০০ হেক্টর আবাদি জমির ক্ষতি করেছে।
- বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটে গত ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৭ সালে।
- বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়েছে।
- গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনাপানি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করছে।

Adaptation অভিযোজন

অভিযোজন হচ্ছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানো। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, সে পরিস্থিতি উত্তরণে গৃহীত কৌশলকে জলবায়ু ঝুঁকি অভিযোজন বলা হয়।

Adaptation to Climate Change জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন

আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও নিজেদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও অভিঘাত মোকাবেলায় সকলের

সর্বস্তরে খাপ খাওয়ানো ও অভিযোজনে করণীয় ও দায়িত্ব রয়েছে।

উন্নয়ন খাত সমূহে অভিযোজনের সুযোগ ও কৌশলের একটি নমুনা তালিকা নিচে দেয়া হলো—

খাতসমূহ	অভিযোজনের সুযোগ ও কৌশল
পানি	বৃষ্টির পানি ধারণ; পানি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ কৌশল রপ্ত করা; ব্যবহৃত পানি পুনরায় ব্যবহার; লবণাক্ততা দূরীকরণ; পানির ব্যবহার ও সেচে দক্ষতা অর্জন
কৃষি	চারা রোপনের সময় নির্ধারণ; শস্য বৈচিত্র্য; ভূমি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, যেমন-বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ
অবকাঠামো	পুনর্বাসন; ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধক্ষম বসতি ও মাছ ধরার নৌকার কাঠামো উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বশীল বাঁধ নির্মাণ; প্রাকৃতিক জলাশয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা
জনস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য পরিসেবা; জরুরি স্বাস্থ্যসেবা; জলবায়ুজনিত রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ; বিশুদ্ধ পানি ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
যোগাযোগ	পুনর্বিন্যাস ও পুনর্বাসন; রাস্তার নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন; নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ মানানসই অবকাঠামো নির্মাণ করা
শক্তি	বণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ; জ্বালানীর সু-ব্যবহার; পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ উৎসের ব্যবহার; একটিমাত্র শক্তির উৎস থেকে নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে

Different Types of Adaptation বিভিন্ন ধরনের অভিযোজন

কাঠামোগত অভিযোজন

(Structural Adaptation)

এ প্রক্রিয়ায় বর্তমানে প্রচলিত প্রযুক্তিগুলোর কিছুটা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অভিযোজিত হওয়া যায়। যেমন- বন্যার জন্য বাড়ি উঁচু করা, মজবুত কাঠামো দিয়ে বাড়ি তৈরি করা।

অ-কাঠামোগত অভিযোজন

(Non-Structural Adaptation)

অনেক ক্ষেত্রে জীবন চর্চা ও ব্যবহারে পরিবর্তনের মাধ্যমেই খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজিত হওয়া সম্ভব। যেমন- ঝুঁকিপূর্ণ স্থান থেকে অন্যত্র চলে গিয়ে বা পেশা পরিবর্তনের মাধ্যমে অভিযোজিত হওয়া যায়।

নিবৃত্তিমূলক অভিযোজন

(Anticipatory Adaptation)

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব পরিলক্ষিত হওয়ার আগেই অভিযোজন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তাকে নিবৃত্তিমূলক অভিযোজন বলে। যেমন- বন্যার আগেই শুকনো খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

প্রতিক্রিয়ামূলক অভিযোজন

(Reactive Adaptation)

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ পরিলক্ষিত হওয়ার পর যে অভিযোজন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয় তাকে প্রতিক্রিয়ামূলক অভিযোজন বলে। যেমন- লোনা এলাকায় লবণাক্ততা সহায়ক ধানের প্রজাতি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও আবাদ করা।

Global Warming বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। এই উষ্ণতা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। ইতোমধ্যে অনেক দেশ এবং এর জনগণ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে দুর্যোগ পোহাচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের আবহাওয়ার ধরন এবং ঋতু বৈচিত্র্য পাল্টে দিচ্ছে। এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, অতি বৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি ঘটান সন্ধাননা ও ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এইসব দুর্যোগে শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটছে এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদহানি হচ্ছে যার প্রভাব পড়ছে লাখ লাখ মানুষের জীবিকার উপর।

গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে গত শতাব্দীতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ২৫%, নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ ১৯% এবং মিথেনের পরিমাণ ১০০% বেড়েছে (চতুর্থ সমীক্ষাপত্র, আইপিসিসি) যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের অন্যতম প্রধান কারণ।

Global Warming and Changes in Rainfall

বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন

ক্রমবর্ধমান উষ্ণতার কারণে আমাদের জলবায়ুর কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা আমাদের ঋতু পরিক্রমাতে প্রভাব ফেলছে এবং ঋতু বৈচিত্র্যের রূপকে করেছে ক্ষুণ্ণ। যার কারণে জলবায়ু সংক্রান্ত দুর্যোগ তথা অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে তাপমাত্রা বৃদ্ধি তথ্য

বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণিত। যার কারণে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী কয়েক দশকের তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের রূপরেখা থেকে আমরা দেখতে পাই বর্ষা এবং শীত উভয়কালেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার কারণে বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিপাত এবং শুষ্ক মৌসুমে অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এই সামান্য পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বৃষ্টিপাত বাংলাদেশকে পরিবেশ, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে।

United Nations Framework Convention on Climate Change

জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর

জাতিসংঘের কর্মকাঠামো সনদ

আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকে সতর্কবাণী প্রদান করে আসলেও শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলো গায়ের জোরে তা অস্বীকারের চেষ্টা করছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহলে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালে গঠিত হয় ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)। এই প্যানেলের ১৯৯০ সালে প্রকাশিত প্রথম প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে অব্যাহত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা সম্ভব না হলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিপর্যয় আরো বেড়ে যাবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই সমস্যাকে মোকাবেলার জন্য ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডিজেনিরোর ধরিত্রী সম্মেলনে ইউনাইটেড ন্যাশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (United Nations

Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই পরবর্তীতে এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করে।

কনভেনশনের আওতায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সকল শিল্পোন্নত দেশ ২০০০ সালের মধ্যে তাদের নিজ নিজ দেশের গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন ১৯৯০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে তার চেয়েও ৫% ভাগ কমিয়ে আনবে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহকে এই সমস্যা মোকাবেলায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। পরবর্তীতে দেখা গেল সকলে অঙ্গীকার রক্ষা করেনি, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। ফলে ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটোতে সকল শিল্পোন্নত দেশসমূহ এটা নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিতরে কে কতটা গ্রিনহাউস গ্যাস কমাতে তা নিধারণ করে। এই চুক্তি কিয়োটো প্রোটোকল (Kyoto Protocol) নামে পরিচিত।

২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে সকল সদস্যের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয় UNFCCC এর কনভেনশনের ১৩তম কনফারেন্স অব পার্টিজ (COP13) এবং কিয়োটো প্রটোকলের সদস্য দেশের সমন্বয়ে তৃতীয় মিটিং অব পার্টিজ (MOP3)। এই সম্মেলনে সকল সদস্য দেশ বালি অ্যাকশন প্লান (Bali Action Plan) গ্রহণ করে। এই অ্যাকশন প্লান

- ২০১২ সাল পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একটি আলোচনার সূত্রপাত করেছে এবং ২০০৯ সালের মধ্যে একটি আলোচনা সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- আলোচনা পরিচালনার জন্য অ্যাডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ অন লং টার্ম কো অপারেটিভ অ্যাকশন গঠন করেছে।

- অভিযোজন তহবিল চালু করার ঘোষণা দিয়েছে।
- আলোচনার বিষয় ও পরিধি নির্ধারণ করেছে যার মধ্যে রয়েছে ক. মিটিগেশন, খ. অ্যাডাপ্টেশন বা অভিযোজন, গ. প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর এবং ঘ. বিনিয়োগ ও অর্থায়ন।

সারাবিশ্ব এই লক্ষ্য কাজ করে যাচ্ছে, যাতে তারা ২০০৯ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে COP15 এ সকল দেশের সম্মতিতে একটি গ্রহণযোগ্য আন্তর্জাতিক চুক্তিতে উপনীত হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সারা বিশ্বের সাথে একত্রে কাজ করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ চলমান ইউএনএফসিসিসি (UNFCCC)র সকল সমঝোতাবিষয়ক মিটিং-এ কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করে তার মতামত এবং দাবি জানিয়ে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বালি রোড ম্যাপ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে, যাতে করে ২০০৯ সালে কোপেনহেগেনে (COP15) সারা বিশ্ব একটি গ্রহণযোগ্য সমঝোতায় পৌছাতে পারে।

National and International Initiative for Addressing Climate Change

জলবায়ু পরিবর্তন : জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

জলবায়ু পরিবর্তন এর প্রভাব ও এর সমস্যা মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণে ১৯৮৮ সালে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা ও জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় Inter Governmental Panel on Climate Change (IPCC)। ১৯৯০ সালে IPCC তাদের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

১৯৯২ সালে জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় একটি কনভেনশন গ্রহণ করে যা ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা UNFCCC নামে পরিচিত। বাংলাদেশ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এ স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। IPCC ও নেদারল্যান্ডস সরকারের সহযোগিতায় ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জরিপ হয়। বাংলাদেশে পরিবেশ অধিদপ্তরে সিডিএমপি-এর আওতায় ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সেলের মাধ্যমে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন গবেষণা ও যোগাযোগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Green House Gas গ্রিন হাউস গ্যাস

বিভিন্ন গ্যাস দিয়ে তৈরি পৃথিবীর এ বায়ুমণ্ডল। তার মূল উপাদান নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। এগুলো ছাড়াও নগণ্য পরিমাণে কার্বনডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড আছে। আরও আছে জলীয়বাষ্প ও ওজোন। বায়ুমণ্ডলের গৌণ গ্যাসগুলোই গ্রিন হাউস গ্যাস। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট গ্যাস ছাড়াও মনুষ্যসৃষ্ট সিএফসি ও এইচসিএফসি, হ্যালন ইত্যাদি গ্যাসও বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয়েছে।

Green House Effect গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া

শীতপ্রধান দেশে সাধারণত এক ধরনের স্বচ্ছ কাচের ঘরে তরিতরকারি ও শাক-সবজির চাষ করা হয়। ফসল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে এসব ঘরের আবহাওয়া প্রয়োজন অনুযায়ী গরম রাখা হয়। এসব ঘরকেই বলে গ্রিন হাউস। সূর্যের আলো ও তাপ কাচের মধ্য দিয়েই ঘরে প্রবেশ করে কিন্তু

বিকিরণের সময় সমুদয় তাপ বের হয়ে আসতে পারে না। ফলে বাইরের তুলনায় ঘরের ভেতরে উচ্চতা অধিক বজায় থাকে। সূর্যের আলো ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে তোলে। বিকিরণ প্রক্রিয়ায় এই তাপ আবার উর্ধ্বাকাশে ফিরে যেতে চায়। যদিও থেকে যায়। যার ফলে বায়ুমণ্ডল তথা ভূপৃষ্ঠ উষ্ণ থাকে এবং জীবনের বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এভাবে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে। বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়াও নগণ্য পরিমাণে অন্যান্য গ্যাস আছে। এ ধরনের গ্যাসগুলো হচ্ছে কার্বনডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন, ওজোন ইত্যাদি। এসব গ্যাসই এ ধরনের তাপ ধরে রাখে। বিগত ২০০ বছরে শিল্প বিপ্লব-উত্তর কালে মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলোর অনুপাত পরিবর্তিত হয়েছে। এ কারণে বাতাসের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে এসব গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে বলে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে বা তাপমাত্রার তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে।

Atmospheric Pressure বায়ুমণ্ডলীয় চাপ

বায়ুমণ্ডলের একটি নির্দিষ্ট অংশ হতে যে চাপ প্রয়োগ করা হয় তাকে Atmospheric Pressure বা বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলে। এ চাপ বিভিন্ন উপায়ে পরিমাপ করা যায় : মিলিবার-এর মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়, আবার মারকারির ইঞ্চি বা মিলিমিটারের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়। ইহা Barometric Pressure বা আবহমান-সংক্রান্ত চাপ হিসেবেও পরিচিত।

National Adaptation Program of Action (NAPA) জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা NAPA নামে অধিক পরিচিত। ২০০৫ সালে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কনভেনশনের সিদ্ধান্তের আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও অভিযোজনের জন্য নির্ধারিত কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ সরকার এই কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে।

জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিডিএমপি'র জলবায়ু পরিবর্তন সেল থেকে সহযোগিতা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে অভিযোজন কর্মপরিকল্পনার কিছু পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সম্ভাব্য দাতা সংস্থাকে প্রতিবর্তা (feedback) প্রদান করা হয়েছে।

NAPA তে নিম্নলিখিত বিস্তৃত ক্ষেত্রসমূহ প্রস্তাব করা হয়েছে :

- উপকূলীয় এলাকায় উপযোগী কৃষিশস্য উদ্ভাবন এবং আকস্মিক বন্যাসহনীয় ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ।
- পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থাসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি
- উপকূলীয় বনায়ন
- উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা
- আপদাক্রান্ত এলাকার জন্য বীমা ব্যবস্থা চালুসহ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ
- খরা, বন্যা ও লবণাক্ততা সহনশীল শস্যের ওপর গবেষণা।

Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan

২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে সরকার Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan তৈরি করে। এ পরিকল্পনায় আগামী ২০-২৫ বছর জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য দেশের সামর্থ ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০ বছর ব্যাপী পরিকল্পনা করেছে। পরিকল্পনাটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং উন্নত দেশগুলোকে আমাদের অভিযোজনের জন্য অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা, পরিমাণ ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে।

Atmospheric Pressure and Air Stream

বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও বায়ুপ্রবাহ

শীত ও গ্রীষ্মের ঋতুগত বৈপরীত্য দ্বারা বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও বায়ুপ্রবাহ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে থাকে। শীত মৌসুমে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি উচ্চচাপ কেন্দ্র অবস্থান করে। এই উচ্চচাপ কেন্দ্র থেকে একটি শীতল বায়ুস্রোত পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়, যা বাংলাদেশে উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে বাংলাদেশের প্রবেশ করে। এই বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের শীতকালীন মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের একটি অংশ। এভাবে শীতকালে দেশের অভ্যন্তরে বায়ু সাধারণত উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে গ্রীষ্মকালে ভূপৃষ্ঠের প্রচণ্ড উত্তাপে ভারতের পশ্চিম কেন্দ্রভাগ জুড়ে একটি নিম্নচাপ উল্লিখিত নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। আরব সাগর থেকেও ভারত অভিমুখী অনুরূপ বায়ুপ্রবাহের দক্ষিণ প্রবণতা বিদ্যমান থাকে, তথা এ সময় বায়ু দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম

অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। তবে ঋতুর পরিবর্তনশীল পর্যায়গুলোতে, যেমন- বসন্ত ও হেমন্তকালে বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তনশীল থাকে। সাধারণত, শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালের বায়ুপ্রবাহের শক্তি অপেক্ষাকৃত তীব্র হয়ে থাকে। শীতকালের বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ সাধারণত ৩-৬ কি.মি./ঘণ্টা হয়ে থাকে, আর গ্রীষ্মকালে এই গতিবেগ থাকে ৮-১৬ কি.মি./ঘণ্টা। বায়ুমণ্ডলের গড় চাপ জানুয়ারি মাসে ১,০২০ মিলিবার এবং মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তা ১,০০৫ মিলিবার পর্যন্ত বজায় থাকে।

Absolute Humidity

চরম আর্দ্রতা

কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুরাশিতে যতটুকু জলীয়বাষ্প রয়েছে, সে পরিমাণ জলীয়বাষ্পকে চরম আর্দ্রতা বলে। সাধারণত প্রতি ঘনফুট বায়ুতে কত গ্রাম জলীয়বাষ্প রয়েছে তা হিসাব করে চরম আর্দ্রতা পরিমাণ করা হয়। অর্থাৎ চরম আর্দ্রতা ঘনফুট/গ্রাম হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

Arctic Wind

কুমেরু বায়ু

উত্তর গোলার্ধে কুমেরু অঞ্চল হতে উপমেরুর দিকে প্রবাহিত অতিশীতল ও ভারি বায়ু-প্রবাহ।

Climatic Divide

জলবায়ুর বিভাজিকা

পর্বতের দুদিকে দু রকম জলবায়ু দেখা যায়। প্রতিবাত ঢালে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুর অবস্থান এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। অপরদিক অনুবাত ঢালে শুষ্ক ও তপ্ত জলবায়ু সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ দুটি ভিন্নধর্মী জলবায়ুর মধ্যে পর্বত

একটি বিভাজিকা হিসেবে কাজ করে। এ কারণে হিমালয়ের দক্ষিণাংশ বাংলাদেশে আর্দ্র মৌসুমি জলবায়ু কিন্তু হিমালয়ের বিপরীত ঢাল তথা উত্তরাংশ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হিমালয় পর্বত শ্রেণী জলবায়ু বিভাজিকা হিসেবে কাজ করছে।

Condensation

ঘনীভবন

ঘনীভবন হলো বাষ্পীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া। অর্থাৎ জলীয়বাষ্প জলকণায় রূপান্তর প্রক্রিয়া। জলীয়বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ বায়ু উর্ধ্ব উত্থিত হয় এবং ক্রমে শীতল হতে থাকে। এভাবে এক পর্যায়ে শিশিরাক্লে উপনীত হয়। শিশিরাক্লে হলো এমন একটি তাপমাত্রা যখন বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০%। অর্থাৎ এ সময় বায়ুর তাপমাত্রা অনুযায়ী যতটুকু জলীয়বাষ্প থাকার কথা, ঐ বায়ুতে ততটুকুই রয়েছে। এই অবস্থাকে সম্পৃক্ত বা পরিপূর্ণ বায়ু বলে। এই সময় যদি তাপমাত্রা আরো হ্রাস পায় তথা শিশিরাক্লের নিচে নেমে যায়, তবে বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প বায়ুস্থিতি ধূলিকণা বা গ্যাসীয় কণার আশ্রয়ে জলকণায় পরিণত হয়। উর্ধ্বাকাশে জলীয়বাষ্পের জলকণায় পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকেই ঘনীভবন বলে। উদাহরণস্বরূপ ৩০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা বায়ুর জলীয়বাষ্পের ধারণক্ষমতা হলো তাপমাত্রা ঘনমিটারে ৩০ গ্রামের কিছু বেশি। ধরা যাক, কোনো বায়ুতে একই তাপমাত্রায় একই পরিমাণ জলীয়বাষ্প রয়েছে।

Climatic Region

জলবায়ু অঞ্চল

জলবায়ুর ভিত্তিতে পৃথিবীর আঞ্চলিক বিভাজন। আক্ষরিক অর্থে, পৃথিবীর কোনো

দুটো স্থানের জলবায়ুর হুবহু এক রূপ নয়, তবে সাধারণ একটা মিল রয়েছে। এভাবে একই প্রকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এলাকাগুলোকে একই শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। এরূপ এক একটি শ্রেণীকে জলবায়ু অঞ্চল নামে অভিহিত করা হয়। যেমন : শুষ্ক জলবায়ু, আর্দ্র জলবায়ু।

Cloud

মেঘ

বিশাল আকারের উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু ওপরে ওঠার ফলে বায়ুস্থিত জলীয়বাষ্প শীতল ও ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা বা বরফকণায় পরিণত হয় এবং ধূলিকণা বা গ্যাসীয় কণার আশ্রয়ে বায়ুতে ভেসে বেড়ায়। উর্ধ্বাকাশে ভাসমান এসব বরফকণা বা জলকণার রাশিকে মেঘ বলে। উচ্চতা, আকৃতি, গঠনপ্রণালি, বর্ণ প্রভৃতির নানা প্রকারের মেঘ দেখা যায়। যেমন, পালক মেঘ, স্তর মেঘ, ঝড়োপুঞ্জ মেঘ ইত্যাদি।

Cloudness

মেঘাচ্ছন্নতা

বাংলাদেশে মেঘাচ্ছন্নতার ধরন দুই বিপরীত ঋতু শীত ও গ্রীষ্মে বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। শীতকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত শুষ্ক ও শীতল বায়ুপ্রবাহের ফলে মেঘাচ্ছন্ন থাকে সর্বনিম্ন। এই মৌসুমে সমগ্র দেশে গড়ে প্রায় ১০% মেঘাচ্ছন্ন দেখা যায়। শীতঋতু অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রাক-বর্ষা গ্রীষ্মকালের শেষ পর্যায়ে এই মাত্রা ৫০% থেকে ৬০%-এ পৌঁছায়। বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্নতার মাত্রা খুবই ব্যাপক হয়। বর্ষা ঋতুর মাঝামাঝিতে জুলাই ও আগস্ট মাসে দেশের সর্বত্র ৭৫% থেকে ৯০% মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বিদ্যমান থাকে। দেশের উত্তর-

পশ্চিমাঞ্চলে ৭৫% মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তুলনায় দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় অংশে মেঘাচ্ছন্নতার মাত্রা থাকে বেশি তথা ৯০%। বর্ষাকাল শেষে মেঘাচ্ছন্নতা দ্রুত হ্রাস পায়। উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে এর মাত্রা ২৫% এবং দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে এর মাত্রা দাঁড়ায় ৪০-৫০%।

Depression নিম্নচাপ

যদি কোনো এলাকায় চারপাশের তুলনায় বায়ুর চাপ কম থাকে, তবে সে অবস্থাকে বলা হয় নিম্নচাপ (Depression)। নিম্নচাপ বলতে ঘূর্ণিঝড় (Cyclone) ধরনের আবদ্ধ নিম্নচাপ এলাকা অথবা উন্মুক্ত ভূ-আকৃতির নিম্নচাপপূর্ণ বায়ুমণ্ডলীয় খাদকেও বোঝায়। এই নিম্নচাপ সচরাচর ভারত মহাসাগরের গভীর এলাকায় অথবা বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন হয়ে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু-প্রবাহের সময়ে এই নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। নিম্নচাপের প্রভাবে বাংলাদেশসহ আশপাশের অঞ্চলে প্রায় ৭ থেকে ১০ দিন একটানা ভারি বর্ষণ হয়ে থাকে এবং কখনো কখনো সিলেট ও কক্সবাজার এলাকায় ২ থেকে ৩ সপ্তাহেরও অধিক কাল ধরে বর্ষণ অব্যাহত থাকে।

Dew শিশির

জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ভূপৃষ্ঠের উপরে শীতল কোনো বস্তুর সংস্পর্শে এলে ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা আকারে গাছ ও ঘাসের ওপর জমা হয় যাকে শিশির বলে।

Dew Point শিশিরাক্ষ

যে তাপে বায়ু সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে সে তাপমাত্রাকে শিশিরাক্ষ বলে। এই অবস্থায়

বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০%। বায়ুর তাপমাত্রা শিশিরাক্ষের নিচে নেমে গেলে বায়ুতে ঘনীভবন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

Evaporation বাষ্পীভবন

যে প্রক্রিয়ায় কোনো তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয় তাকে বাষ্পীভবন বলে। পানি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়।

Evapo-transpiration বাষ্পীভবন-প্রস্বেদন

বাষ্পীভবন দ্বারা মৃত্তিকা ও জলভাগ হতে এবং প্রস্বেদন দ্বারা উদ্ভিজ্জ হতে জলীয় পদার্থ অপচয় হয়। এভাবে কোনো এলাকার মৃত্তিকা, জলভাগ এবং উদ্ভিজ্জ হতে যে পরিমাণ পানির অপচয় হয় তাকে বাষ্পীভবন-প্রস্বেদন বলে।

Fog কুয়াশা

আর্দ্র বায়ু ভূপৃষ্ঠের নিকটস্থ শীতল পৃষ্ঠের সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত এবং অতি সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হয়। এসব সূক্ষ্ম জলকণা এতই হালকা থাকে যে ভূপৃষ্ঠে বারিবিন্দু আকারে পতিত না হয়ে ভাসলগ্ন এলাকায় মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়। দেখতে ধোঁয়ার মতো এবং এতে দৃশ্যমানতা হ্রাস পায়। একেই কুয়াশা বলে।

Climate Factors জলবায়ুর নিয়ামকসমূহ

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের জলবায়ু দেখা যায়। এই বৈচিত্র্যের জন্য কতিপয় ভূপ্রাকৃতিক নিয়ামক দায়ী। যেমন : অক্ষাংশ, উচ্চতা, ভূখণ্ড ও সমুদ্রের অবস্থান, সমুদ্র স্রোত, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি। এগুলোকে জলবায়ুর নিয়ামক বলে।

Gravity Winds অভিকর্ষ বায়ুপ্রবাহ

এটি একটি স্থানীয় বায়ু। শীতল, ভারী ও গুরু বায়ু পর্বতের ঢাল বেয়ে নিচের উষ্ণ সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। মধ্যাকর্ষণের জন্য নিচে নেমে আসে বলে এরূপ বায়ুপ্রবাহকে অভিকর্ষ বায়ু বলে। বরফাচ্ছাদিত উচ্চ ভূমিতে এরূপ বায়ুপ্রবাহ সচরাচরই দেখা যায়।

Ground Water ভূ-গর্ভস্থ পানি

ভূগর্ভে অপ্রবেশ্য শিলাস্তরে সঞ্চিত পানিরশি।

Heat Balance তাপ সমতা

প্রতিদিন সূর্য ওঠে এবং ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়। কিন্তু সূর্য থেকে এরূপে নিয়মিত তাপ গ্রহণ সত্ত্বেও পৃথিবীর বার্ষিক তাপমাত্রার কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এর কারণ হলো ভূপৃষ্ঠে ও বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ ক্ষুদ্র তরঙ্গাকারে সৌরশক্তি লাভ করে তা আবার বৃহৎ তরঙ্গাকারে মহাশূন্যেই ফিরে যায়। আনুমানিক হিসাবে দেখা যায়, মোট সৌরশক্তির ৩৪% আদৌ ভূপৃষ্ঠের কোনো কাজে আসে না। নানাভাবে বিচ্ছুরিত ও প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়। বাকি যে ৬৬% ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের উত্তাপে কাজে লাগে তাও পরবর্তী সময়ে নানাভাবে বিকরিত হয়ে মহাশূন্যেই ফিরে যায়। অর্থাৎ সৌরশক্তির আগমন ও নিষ্করণ সমান। এই ভারসাম্যকেই উত্তাপের স্থিতি বা তাপ সমতা বলে।

Humidity আর্দ্রতা

বাংলাদেশে প্রায় সারা বছর জুড়েই উচ্চ আর্দ্রতা বিরাজমান থাকে। দেশের পশ্চিমাঞ্চলের

অধিকাংশ স্থানে মার্চ-এপ্রিল মাসে সর্বাপেক্ষা কম আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয়। মার্চ মাসে দিনাজপুরে সর্বনিম্ন গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা (৫৭%) পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাসমূহে নিম্নতম আর্দ্র মাসগুলো হচ্ছে জানুয়ারি থেকে মার্চ। এ এলাকায় সর্বনিম্ন মাসিক আর্দ্রতা রেকর্ড করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মার্চ মাসে (৫৮.৫%)। জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে দেশের সর্বত্র আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০%-এর অধিক থাকে। জুলাই অথবা আগস্ট মাসে সম্পৃক্তি ঘাটতি (Saturation deficit) সবচেয়ে কম হয়ে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসে আর্দ্রতা চরমে পৌঁছে, এ সময় বৃষ্টিপূর্ণ দিনের সংখ্যাও খুব বেশি হয় না। ভ্যাপসা গরম আবহাওয়ায় মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বার্ষিক গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিসীমাটি হলো কক্সবাজারে সর্বোচ্চ ৭৮.১% থেকে পাবনায় সর্বনিম্ন ৭০.৫% পর্যন্ত।

Relative Humidity আপেক্ষিক আর্দ্রতা

কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প রয়েছে, এর সঙ্গে ঐ তাপমাত্রায় বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণক্ষমতার অনুপাতকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো বায়ুর যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে তার শতকরা হিসাবই হলো আপেক্ষিক আর্দ্রতা। যেমন— কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট বায়ুর জলীয়বাষ্পের ধারণক্ষমতা ৮ গ্রাম, কিন্তু ঐ বায়ুতে বর্তমানে ৪ গ্রাম জলীয়বাষ্প থাকলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৫০ শতাংশ।

Hydraulic Erosion জলীয় ক্ষয়সাধন

নদীর স্রোত বা ঢেউয়ের আঘাতে নদী উপত্যকায় যে ক্ষয় হয় তাকে জলীয়

ক্ষয়সাধন (Hydraulic Erosion) বলে। সামুদ্রিক ঢেউয়ের আঘাতে একইভাবে উপকূলের ক্ষয়সাধন হয়ে থাকে।

High Latitude উচ্চ অক্ষাংশ

মেরু প্রদেশের নিকটবর্তী অক্ষাংশসমূহকে উচ্চ অক্ষাংশ বলে। সাধারণত ৬০ ডিগ্রি হতে ওপরের দিকে অক্ষাংশসমূহ উচ্চ অক্ষাংশ হিসেবে পরিচিত।

Horse Latitude অধ্ব-অক্ষাংশ

৩০ ডিগ্রি থেকে ৩৫ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়ে নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ের মতো বায়ুর আনুভূমিক প্রবাহ নেই বললেই চলে। এ অঞ্চলে বায়ু নিম্নগামী বলে এখানে আনুভূমিক প্রবাহ অনুভব করা যায় না। প্রাচীনকালে পাল তোলা জাহাজযোগে ইউরোপ-আমেরিকাতে ঘোড়া রপ্তানি করা হতো এবং এই অঞ্চলে উপস্থিত হওয়ার পর বায়ুপ্রবাহের অভাবে জাহাজের গতি একেবারে মস্থর হয়ে যেত। এভাবে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হতো। নাবিকগণ তখন জাহাজের পানীয় জল নিজেদের জন্য সংরক্ষণ করার জন্য কতগুলো ঘোড়া সমুদ্রে ফেলে দিত। এ কারণে এই অঞ্চলকে অধ্ব-অক্ষাংশ বলে।

Temperature of Bangladesh বাংলাদেশের তাপমাত্রা

বাংলাদেশের জানুয়ারি শীতলতম মাস। তবে এ সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবিশ্ট শীতকালীন শীতল বায়ুপ্রবাহ দেশের উত্তর-পশ্চিম কোণে পৌঁছতে পৌঁছতে এর তীব্রতা অনেকাংশে

হারিয়ে ফেলে। জানুয়ারিতে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গড় তাপমাত্রা থাকে প্রায় ১৭° সে. এবং উপকূলীয় এলাকায় তা ২০°-২১° সে. এ বিরাজ করে। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে এবং জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে দেশের সর্ব-উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অংশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একবারে হিমাক্ষের কাছাকাছি ৪° থেকে ৭° সেন্টিগ্রেডে নেমে আসে। শীতকাল এগিয়ে গিয়ে প্রাক-মৌসুমি উষ্ণ ঋতুতে উত্তরণ ঘটান সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এপ্রিল মাসে তা সর্বোচ্চে পৌঁছায়। এপ্রিলে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গড় তাপমাত্রা থাকে প্রায় ২৭° সেন্টিগ্রেডের মতো এবং সর্বপশ্চিম-কেন্দ্রীয় অংশে এই তাপমাত্রা থাকে ৩০° সেন্টিগ্রেডের মতো। রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলার কিছু কিছু স্থানে গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০° সে. কিংবা তারও অধিক উঠে থাকে। এপ্রিল মাসের পরে গ্রীষ্মকালীন মাসগুলোতে তাপমাত্রা সামান্য হারে হ্রাস পেতে থাকে। এ সময়ে বর্ষা মৌসুমের শেষ দিকে আকাশে মেঘ জমতে থাকলে তাপমাত্রার সঙ্গে আর্দ্রতার সংযোগ ঘটে। এক ধরনের ভ্যাপসা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। জুলাই মাসে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা থাকে ২৭° সে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তা বৃদ্ধি পেতে পেতে ২৯° সেন্টিগ্রেডে পৌঁছায়।

Irregular Winds অনিয়মিত বায়ু

তাপ ও চাপের পার্থক্যের জন্য কোনো স্থানে আকস্মিকভাবে যে বায়ুপ্রবাহের উদ্ভব হয়, তাকে অনিয়মিত বায়ু বলে। যেমন- ঘূর্ণবাত, প্রতীক ঘূর্ণবাত ইত্যাদি।

Snow তুষার

শীতপ্রধান দেশে শীতকালে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু অত্যধিক শীতে ঘনীভূত হয়ে সরাসরি কঠিন অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, একে তুষারপাত বলে।

Temperature Zone তাপমণ্ডল

উত্তাপের তারতম্য অনুযায়ী পৃথিবীকে কতিপয় ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- উষ্ণমণ্ডল, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল, হিমমণ্ডল প্রভৃতি। এই ভাগগুলোকে একত্রে তাপমণ্ডল বলে।

Torrid Zone উষ্ণমণ্ডল

উত্তাপের তারতম্য অনুযায়ী পৃথিবীকে যে কটি ভাগে ভাগ করা হয়, উষ্ণমণ্ডল তার একটি শ্রেণীবিভাগ। বিষুব রেখার উত্তরে কর্কট ক্রান্তি (২৩.৫ ডিগ্রি উঃ) এবং দক্ষিণে মকর ক্রান্তি (২৩.৫ ডিগ্রি দঃ) মধ্যবর্তী স্থানে মধ্যাহ্ন সূর্যের অবনতি বছরের কোনো সময়ই ২৩.৫ ডিগ্রির বেশি হয় না। ফলে এই অংশে তাপমাত্রাও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বেশি। এ কারণে এই অঞ্চলকে উষ্ণমণ্ডল বা গ্রীষ্মমণ্ডল বলে।

Thermal Anomaly তাপের বিচ্যুতি

অক্ষাংশ অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রার একটা স্বাভাবিক ধরন রয়েছে। কিন্তু স্থানীয় কোনো কারণে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন- কোনো অঞ্চলের তাপমাত্রা সে অঞ্চলটি যে অক্ষাংশে অবস্থিত তার চেয়ে অস্বাভাবিকভাবে উষ্ণ বা শীতল হতে পারে। এই পার্থক্যকেই তাপের বিচ্যুতি বলে।

COAST উপকূল



Coast উপকূল

একটি অনির্দিষ্ট প্রস্থবিশিষ্ট ভূখণ্ড যা তটরেখা হতে মূল ভূখণ্ডের ভূমি প্রকৃতির গঠনের সুস্পষ্ট পরিবর্তন যেখানে সূচিত হয়েছে সেই পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়, তাকে Coast বা উপকূল বলে।

Coastline তটরেখা

যে রেখা তীর বা উপকূলের মধ্যবর্তী সীমারেখা হিসাবে চিহ্নিত থাকে তাকে Coastline বা তটরেখা বলে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে রেখা ভূমি এবং পানির মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ করে তাকে Coastline বা তটরেখা বলে।

Beach

সৈকত বা সমুদ্রতীর

সমুদ্র তীরবর্তী নরম মৃত্তিকা উপাদানে গঠিত অঞ্চল, যা জলভাগ হতে স্থলভাগের দিকে সম্প্রসারিত হয় অর্থাৎ যে স্থানে ভূমি প্রকৃতির গঠনের পরিবর্তন হয় বা যেখানে স্থায়ী গাছপালা জন্মায়, সেই অঞ্চলকে Beach বা সৈকত বা সমুদ্রতীর বলে।

Coastal Erosion

উপকূলীয় ভাঙন

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যেমন— স্রোতধারা, ভূমিধস, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি কারণে তটরেখা বা উপকূল হতে শিলা বা পলির যে ক্ষয় হয় তাকে Coastal Erosion (উপকূলীয় ভাঙন) বলে। জোয়ার-ভাটা ও সামুদ্রিক তরঙ্গের ক্রিয়ার ফলে উপকূলীয় ভূমি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং উপকূলীয় ভাঙন সংঘটিত হয়। বাংলাদেশের তটরেখা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহ বঙ্গোপসাগর থেকে উদ্ভূত জোয়ার-ভাটা সৃষ্ট তরঙ্গের প্রতिसরণ ক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়।

Offshore Island

উপকূলবর্তী দ্বীপ

উপকূলবর্তী দ্বীপ হচ্ছে সমুদ্রতীরের অনতিদূরের দ্বীপ। বঙ্গোপসাগরের ফানেল বা চোঙ আকৃতির অগভীর প্রণালিতে এই ধরনের প্রচুর দ্বীপ গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার মিলিত প্রবাহ মেঘনা মোহনার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে পলি উপকূল অঞ্চলে জমা হয়, যার ফলে এ সকল দ্বীপের সৃষ্টি। এই দ্বীপগুলোর বিন্যাসরীতি লক্ষ্য করলে

দেখা যায় যে, অধিকাংশই গঠিত হয়েছে উপকূলের মধ্য অংশে, অর্থাৎ তেঁতুলিয়া দ্বীপের পূর্ব থেকে ফেনী নদীর বিশাল মোহনার মধ্যবর্তী স্থানে। এই অঞ্চলটি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। একই সঙ্গে সার্বক্ষণিক অবিক্ষেপণ ঘটেছে, ফলে এখানকার তটরেখা অনিয়মিত এবং ভঙ্গুর। হাতিয়া, ভোলা ও মনপুরা— প্রধান তিনটি উপকূলীয় দ্বীপ এবং এগুলো সবই ঘনবসতিপূর্ণ। পশ্চিমাঞ্চলের তটরেখা মহাদেশীয় উপাত্ত-কাঠামোর সঙ্গে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত। তটরেখার সম্মুখভাগ বন দিয়ে আবৃত যা সুন্দরবন নামে খ্যাত।

Sea-level

সমুদ্রপৃষ্ঠ

সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার মাঝামাঝি তল বা উচ্চতা, যা কোনো স্থানের ভূমি উত্থান এবং মহাসাগরীয় গভীরতা পরিমাপক নির্দেশক রেখা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাকে সমুদ্রপৃষ্ঠ বলে। তাত্ত্বিকভাবে ধরে নেয়া যায় যে, সমুদ্রপৃষ্ঠ স্থির এবং মহাদেশের দিকে মুখ করে অবস্থিত স্থায়ী আনুভূমিক একটা পৃষ্ঠ। কিন্তু বিভিন্ন উপাদানের ক্রিয়াকলাপের ফলাফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্থানভেদে কয়েক মিটার পর্যন্ত কমবেশি হতে পারে। জোয়ার-ভাটার ওঠানামা, জলরাশির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন, উর্ধ্ব নিঃসরণ, নদ-নদীর সরবরাহের পরিবর্তন প্রভৃতির প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়ে থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার ক্রমশ বৃদ্ধির ফলে বিশ্ব জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, তথা নিম্ন উচ্চতাবিশিষ্ট বদ্বীপ অঞ্চলসমূহ প্রাণিত হওয়ার আশঙ্কা

একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশও ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্লাবন মাত্রায় ২০৫০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা, ভূমি ব্যবহার এবং জাতীয় আয়ে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের ১৪৪-২০৯ সে.মি. উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে প্রায় ১৬-১৮% বাসযোগ্য ভূমি প্রাণিত হওয়া এবং বর্তমান মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৩-১৫% ও মোট জাতীয় আয়ের (জিডিপি) প্রায় ১৩% পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

Coastal Plain

উপকূলীয় সমভূমি

সমুদ্র তটরেখায় উপকূলীয় বাঁধের পশ্চাতে নুড়ি, বালু ও কাদা সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে উপকূলীয় সমভূমি বলে। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ সমভূমি কদমাত্ত জলাভূমিতে পরিণত হয়।

Bay of Bengal

বঙ্গোপসাগর

Bay of Bengal বা বঙ্গোপসাগর হলো ভারত মহাসাগরের উত্তরের সম্প্রসারিত বাহু। ভৌগোলিকভাবে ৫° উত্তর ও ২২° দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ৮০° পূর্ব ও ১০০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। পশ্চিমে ভারত ও শ্রীলঙ্কার পূর্ব উপকূল, উত্তরে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী প্রণালি সৃষ্ট বদ্বীপ এবং পূর্বে মায়ানমার উপদ্বীপ থেকে আন্দামান-নিকোবর শৈল শিলা (Ridges) পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ দ্বারা বঙ্গোপসাগর তিন দিকে আবদ্ধ। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ সীমা

শ্রীলঙ্কার দক্ষিণে দন্দ্ৰাচূড়া (Dondra Head) থেকে সুমাত্রার উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সর্বমোট প্রায় ২২ লক্ষ বর্গকিমি আয়তনের বিশাল এলাকা জুড়ে বঙ্গোপসাগর বিস্তৃত। এর গড় গভীরতা প্রায় ২,৬০০ মিটার এবং সর্বোচ্চ গভীরতা ৫,২৫৮ মিটার। বঙ্গোপসাগরের সর্ব-উত্তর প্রান্তে বাংলাদেশ অবস্থিত।

E-line

ই-লাইন

তীর হতে লম্বা সরু বন্ধনযুক্ত ভূখণ্ড যা দূরত্ব চিহ্নিত করে এবং যেখানে বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ শুষ্ক জমি পানি দ্বারা ধৌত হয়ে উপকূলের ক্ষয়সাধন হয়, ওই ভূখণ্ডকে ই-লাইন বলে।

E-zone

ই-জোন

E-line এবং Sea-level এর মধ্যে যে সকল আপদ এলাকা আছে যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে ক্ষয় হচ্ছে, তাকে E-zone বলে।

Bay

উপসাগর

সাগর বা বিশাল আকারের হ্রদেও স্থলভাগের অভ্যন্তরে ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে সাগরটি তিন দিক থেকে স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। এরূপ এক দিকে সমুদ্র এবং বাকি তিন দিকে স্থলভাগ পরিবেষ্টিত বিশাল জলরাশিকে উপসাগর বলে। যেমন— বঙ্গোপসাগর।

COLD WAVE শৈত্যপ্রবাহ



Cold Wave শৈত্যপ্রবাহ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার হিমালয় আবহাওয়ামণ্ডলীর দেশ। ঋতুচক্রে পৌষ ও মাঘ মাস শীতকাল হলেও দেশের উত্তরাঞ্চলে শীত অনুভূত হয় হেমন্তের আগমন থেকে। শীতকালে বাতাসের তাপমাত্রা যখন ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায়, তখন একে শৈত্যপ্রবাহ বলে। প্রকৃতপক্ষে কোনো কোনো বছর তীব্র শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয় এই পৌষ-মাঘ মাসেই। মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ প্রায় প্রতিবছরই হয়ে থাকে। শীতের শুরু আবহাওয়ায় শৈত্যপ্রবাহে বায়ুমণ্ডল তাপমাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়, পারিপার্শ্বিকতা ঘন কুয়াশায় আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। যেহেতু সূর্যালোক ঘন কুয়াশা ভেদ করতে পারে না, ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়ার মতো পর্যাপ্ত তাপ গ্রহণ করতে পারে না, সেজন্য শীতের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে সর্বনিম্ন

তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৪.১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাস, বাতাসের গতিবেগ, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও কুয়াশা শীতের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে থাকে। উর্ধ্বাকাশের বায়ুপ্রবাহ যখন বাংলাদেশের ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি নেমে আসে তখন দেশ শৈত্যপ্রবাহের কবলে পড়ে। উর্ধ্বাকাশের এই বায়ুপ্রবাহ স্বাভাবিকভাবে থাকার কথা ২৪ হাজার ফুট ওপরে। নিচে নেমে এই বায়ুপ্রবাহ সাগরপৃষ্ঠ থেকে সংগ্রহ করে অপরিমের জলীয় বাষ্প; তারপর তা ছেড়ে দেয়। বাংলাদেশের শীতকালীন বাতাসের মধ্যেই এই আর্দ্র বায়ু শীতের কষ্ট ভয়াবহভাবে বাড়িয়ে দেয়। এই বায়ুস্থ জলীয় বাষ্প আবার নিজস্ব সুগুতাপ ত্যাগ করে ঘন কুয়াশার মতো নেমে পড়ে ভূপৃষ্ঠের বুকে। এই ঘন কুয়াশা আকাশ ঢেকে রাখে দিনরাত। ঘন কুয়াশার স্তর ভেদ করে সূর্যের তাপ ঠিকমতো পৌঁছাতে পারে না ভূপৃষ্ঠে। ফলে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়ার মতো পর্যাপ্ত সূর্যতাপ পায় না। তখন কনকনে শীত অনুভূত হয়। এ ছাড়া উর্ধ্বাকাশের বায়ুপ্রবাহ কখনো কখনো আবার উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত না হয়ে বর্ষাকালীন মৌসুমি বায়ুর মতো দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এই কারণেও শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

তাপমাত্রা ভেদে শৈত্যপ্রবাহ চার প্রকার।

প্রকার	তাপমাত্রা
মৃদু শীত	(৮-১০) ডিগ্রি সে. মধ্যে থাকে
মাঝারি শীত	(৬-৮) ডিগ্রি সে. মধ্যে থাকে
প্রচণ্ড শীত	(৪-৬) ডিগ্রি সে. মধ্যে থাকে
অতীব প্রচণ্ড শীত	৪ ডিগ্রি সে. নিচে নেমে যায়

স্থায়িত্বভেদে শৈত্যপ্রবাহ তিন প্রকার, যথা :
স্থিতিকাল প্রকার
১ থেকে ৩ দিন পর্যন্ত স্বল্পকালীন
৩ থেকে ৫ দিন পর্যন্ত মাঝারি
৫ দিনের অধিক দিন দীর্ঘমেয়াদি

Causes of Cold Wave শৈত্যপ্রবাহের কারণসমূহ

শৈত্যপ্রবাহের কারণসমূহ হলো- সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য হ্রাস, যার ফলে ভূপৃষ্ঠের আবহাওয়ার উষ্ণতাও হ্রাস পায়। ঘন কুয়াশার কারণে সূর্যের আলো ভূপৃষ্ঠে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত বাতাসের আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৯৮% পর্যন্ত এবং গড়ে বাতাসের আর্দ্রতা (৯০-৯৫%) -এর মধ্যে থাকে, ফলে শীতের তীব্রতা বাড়ে। বায়ুদূষণের কারণে বাতাসে ভাসমান কণার সংখ্যাধিক্যের কারণে ঘন হওয়ায় সূর্যালোক ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাতে শীতের প্রকোপ বাড়ে।

শৈত্যপ্রবাহের আরো কিছু কারণ হলো : পৃথিবীর আক্ষিক গতি ও বার্ষিক গতির কারণে সূর্য ক্রমান্বয়ে ২১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে এগুতে থাকে, তখন বাংলাদেশের সূর্যরশ্মি দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বাঁকাভাবে এসে পড়ে এবং তাপমাত্রার তীব্রতা কমতে থাকে। এ সময় দিনের দৈর্ঘ্য কমে রাতের দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। দিনের বেলায় ভূপৃষ্ঠ যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে ও সঞ্চয় করে, রাতে তা বিকিরণ হওয়ার পরও শেষ রাতের দিকে কিছু অধিক পরিমাণ তাপ বিকিরিত হয়। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠ অধিক পরিমাণ তাপ হারানোর ফলে শীতের আবির্ভাব ঘটে। হিমালয় পর্বতমালা বাংলাদেশের উত্তর ও

উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এর হিমেল বাতাসও শৈত্যপ্রবাহের জন্য দায়ী। সুদূর সাইবেরিয়ার উচ্চ চাপ বলয় থেকে বায়ু হিমালয় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে একাংশ হিন্দুকুশ পর্বতের মাঝ দিয়ে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশ হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এই দেশের ওপর দিয়ে এই পশ্চিমা বায়ু দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু শীতের প্রকোপ বাড়ায়। পশ্চিমা বাতাস যদি অনেক দিন স্থিতিশীল হয়, তাহলে শীতের প্রকোপ বাড়ে।

COMMUNITY সমাজ

Community সমাজ

‘কমিউনিটি’-এর শাব্দিক অর্থ জনসমাজ। ধর্ম, বর্ণ বা পেশাগত বিভিন্নতা থাকলেও এলাকার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক সাংস্কৃতিক মনোভাবের মধ্যে যদি মিল থাকে, তাহলে এ রকম একটি এলাকাকে কমিউনিটি বলা হয়। অর্থাৎ কমিউনিটি হচ্ছে, একদল মানুষ, যারা একটি অভিন্ন সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, রীতি লালন-পালন করে এবং একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে। তবে দুর্যোগের ক্ষেত্রে আমাদের বিবেচনা করতে হবে একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীকে, যারা একটি নির্দিষ্ট দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে বা ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় জনগণের অংশগ্রহণ বলতে এমন একটি পরিবেশ বা সুযোগ বোঝায় যেখানে সমাজের সকল স্তরের মানুষ তাদের দক্ষতা, ক্ষমতা, প্রয়োজনীয়তা, দায়িত্ব

ও সম্পদ দিয়ে দুর্যোগ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদান রেখে দুর্যোগ প্রশমন ও উন্নয়নধারাকে ত্বরান্বিত ও প্রভাবিত করে এর সফল বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, জনগণের অংশগ্রহণ হচ্ছে একটা সচেতনতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রক্রিয়া, যেখানে জনগণ ধীরে ধীরে নিজেরাই নিজেদের সমস্যা ও চাহিদা নিরূপণ করে তার সমাধানের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

Community Volunteer সমাজভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক

সমাজভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক একজন প্রশিক্ষিত ব্যক্তি। যিনি কমিউনিটিতে বসবাস করেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কমিউনিটির জন্য কাজ করেন। বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রায় প্রতিবছর কোনো না কোনো অঞ্চলে একটা না একটা দুর্যোগ আঘাত করে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগকে কমিয়ে আনার জন্য সমাজভিত্তিক দুর্যোগ মোকাবিলা কর্মসূচি স্থানীয় পর্যায়ে যুব পুরুষ-মহিলা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেছে। আশ্রয়কেন্দ্রভিত্তিক ২০ জন যুব-পুরুষ ও ১০ জন যুব-মহিলা স্বেচ্ছাসেবক মনোনীত করা হয়ে থাকে। যুব-স্বেচ্ছাসেবক দলকে কাজের সুবিধার্থে আবার ৬টি দলে বিভক্ত করা হয়। দলগুলো হচ্ছে— যোগাযোগ ও জনসংযোগ রক্ষাকারী দল, অনুসন্ধান ও নিরাপত্তা দল, অপসারণ ও উদ্ধারকারী দল, প্রাথমিক চিকিৎসা দল, ত্রাণ ও পুনর্বাসনকারী দল এবং উন্নয়নকারী দল। প্রত্যেক দলের আলাদা আলাদা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

Community Action plan (CAP) সমাজভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

সমাজভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে যাদের জন্য উন্নয়ন করা হবে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমানো বা সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হলো একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা। সমাজভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরির সুবিধা হচ্ছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠী নিজেরাই নিজেদের সমস্যা ও চাহিদা নিরূপণ করতে পারে, স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতা নির্ধারণ করতে পারে, নিজেদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে এবং পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের ফলে দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কর্মকাণ্ডে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়।

কার্যকর পরিকল্পনার অপরিহার্য ধাপটি হলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা, যা পুরো কার্যক্রমের ভিত্তি তৈরি করে। দুর্যোগ মোকাবিলায় সমাজভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা হয়। দুর্যোগ মোকাবিলায় সম্পদ বলতে এখানে তা-ই নির্ধারণ করা হয়, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করে। এর মধ্যে ভৌত অবকাঠামোগত বা বস্তুগত সম্পদ যেমন আছে, তেমনি আছে মানবসম্পদ।

Community Based Disaster Coping Mechanism সমাজভিত্তিক দুর্যোগ মোকাবিলার কৌশল

দুর্যোগের ঝুঁকি ক্রমাগত সমস্ত বিশ্বে বেড়েই চলেছে। গত দুই থেকে তিন

দশকে বিশ্বের জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি অর্থনৈতিক অগ্রগতির চাকাও চলেছে। কিন্তু দুর্যোগের কারণে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং এর দ্বারা প্রভাবিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্যোগের ক্ষতির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর। কমিউনিটির সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রথা, সংস্কৃতি এবং আবহাওয়ার সঙ্গে দুর্যোগের প্রভাব গভীরভাবে সম্পর্কিত। বংশপরম্পরায় দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষ। নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা অর্জন করেছে সেই জ্ঞান, যা তাদের দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সহায়তা করে। যেমন, বন্যাপ্রবণ এলাকার মানুষ মেঘ দেখে বলে দিতে পারে তাদের এলাকায় কবে কী পরিমাণ পানি হতে পারে। এলাকাবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করলে তাদের কাছ থেকে অজানা বিভিন্ন বিষয় জানা যায়, যা তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে বিশ্বাস করে এবং ব্যবহার করে। তাদের এই বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভরও বটে। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী নানা ধরনের কৌশল আয়ত্ত করে। এই সমস্ত কৌশলে তারা বংশপরম্পরায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমটি কেবলমাত্র কারা কীভাবে ত্রাণ সাহায্য থেকে উপকৃত হচ্ছে সেটাই সুনির্দিষ্ট করা নয়, বরং যে অবস্থা দুর্যোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে তা চিহ্নিত করে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ এবং জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণে একটি স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করা যা ওই সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

Community Based Organizations

সমাজভিত্তিক বা স্থানীয় পর্যায়ে সংস্থাসমূহ

যেসব সংস্থা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কমিউনিটির লোকজনের দ্বারা গঠিত হয় সেগুলোকে কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা বলা হয়। যেমন : যুবক সমিতি, কৃষক সমিতি, মহিলা সমিতি প্রভৃতি। সমাজভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-য় এদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও এই কার্যক্রমে অবদান রাখছে স্থানীয় পর্যায়ে যারা দুর্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদার, গ্রাম পুলিশ, পৌরসভার কর্মী, স্কাউট, গার্লস গাইড, রেডক্রস/রেড ক্রিসেন্ট সদস্য ইত্যাদি। সমাজভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় এরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে।

Community Based Disaster Risk Reduction Fund সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস তহবিল

সমাজের দুর্যোগ-ঝুঁকিহ্রাস করার জন্য যে অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয় তাকে সমাজভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস তহবিল বলা হয়ে থাকে। এই তহবিল সংগ্রহ করা হয় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রদানকৃত চাঁদা বা অনুদানের মাধ্যমে। প্রতিমাসে তহবিলে পরিবারপিছু ২ টাকা হারে চাঁদা ব্যবস্থাপনা কমিটির কোষাধ্যক্ষের নিকট হতে রসিদ গ্রহণপূর্বক জমা দেওয়া হয়। সংগৃহীত অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটির ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। এই অর্থ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার, পুকুর খনন, মাটি ভরাটকরণ, বৃক্ষ রোপণ, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হয়ে থাকে।

Community Based Disaster Risk Management (CBDRM)

সমাজভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি

ব্যবস্থাপনা

সমাজভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী নিজেরাই দুর্যোগের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে। যার ফলে একদিকে যেমন তাদের দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস পায় আবার তেমনি দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সমর্থন ও সহযোগিতা আদায়। সুতরাং সমাজভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-র উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিটির সরাসরি অংশগ্রহণে বিপদাপন্নতা কমানো এবং যেসব দুর্যোগের মুখোমুখি তাঁরা হয় সেগুলোর ঝুঁকি মোকাবিলার ক্ষমতা বাড়ানো। অর্থাৎ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, স্থায়িত্বশীল সমাজভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সবার অবদানকে স্বীকার করা, স্থানীয় জনগণের আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি এবং দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা হচ্ছে সমাজভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

স্থায়িত্বশীল কোনো কার্যক্রমের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে কাজ করার মৌলিক শর্তই হচ্ছে মানুষের সক্ষমতার বিকাশ বা মানবসম্পদ উন্নয়ন। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীরই রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু অবদান রাখার সুযোগ।

যেমন- ছাত্র-ছাত্রী বা কিশোর-কিশোরী এবং যুবশক্তির প্রাণচাঞ্চল্য ও কর্মশক্তি, প্রবীণদের অভিজ্ঞতামিশ্রিত জ্ঞান, পরিবারের কল্যাণ ও সংসারের প্রয়োজনীয় অবদান রাখার জন্য নারী-পুরুষের উদ্যোগ ইত্যাদি। সমাজভিত্তিক দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যই হচ্ছে তাদের অবদানকে গ্রহণ ও স্বীকৃতি দেয়া, যাতে এরা সবাই দুর্যোগ মোকাবিলায় কিছু না কিছু ভূমিকা রাখতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যমূল জনগোষ্ঠী নয়, এই প্রক্রিয়ার পুরো সফলতা লাভের জন্য সরকার ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যিক।

COPING খাপ খাইয়ে নেয়া



Coping খাপ খাইয়ে নেয়া

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়, Coping হলো ধারা বা রীতি যেখানে মানুষ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল অর্জন করে। ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার মানুষ ঘর

তৈরির সময়ই চালের সঙ্গে 'টানা' বেঁধে রাখে, যাতে বাতাসে ঘরের চাল উড়িয়ে নিতে না পারে। নিচু অঞ্চলের মানুষ ঘর তৈরির ক্ষেত্রে সব সময় আগে ভিটা উঁচু করে থাকে। ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার ঘরবাড়ি বা স্কুলগৃহের ধরন অন্য এলাকা থেকে খানিকটা ভিন্ন। দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে যারা বংশপরম্পরায় টিকে থাকেন তারা নিজেরাই খুঁজে বের করেছেন দুর্যোগের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য আগাম সতর্ক করবার পদ্ধতি এবং ক্ষয়ক্ষতি কমাবার কৌশল। বংশপরম্পরায় মানুষ তা মেনে চলে।

Coping Capacity খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ বা সংগঠন পর্যায়ে সম্পদ ব্যবহার করে প্রতিকূল অবস্থা থেকে তাদের দুর্যোগ মোকাবিলা করার সামর্থ্যকে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা/মোকাবিলা করার ক্ষমতা বা Coping Capacity বলে।

Coping Mechanism খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল

দুর্যোগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল বলতে বোঝায়, যার মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠী বা সংগঠন যেকোনো ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় সফলতা লাভের জন্য বিদ্যমান সম্পদ ও সুযোগগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগায়। খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি-হ্রাসকরণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্থায়িত্বশীল প্রকল্প বাস্তবায়নে এই কৌশল উপযুক্ত, কেননা এটি স্থানীয় দক্ষতা ও সম্পদের ওপর নির্ভরশীল।

খাপ খাইয়ে নেয়ার বা মোকাবিলা করার কৌশল আয়ত্ত করবার জন্য প্রথমাই দুর্যোগের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা হয়। তারপর পূর্বে ঘটে যাওয়া দুর্যোগসমূহের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। দুর্যোগের ধারা এবং সেই সমস্ত দুর্যোগ কেন হয়েছিল বলে স্থানীয় জনগণ মনে করে তা বিশ্লেষণ করা হয়। এরপর এলাকার বিভিন্ন দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। বিগত দুর্যোগসমূহে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে স্থানীয় জনগণ কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল সেই অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয় এবং সেই সঙ্গে নিকট অতীতে সংঘটিত দুর্যোগের এমন কোনো ঘটনা খুঁজে বের করা হয়, যেখানে সফলভাবে কোনো ব্যক্তি-পরিবার-গোষ্ঠী নির্দিষ্ট কোনো কৌশল অবলম্বন করে দুর্যোগের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করেছেন বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমাতে পেরেছেন। এরপর দুর্যোগে চিহ্নিত সমস্যার পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠী নিজেরাই দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার জন্য বংশপরম্পরায় প্রবহমান একটি ধারা বা রীতি সূচনা করেন।

Indigenous Coping Mechanism

লোকজ খাপ খাইয়ে নেয়ার পদ্ধতি

একটি কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের লোকজ জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাবিত কৌশল যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সহায়ক। এ ধরনের কৌশল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই আচরণ ও পদ্ধতিগুলো তাদের অভিজ্ঞতা, সামাজিক অবকাঠামো, সম্পদ, নীতি, মূল্যবোধ ও সক্ষমতার সম্মিলিত প্রয়াস।

Coping Capacity at Family Level

পরিবার পর্যায়ে খাপ খাওয়ানোর কৌশল

পরিবার পর্যায়ে খাপ খাওয়ানোর কৌশল বলতে এখানে নির্দিষ্ট একটি দুর্ভোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় পরিবারের নিজস্ব ক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে। এই ক্ষমতা প্রকৃত অর্থে কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, যেমন- পরিবার পর্যায়ে সম্বল, অনানুষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ, মার্কেট লিংকেজ ইত্যাদি। প্রসঙ্গত, মার্কেট লিংকেজ হচ্ছে সেই ব্যবস্থা, যা বাকিতে পণ্য ক্রয়ের নিশ্চয়তা বিধান করে।

Coping Capacity at Community level

কমিউনিটি পর্যায়ে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল

কমিউনিটি পর্যায়ে মোকাবিলা করার সামর্থ্য বলতে এখানে সামগ্রিকভাবে দুর্ভোগ মোকাবিলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে। এটিও কমিউনিটির মধ্যকার সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবেশাধিকার, সেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে সখ্য, মার্কেট লিংকেজ, কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতা প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। দুর্ভোগের ব্যাপকতা থেকে নিজেদের রক্ষা করে টিকে থাকার জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে কমিটি গঠন, বিপদ বিশ্লেষণ, সতর্ক থাকা, আগাম সংবাদ জানা ইত্যাদি জরুরি।

Community Risk Assessment (CRA) সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ



Community Risk Assessment সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ

সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ (Community Risk Assessment) একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যা অনুশীলনের মাধ্যমে আপদ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ও তা সাফল্যের সাথে আয়ত্ত করার কৌশল এবং ঝুঁকি নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করা হয়। সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে স্থানীয় সকল পেশা ও শ্রেণীর নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য একান্ত প্রয়োজন। এটা অনস্বীকার্য যে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা এবং তা নিরসনের কৌশল আলাদা। সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে ঝুঁকি চিহ্নিত করা, সমাধানের ব্যাপারে

ঐকমত্যে পৌঁছানো, সমাধানের প্রভাব বিশ্লেষণ করা এবং সর্বশেষে একটি বাস্তবায়নযোগ্য ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতিতে একে অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান দেখানোকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীগণ এলাকার আপদ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সম্ভাব্য ঝুঁকিহ্রাসের কৌশল নির্ধারণ করেন। অতঃপর সকল পেশা ও শ্রেণীর (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি আপদের ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ প্রক্রিয়ায় যেহেতু সকল পেশা ও শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব থাকে এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে স্ব স্ব শ্রেণীর মতামত আলোচিত ও গৃহীত হবার সুযোগ থাকে সেহেতু একটি টেকসই ও গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা যায়। ফলে বাস্তবায়নের সময় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। তদুপরি, কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে স্থানীয় জনগণই তা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিটি পদক্ষেপে (ঝুঁকিহ্রাস চিহ্নিতকরণ, সম্ভাব্য ঝুঁকিহ্রাসের উপযোগী কৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং সম্পদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা) তাদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব অনুভব করে। ফলে পরিবর্তিত বাস্তবায়ন পর্যায়েও তারা ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।

Community Risk Reduction Planning

সমাজভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা

সমাজভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা হচ্ছে এমন একটি পরিকল্পনা যা কমিউনিটির

বিদ্যমান আপদ, ঝুঁকি, ক্ষমতা ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠী জানে ও তারা অনুমোদন করে। অন্য যেকোনো পরিকল্পনার মতো এই পরিকল্পনাও SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time bound) হতে হবে।

Implementation of CRA Method

সিআরএ পদ্ধতির বাস্তবায়ন

যখন এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যেমন- গরিব কৃষক, মৎস্যজীবী, ভূমিহীন, মহিলা, বৃদ্ধ, শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিগণ আপদ-সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির কারণে বিপদাপন্ন হন তখন জন-অংশগ্রহণভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ (সিআরএ) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি অংশগ্রহণমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ক্রমবর্ধমান আপদ সংঘটনের হার এবং তদসংশ্লিষ্ট ঝুঁকির কারণে জীবন-জীবিকা ও সম্পদের বিপদাপন্নতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে স্থানীয় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি ঝুঁকিহ্রাসের উপযোগী কৌশল নির্ধারণ করা অপরিহার্য, যেখানে স্থানীয় সকল পক্ষের প্রতিনিধিগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পসমূহে টেকসই ঝুঁকিহ্রাস প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশে যেকোনো আপদের ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে সরকারি সংস্থাসমূহ মূল ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়াও দরিদ্র ও

বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করে, যাদের জন্য সিআরএ একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। সিআরএ ঝুঁকিহাসের লক্ষ্য অর্জনে বিপদাপন্ন মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সিআরএর দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিহাস পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভিন্ন পেশাজীবী জনগোষ্ঠী, সংস্থা এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

Participants of CRA সিআরএর অংশগ্রহণকারী

জন-অংশগ্রহণভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ (সিআরএ) প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই পক্ষের অংশগ্রহণই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যক্ষ পক্ষ যেমন- নারী-পুরুষ নির্বেশেষে মৎস্যজীবী, কৃষক, শারীরিকভাবে অক্ষম, বয়স্ক ব্যক্তি, গৃহিণী ও অন্যান্য পেশার মহিলা, ভূমিহীন প্রভৃতি। এরা এলাকায় বসবাস করেন এবং কোনো আপদে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হন।

পরোক্ষ পক্ষ তাদের বলা হয়, যারা সরাসরি কোনো আপদে ক্ষতিগ্রস্ত হন না কিন্তু পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দিয়ে থাকেন। যেমন- এলাকার অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবৃন্দ, সরকারি, বেসরকারি সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহ ইত্যাদি।

জন-অংশগ্রহণভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন পক্ষের ধরন স্থানীয় এলাকা, পেশা, জনগোষ্ঠী ও সিআরএ পরিচালনার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন হতে পারে। সিআরএ-তে অংশগ্রহণকারী পক্ষের সদস্যসংখ্যা ও ধরন কী হবে তা সিআরএর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের

আলোকে এবং সামাজিক পরিধির ওপর ভিত্তি করে ঠিক করতে হবে।

Important Steps of CRA সিআরএর গুরুত্বপূর্ণ ধাপসমূহ

- স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও এলাকা সম্পর্কে জানা
- আপদ ও বিপদাপন্নতা, সামাজিক উপাদান ও এলাকা চিহ্নিত করা
- ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা
- ঝুঁকিহাসের কৌশল নির্ধারণ করা
- কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐকমত্য হওয়া
- বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

Use of CRA সিআরএর ব্যবহার

সরকার বর্তমানে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সেদিক দিয়ে সরকার এ পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারকারী হতে পারে। সিআরএ একটি সমন্বিত পদ্ধতি, যা আপদ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহাস কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ, বিশেষভাবে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির (সিডিএমপি) সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেখানে জনগণের অংশগ্রহণই মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। যে সকল সংস্থা অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের জন্যও এ প্রক্রিয়া পরিকল্পনা প্রণয়নে সিআরএর ব্যবহার তিনটি পর্যায়ে হতে পারে। যেমন-

- স্থানীয় পর্যায়ে
- আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং
- জাতীয় পর্যায়ে

CONTINGENCY PLAN আপদকালীন পরিকল্পনা

Contingency Plan আপদকালীন পরিকল্পনা

আপদকালীন পরিকল্পনা হচ্ছে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি আগাম পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলার একটি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি স্থির করা হয়। বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের কাছে আপদকালীন পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, এ ধরনের পরিকল্পনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজকে এমন একটি কাঠামোর মাধ্যমে বিন্যস্ত করে, যাতে জনগণ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা সফলভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার এ ধরনের আগাম পরিকল্পনা মূলত একটি দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক উপকরণ। একটি আপদকালীন পরিকল্পনাতে যে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়, সেগুলো হলো:

- ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ
- চাহিদা নিরূপণ (দ্রুত দুর্যোগপ্রবণ জনগোষ্ঠীর)
- সম্পদ সংগ্রহের পরিকল্পনা
- দায়িত্ব বণ্টন
- সংগঠন, সমাজ ও পরিবার

বিভিন্ন স্তরে প্রস্তুতি গ্রহণের কর্মসূচি পরিকল্পনা

আপদকালীন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে- দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন স্তরে সাংগঠনিক প্রস্তুতি; সম্ভাব্য

দুর্যোগের প্রভাব, বিস্তৃতি ও জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিরূপণ; সংগঠনের/সংস্থার বিভিন্ন স্তরে প্রস্তুতি ও দায়িত্ব বণ্টন/অংশগ্রহণের কাঠামো প্রণয়ন; বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার পরিকল্পনা প্রণয়ন; জনগোষ্ঠী, দাতা সংস্থা ও অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা; সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল নিরূপণ এবং এর উৎস চিহ্নিতকরণ; সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য একটি সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত পরিকল্পনা প্রণয়ন।

Basis of Contingency Planning আপদকালীন পরিকল্পনার ভিত্তি

একটি আপদকালীন পরিকল্পনায় বিভিন্ন উপাদান ও পদ্ধতি সমন্বিত হয়। এগুলোর মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি হলো: আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি গ্রহণ; ইতোপূর্বে সংগঠিত দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বিশ্লেষণ করে কর্ম-এলাকার একটি বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ তৈরি করা; জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা বিশ্লেষণের জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ; জনগোষ্ঠী ও সংগঠন স্তরে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি; দাতা সংস্থা/সহযোগী সংগঠনগুলোর কাছ থেকে সম্ভাব্য সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা;

আপদকালীন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:

- এই পরিকল্পনাকে অবশ্যই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

- এই পরিকল্পনা হবে সুনির্দিষ্ট, বাস্তবসম্মত এবং তথ্যভিত্তিক।
- নমনীয়/প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিবর্তনযোগ্য।
- স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- জনগোষ্ঠীর চাহিদার ভিত্তিতে তৈরি।
- পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ে/স্তরে ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা।
- সংগঠনের বাস্তবায়ন সক্ষমতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করতে কয়েকটি স্তর বা ধাপ অনুসরণ করা হয়। এই স্তর বা ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

1. Determining the Aim, Objectives and Action Plan of Contingency Plan

আপদকালীন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা

আপদকালীন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম ধাপ। সংগঠনের নীতিনির্ধারক ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে আপদকালীন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানতে হবে। এর মাধ্যমে পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্যকে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে, যাতে উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংগতি ও সাদৃশ্য থাকে। অর্থাৎ, একটি আদর্শ আপদকালীন পরিকল্পনা সংগঠনের নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ও পরিপূরক হওয়া চাই।

2. Timeframe সময়সীমা

যেকোনো পরিকল্পনা প্রণয়নে সময়সীমা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, এই পরিকল্পনা পরবর্তী বছরে সম্ভাব্য সব দুর্ঘটনা মোকাবিলা করার জন্য তৈরি, নাকি উক্ত সময়ের সম্ভাব্য কোনো সুনির্দিষ্ট দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য তৈরি, তা নির্ধারণ করে নেয়া প্রয়োজন। Contingency plan তৈরি করার পর তা প্রতি বছরই হালনাগাদ করার Provision রাখতে হবে।

3. Formation of Appropriate Organizational Framework for Disaster management

দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি

সংগঠনের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংগঠনের মধ্যে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মদল গঠন করবেন। এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দলটিকে বলা যেতে পারে— ‘দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা কমিটি’। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠনের ক্ষেত্রে, সংগঠনের নির্বাহী প্রধান উক্ত কমিটির প্রধান থাকবেন। তবে যে সকল সংস্থার পৃথক পৃথক দুর্ঘটনা সেল/ইউনিট/কর্মসূচি রয়েছে, সেখানে উক্ত ইউনিট/কর্মসূচি প্রধানই কমিটি প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। এ ধরনের কমিটি সংস্থার আঞ্চলিক/শাখা পর্যায়ে গঠিত হতে পারে, যেখানে আঞ্চলিক প্রধান/শাখা ব্যবস্থাপক কমিটি প্রধানের ভূমিকা পালন করবেন। অর্থাৎ দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা দল/কমিটি গঠিত হতে পারে সংগঠন পর্যায়ে, জেলা/উপজেলা পর্যায়ে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে।

4. Contact Person Selection যোগাযোগ সংযোগকারী নির্বাচন

দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতি স্তরে একজন ব্যক্তি নির্ধারণ করতে হবে, যার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। এ ধরনের ব্যক্তি নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে তিনি বিভিন্ন ধরনের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এবং তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারেন। যোগাযোগের জন্য এ ধরনের ব্যক্তি সংগঠন থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত নির্ধারণ করতে হবে। কার্যকর যোগাযোগের জন্য যোগাযোগকারীকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সুবিধা/সহযোগিতা দিতে হবে।

5. Vulnerability Assessment বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ

বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগোষ্ঠী, সম্পদ ও পরিবেশের ওপর দুর্ঘটনের ধরন ও প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় অবকাঠামোগত, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমির আলোকে দুর্ঘটনের প্রভাবসমূহ বিশ্লেষণ করা যায়।

6. Conception about the possible result/Impact of disaster and community need assessment- দুর্ঘটনের সম্ভাব্য ফলাফল/প্রভাব সম্পর্কে ধারণা অর্জন এবং জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিরূপণ

আপদকালীন পরিকল্পনার ২টি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো : দুর্ঘটনের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে জানা এবং জনগোষ্ঠীর চাহিদা

নিরূপণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই কোনো নির্দিষ্ট এলাকার দুর্ঘটনা সংগঠনের ইতিহাস/ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই বিশ্লেষণের মধ্যে থাকবে কতটুকু এলাকা জুড়ে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, কত জনসংখ্যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, দুর্ঘটনের সময়সীমা এবং দুর্ঘটনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত উদ্যোগের সামর্থ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি। চাহিদা নিরূপণ প্রক্রিয়ায় দুর্ঘটনাকবলিত এলাকার প্রাথমিক ও অন্যান্য সহায়ক তথ্যাবলি প্রয়োজন হয়। এসকল তথ্য দলভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে (FGD) অংশগ্রহণমূলক ভিত্তিতে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। অতঃপর সংগৃহীত তথ্যাবলি দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা কমিটি বিশ্লেষণ করে উক্ত এলাকায় দুর্ঘটনের সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ করবে। সম্ভাব্য প্রভাবের ভিত্তিতে এই কমিটি চাহিদা নিরূপণ করবে। চাহিদা নিরূপণ প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীর নির্ভরশীল অংশ যেমন— প্রতিবন্ধী, শিশু, অসুস্থ ও প্রসূতি মায়েদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেবা ও সহায়ক সুবিধাদি তাদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে। চাহিদা নিরূপণ প্রক্রিয়ায় ‘স্ফিয়ার’ (SPHERE) পদ্ধতির প্রয়োগ সর্বোত্তম।

7. Resource Mobilization সম্পদ যোগান/সম্পদ সমাবেশকরণ

সম্ভাব্য প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে সম্পদ যোগান প্রক্রিয়ার কাজ করতে হবে। একক সম্পদ, জনগোষ্ঠীর সম্পদ, সংগঠনের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি ও দাতা সংস্থার সম্পদের ভিত্তিতে সম্পদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করতে হবে। দাতাসংস্থার কাছ থেকে

কতটুকু সম্পদ ও সহযোগিতা পাওয়া যাবে তা বিবেচনা করার ক্ষেত্রে পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে, এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উচ্চাশা পোষণ না করাই ভালো এবং দাতাগোষ্ঠী/সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদের তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচ্য :

ক. বিদ্যমান সম্পদ

১. সংস্থার নিজস্ব মজুদ

২. জনগোষ্ঠীভিত্তিক মজুদ

খ. স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ

১. জনগোষ্ঠীভিত্তিক সংগ্রহ

গ. সম্পদ/সহযোগিতার জন্য দাতা-সংস্থার কাছে আবেদন (উপযুক্ত মূল্যায়ন নিরূপণ করে)।

8. Storage of Relief Materials

ত্রাণসামগ্রী মজুদকরণ

সম্ভাব্য দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সুবিধাজনক গুদামের অবস্থান ও ধারণক্ষমতা সংক্রান্ত তথ্যাবলি যোগাড় করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে কীভাবে গুদামের নিরাপত্তা এবং যোগাযোগ করা যায়— এরূপ ব্যক্তি বা সংস্থা নির্ধারণ করতে হবে।

9. Inputs/Materials Supply

প্রয়োজনীয় উপকরণ/দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ দুর্যোগের ধরন ও চাহিদার ভিত্তিতে, এই পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ/দ্রব্যসামগ্রী চিহ্নিত করতে হবে। দুর্যোগকালীন দ্রুত সরবরাহ ও বিতরণব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সরবরাহকারীর তালিকা তৈরি করা আবশ্যিক। এজন্য, সরবরাহকারীর নাম ও

টেলিফোন নম্বরসহ বিস্তারিত ঠিকানা সংবলিত তালিকা প্রস্তুত রাখতে হবে এবং সময় সময় এই ঠিকানা/তালিকা হালনাগাদ করতে হবে।

10. Coordination

সমন্বয়

পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভাগ ও সংগঠনগুলোকে একীভূত করার প্রক্রিয়াকে Coordination বা সমন্বয় বলা হয়। এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দলগত কোনো উদ্যোগের সমন্বিত ফলাফলকে প্রয়োগ করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বয়ের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ :

- এনজিও-এনজিও/সিবিও
- এনজিও-জিও
- এনজিও-সুশীল সমাজ

11. Monitoring Mechanism

পরিবীক্ষণ পদ্ধতি

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান ঠিক রয়েছে কি না এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে বাজেট বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কি না এগুলো নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় ২টি পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। প্রথমত, সংগঠনের কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল পরিবীক্ষণ কৌশল নির্ধারণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেলের সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিবীক্ষণ কৌশল নির্ধারণ করতে পারে। তবে দুর্যোগ

ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত যেকোনো পরিবীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় অনুশীলন পদ্ধতিতে প্রকল্পের সকল স্তরের স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সর্বস্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

12. Budget Preparation

বাজেট প্রস্তুতি

বাজেট প্রস্তুত করা আপদকালীন/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সংগঠনের পুরো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/কমিটির সকল সদস্য একই সঙ্গে বসে বাজেট তৈরি করবেন। বাজেট প্রস্তুতির ক্ষেত্রে পরিকল্পনার প্রত্যেক ধাপে সম্ভাব্য ব্যয় বিবেচনায় রাখতে হবে। বিশেষ করে, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, যেমন— বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ, গুদামজাতকরণের সুবিধা, বিতরণ ব্যবস্থা, উদ্ধার কাজ, অপসারণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার ব্যয় বাজেট প্রস্তুতির সময় বিবেচনায় রাখতে হবে।

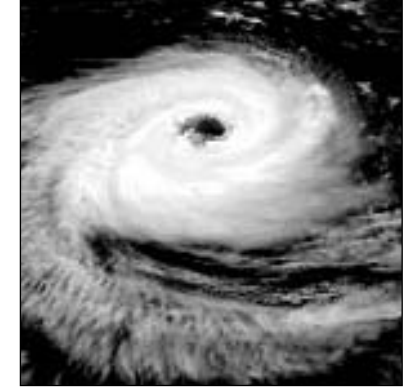
13. Evaluation

মূল্যায়ন

এই পর্যায়ে সংস্থার উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল গোটা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মূল্যায়ন করে সদস্যবৃন্দ এর ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনে এর সংশোধন ও সংযোজনের জন্য সুপারিশ রাখবেন। এর ফলে উক্ত পরিকল্পনাটি হবে আরো বাস্তবমুখী ও কার্যকর।

CYCLONE

ঘূর্ণিঝড়



Cyclone

ঘূর্ণিঝড়

প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড় হলো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় বা বায়ুমণ্ডলীয় একটি উত্তাল অবস্থা, যা বাতাসের প্রচণ্ড ঘূর্ণায়মান গতির ফলে সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ (Cyclone) গ্রিক শব্দ ‘কাইক্লোস’ (kyk-los) থেকে এসেছে। কাইক্লোস শব্দের অর্থ কুণ্ডলী পাকানো সাপ। স্থানীয় ভাষায় ঘূর্ণিঝড়কে তুফান বলা হয়।

অত্যধিক গরম ও তীব্র রোদের কারণে কোনো স্থানের বাতাস হালকা হয়ে ওপরে উঠে গেলে ওই স্থানে বাতাসের চাপ কমে ফাঁকা হয়ে যায় আর সেই ফাঁকা জায়গা দখল করতে তীব্র বেগে চারদিক থেকে মেঘ বৃষ্টিসহ ঘুরতে ঘুরতে ছুটে আসা ভারি বাতাস ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করে। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় গভীর সমুদ্রে আর তার জন্য দরকার সমুদ্রের

২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা তার চেয়েও বেশি তাপমাত্রা। যে সকল সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কম সে সকল সমুদ্রে খুব একটা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে দেখা যায় না। বাংলাদেশে সাধারণত বর্ষা মৌসুমের আগে ও পরে উষ্ণতার কারণে সাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। আর নিম্নচাপ থেকেই ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম হয়। সাগরে কোথাও নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে আশপাশের অঞ্চল থেকে বাতাস নিম্নচাপ অঞ্চলে ছুটে আসে। বাতাস দ্রুত পাক খায় আর ওপরের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় যে জলীয়বাষ্পের সৃষ্টি হয় তা ক্রমশ আরও ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। ঘূর্ণিঝড়কে এই মেঘ আরও শক্তিশালী করে তোলে। ঘূর্ণিঝড় উপকূল থেকে যত দূরে সৃষ্টি হয় তার শক্তি তত বেশি থাকে। স্থলভাগে আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় ক্রমশ নিশ্বেজ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গ্রীষ্মকালের শুরু এবং শেষের সময় সবচেয়ে বেশি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাংলা বছরের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (ইংরেজি এপ্রিল-মে) এবং আশ্বিন-কার্তিক (ইংরেজি অক্টোবর-নভেম্বর) মাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়ে থাকে। বছরের অন্যান্য সময়ও ঘূর্ণিঝড় হয়, তবে তার সংখ্যা ও শক্তি উভয়ই উল্লিখিত সময়ে সৃষ্টি ঘূর্ণিঝড়ের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম হয়।

দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে কিংবা আন্দামান অথবা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নিকটে সৃষ্টি নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়ে উত্তর দিকে সরে আসে তখন তার পশ্চিম ও পূর্বদিকে পাহাড়ি স্থলভাগ থাকায় সে সমুদ্রপৃষ্ঠে উত্তর দিকে যতই স্থান পরিবর্তন করতে থাকে ততই সে

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কাছাকাছি এসে পৌঁছায়। বঙ্গোপসাগর যেহেতু বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত, কাজেই ঘূর্ণিঝড়টি দক্ষিণ দিক থেকেই আসে। হাজার মাইল দক্ষিণে নিম্নচাপ থেকে সৃষ্টি ঘূর্ণিঝড়টি দক্ষিণ দিক থেকে এসে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। আবার কোনো কোনো সময় দিক পরিবর্তন করে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে।

Causes of Cyclone

ঘূর্ণিঝড়ের কারণসমূহ

ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি বা সংঘটনের প্রকৃত কারণ আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে অনেক পরিবেশবিজ্ঞানীর ধারণা, উত্তাপের তারতম্য এবং বিভিন্ন মানবসৃষ্ট কারণে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। সাধারণত বায়ুমণ্ডলের তাপ ও চাপের অসমতা ছাড়াও আরও বহুবিধ স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক রয়েছে। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জ গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্যতাপের কারণে বেশ উত্তপ্ত হয়। যার ফলে সেখানে বায়ুচাপ কমে যায় এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এরূপ নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে শীতল জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুপ্রবাহের ফলে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। নিম্নে বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলবর্তী এলাকায় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির প্রধান কারণগুলো আলোচনা করা হলো :

- বঙ্গোপসাগর ১০৫০ মাইল বিস্তৃত। এর পরিসর দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে ক্রমশ সংকুচিত। এজন্য এর উপকূলে ঝড়ের তীব্রতা বেশি। তা ছাড়া এ উপকূলীয় এলাকায় প্রবালদ্বীপ না থাকায়

জলোচ্ছ্বাস মারাত্মক আকার ধারণ করে।

- বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলীয় এলাকায় তথা বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বর্ষার পূর্বে এবং পরে সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় এবং বাতাস গরম ও হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় এবং নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই এখানে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়।
- বনশূন্যতা যেকোনো এলাকায় পরিবেশের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে অস্বাভাবিক হারে উপকূলীয় এমনকি পাহাড়ি এলাকার বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে। যার ফলে এ এলাকায় বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ভৌগোলিক কারণেও এ বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়।

বাতাসের বেগ অনুসারে আমাদের অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়কে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে :

১. লঘু চাপ : (বাতাসের গতিবেগ যখন ঘণ্টায় ৩১ কি.মি. বা এর উপরে)
২. নিম্নচাপ : (বাতাসের গতিবেগ যখন ঘণ্টায় ৩১-৫০ কি.মি.)
২. গভীর নিম্নচাপ : (বাতাসের গতিবেগ যখন ঘণ্টায় ৫১-৬১ কি.মি.)
৩. ঘূর্ণিঝড় : (বাতাসের গতিবেগ যখন ঘণ্টায় ৬২ থেকে ৬৮ কি.মি.)
৪. প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় : (বাতাসের গতিবেগ যখন ঘণ্টায় ৮৯ থেকে ১১৭ কি.মি.)
৫. সুপার সাইক্লোন : (বাতাসের

গতিবেগ যখন ঘণ্টায় ১১৮ থেকে ১২০ কি.মি.)

৬. প্রবল ঘূর্ণিঝড় : ২২১ কিলোমিটারের অধিক

Eye of Cyclone

ঘূর্ণিঝড়ের চোখ

ঘূর্ণিঝড়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর চোখ। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে এবং তার নিকটবর্তী স্থানসমূহে বাতাসের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম থাকে। ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যস্থানে এই কম বায়ুবেগের স্থানটিকেই ঘূর্ণিঝড়ের চোখ বলা হয়। এটা সবচেয়ে কম চাপ এলাকায় অবস্থিত এবং এর ব্যাস ১০ থেকে ৪০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণত মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়েই চোখ দেখা যায়। চোখ ঝড়ের অন্যান্য অংশের চেয়ে ১০-১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি উত্তপ্ত থাকে। চোখে বাতাসের গতিবেগ খুব কম হয়, সাধারণত প্রতি ঘণ্টায় ১৫-২০ মাইলের বেশি নয় এবং এখানে মেঘ ভাসমান থাকলেও বৃষ্টি প্রায় অনুপস্থিত থাকে। আবার চোখের ঠিক বাইরের অঞ্চলেই বাতাসের বেগ সবচেয়ে বেশি এবং বৃষ্টির পরিমাণও বেশি হয়। সবচেয়ে বেশি বাতাসের এলাকা থেকে কেন্দ্রের বাইরের দিকে বেড়ে গেলেই বাতাসের গতিবেগ ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

ঘূর্ণিঝড়ের আকার

ঘূর্ণিঝড়ের মূল এলাকাটি গোলাকার থাকে এবং তার ব্যাস ১০০ থেকে ৬০০ মাইল পর্যন্ত হয়। মূল ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে একাধিক ব্যান্ডসহ লেজ থাকে। এতে সমস্ত কাঠামো একটা কুণ্ডলীর আকার ধারণ করে। ঘূর্ণিঝড়কে অনেকটা উল্টো কমার মতো দেখায়। ঘূর্ণিঝড়ের লেজ কয়েক শত মাইল

পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। মূল কেন্দ্রের অনেক আগেই এই লেজ স্থলভূমি অতিক্রম করে, আকাশে মেঘ দেখা দেয় এবং বৃষ্টিপাত হয়। এই সমস্ত লক্ষণ সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের আক্রমণের পূর্বাভাস হিসেবে কাজ করতে পারে।

Duration and Speed of Cyclone

ঘূর্ণিঝড়ের স্থায়িত্ব ও গতি

সাগরের বুকে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ১ সপ্তাহ পরেও উপকূল অতিক্রম করতে পারে আবার দু-এক দিনের মধ্যেও এর পরিসমাপ্তি পরিলক্ষিত হয়েছে। অনেক সময় তা দু-এক দিন এক স্থানে স্থির হয়েও থাকে। ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ দুটো। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের মাঝে বাতাসের গতিবেগ, অপরটি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের স্থান পরিবর্তনের গতিবেগ। ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে বাতাসের গতিবেগ ১৫০ মাইল পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। অপর দিকে ঘূর্ণিঝড়ের স্থান পরিবর্তনের গতিবেগ সর্বোচ্চ ২৫ মাইল। অনেক সময় ঘূর্ণিঝড় স্থান পরিবর্তন করে না এবং এক স্থানেই স্থির অবস্থায় থাকে। ঘূর্ণিঝড়ের এগিয়ে চলার ধরনকে ঘুরন্ত লাটিমের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ঘুরন্ত লাটিমের যেমন একদিকে নিজের শরীর ঘোরার গতি রয়েছে, তেমনি তার আবার রয়েছে স্থান পরিবর্তনের আলাদা গতি। লাটিমের ক্ষেত্রেও ঘূর্ণিঝড়ের মতোই স্থান পরিবর্তনের চেয়ে শরীরের গতিবেগ অনেক বেশি। লাটিম যেমন অনেক সময় স্থান পরিবর্তন করে না এবং একই জায়গায় ঘোরে, ঘূর্ণিঝড়ও ঠিক একইভাবে অনেক সময় স্থান পরিবর্তন না করে স্থিরভাবে একই স্থানে ঘুরতে থাকে।

Tidal surge জলোচ্ছ্বাস

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসের সম্পর্ক থাকেই। ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে জলোচ্ছ্বাস হলে জানমালের ক্ষতি বেশি হয়। যেখানে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় সেই ঘূর্ণিঝড়-কেন্দ্র বা চক্ষু এলাকায় বাতাসের চাপ কম থাকে। ফলে ঘূর্ণিঝড়-কেন্দ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে সমুদ্রের পানি ফুটে ওঠে, একেই জলোচ্ছ্বাস বলে। ঝড়ে সমুদ্রের বুকে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে জোয়ারের পানি বৃদ্ধি পেয়ে সমুদ্র উপকূলে আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ের তীব্র বাতাসে সৃষ্ট সমুদ্রের ঢেউ স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে অনেক বেশি হয়। আর তা যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় হয়, তাহলে এ জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা আরও অনেক বেশি হয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের ঢেউ ৪৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে দেখা গেছে। জলোচ্ছ্বাসের এই বিশাল ঢেউ উপকূলের ঘরবাড়ি, মানুষজন, পশুপাখি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মারা পড়ে হাজার হাজার মানুষ আর পশুপাখি।

সমুদ্র বন্দরের জন্য পুনর্বিন্যস্ত সংকেত

দূরবর্তী সতর্ক সংকেত- ১ : এ সময় বাতাসের গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ৫১-৬১ কিলোমিটার। এটি দূরবর্তী সমুদ্রের জন্য প্রযোজ্য হবে। এটি মূলত দূরে গভীর সাগরে ঝড়ো হাওয়ার যে অঞ্চল রয়েছে, যেখানের বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৬১ কিলোমিটার এবং তা সামুদ্রিক ঝড়ে পরিণত হতে পারে। এর ফলে বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে যাবার পরে জাহাজটি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে পারে। সংশ্লিষ্টদের যে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

এ সতর্ক সংকেতটি নদী বন্দরের জন্য প্রযোজ্য নয়।

দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত-২ : এ সময় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার। এটি মূলত ১নং দূরবর্তী সতর্ক সংকেতের মতো দূরবর্তী সমুদ্রের জন্য প্রযোজ্য। দূরে গভীর সাগরে ঝড় সৃষ্টি হয়েছে যেখানের বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার। এর ফলে বন্দর এখনই ঝড়ে কবলিত হবে না। তবে বন্দর ত্যাগকারী জাহাজ পথের মাঝে ঝড়ো হাওয়ায় পড়তে পারে। এ সময় মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে হবে যাতে স্বল্প সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারে। এ সতর্ক সংকেতটি নদীবন্দরের জন্য প্রযোজ্য নয়।

স্থানীয় সতর্ক সংকেত- ৩ : এটি সমুদ্র বন্দর উপকূলীয় অঞ্চল ও নদী বন্দরের জন্য প্রযোজ্য হবে। এর ফলে বন্দর ও বন্দরের আশেপাশের এলাকায় ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগের ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। ঝড়ো হাওয়ার কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী ৬৫ ফুট এবং এর কম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নৌযানগুলোকে অতি সত্বর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।

স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত- ৪ : এটি সমুদ্র বন্দর ও উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হবে। এর ফলে বন্দর ও আশেপাশের এলাকা ঘূর্ণিঝড় কবলিত। বাতাসের সম্ভাব্য গতিবেগ ঘণ্টায় ৫১-৬১ কিলোমিটার। ঘূর্ণিঝড়ের চূড়ান্ত প্রস্ততি নেয়ার মতো বিপজ্জনক সময় এখনো আসেনি। ১৫০ ফুট

এবং এর কম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট যে সকল নৌযান ঘণ্টায় ৬১ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত ঝড়ো হাওয়া প্রতিরোধে সক্ষম নয় সে সকল নৌযানকে অনতিবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।

■ ৪নং স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেখানোর পর খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে ঘূর্ণিঝড় প্রস্ততি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সারাদেশে করণীয় সম্পর্কে এ সভা দিকনির্দেশনা দেবে। ৪নং হুঁশিয়ারি সংকেত দেখানোর পর থেকেই সংশ্লিষ্ট জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ সভায় মিলিত হবে এবং তাদের এলাকার কথা হুঁশিয়ারি সংকেতে উল্লেখ থাকলে দুর্যোগ মোকাবিলায় সম্ভাব্য সকল প্রস্ততিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ সময় থেকে গণদুর্যোগ বার্তা প্রচারেরও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

■ একটি কথা মনে রাখতে হবে, সমুদ্র বন্দরের জন্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ৪ মানে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রিক ভয়াবহ ধরনের ঝড়ের পূর্বাভাস যা উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের এক বিশাল অংশে আঘাত হানতে পারে।

কিন্তু নদী বন্দরের জন্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ৪ অর্থ মূলত নির্দিষ্ট এলাকায় অস্থায়ী ঝড় ও কালবৈশাখী সংক্রান্ত পূর্বাভাস যা সমুদ্র উপকূল, উপকূলবর্তী এলাকা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসহ দেশের যেকোনো

এলাকায় আঘাত হানতে পারে। সুতরাং, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের জন্য প্রয়োজ্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ৪ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থা ও অস্থায়ী ঝড় ও কালবৈশাখীর জন্য প্রয়োজ্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ৪ দেখানোর পর গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অস্থায়ী ঝড় ও কালবৈশাখীর জন্য প্রয়োজ্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ৪ দেখানো হলে যে সব এলাকা উল্লেখ করা হবে শুধুমাত্র সেসব এলাকায় সতর্কতামূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা আহ্বানের প্রয়োজন হবে না এবং গণদুর্যোগ বার্তা প্রচার করা হবে না।

বিপদ সংকেত- ৬ : এ সময় মাঝারি তীব্রতা সম্পন্ন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মাঝারি ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। এ সময় ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হওয়া বয়ে যেতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

মহাবিপদ সংকেত- ৮ : এ সময় প্রচণ্ড তীব্রতা সম্পন্ন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দরে অতি তীব্র ঝড়ো হাওয়া বিরাজ করবে। প্রচণ্ড এ ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯-১১৭ কিলোমিটার হতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

মহাবিপদ সংকেত- ৯ : এটি প্রচণ্ড তীব্রতা সম্পন্ন একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় যার কারণে বন্দর এলাকা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অতি

তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। হ্যারিকেনের তীব্রতা সম্পন্ন প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১১৮-১৭০ কিলোমিটার হতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

মহাবিপদ সংকেত- ১০ : এ সময় অতি প্রচণ্ড তীব্রতা বিশিষ্ট বা সুপার সাইক্লোনের তীব্রতা বিশিষ্ট প্রচণ্ডতম একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর এলাকায় অতীব তীব্র ঝঞ্জাবিস্কন্ধ ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। সর্বোচ্চ তীব্রতা বিশিষ্ট এ ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৭১ কিলোমিটার বা আরো বেশি হতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরের সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

নদীবন্দরের জন্য পুনর্নির্নাস্ত সংকেত

সরকার অনুমোদিত নতুন পদ্ধতিতে নদী বন্দরের জন্য মোট ছয়টি সংকেত চালু থাকবে। প্রথমটি হবে স্থানীয় সতর্ক সংকেত ০৩ এবং দ্বিতীয়টি হবে স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ০৪। এরপর সমুদ্র বন্দরের সাথে মিল রেখে বিপদ সংকেত ০৬ এবং মহাবিপদ সংকেত ০৮, ০৯ এবং ১০ প্রবর্তন করা হয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে বিপদ ০৫ ও ০৭ থাকছে না। উল্লেখ্য নতুন পদ্ধতিতে নদী বন্দরের জন্য শীতকালে কুয়াশা ও বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির জন্য দৃষ্টিগ্রাহ্যতা কমে গেলে নৌ পরিচালনার জন্য এমন সতর্ক সংকেত ঘোষণা করা হবে যাতে সাবধানে চলাচলের নির্দেশনা থাকবে।

গণদুর্যোগ বার্তা

বিভিন্ন সংকেতের সময় সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি ও জনগণের করণীয়

আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংক্রান্ত স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত নম্বর ৪ প্রচার হওয়ার পর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো গণদুর্যোগ বার্তা প্রচার করবে। প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রতি আধাঘণ্টা পর পর গণদুর্যোগ বার্তা প্রচার করার বিষয়ে ব্যুরো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সতর্ক সংকেত ঘোষণার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, জনগণের করণীয়

বর্তমানে বাতাসের প্রভাবে যেসব ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, তাহলো-

- শস্যক্ষেত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- অনেক কাঁচা এবং আধাকাঁচা ঘরবাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- সংকেত আর বাড়ানো না হলে উপকূলীয় জনসাধারণের মাঝারি ধরনের ক্ষতি হতে পারে।

এ জন্য জনগণকে যেসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, তাহলো :

- উপকূলীয় জলরাশির ঢেউ বড় ও উঁচু হয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে; যা মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহের জন্য বিপজ্জনক। উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসমূহকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে যাতে স্বল্প সময়ের নোটিশে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।
- ১৫০ ফুট এবং এর নিম্নের দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট

যে সকল নৌযান ঘণ্টায় ৬১ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত ঝড়ো হাওয়া প্রতিরোধে সক্ষম নয় সে সকল নৌযানকে অনতিবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যেতে হবে।

- জনগণকে সংকেত বাড়ানোর পূর্বে মূল্যবান সম্পদসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- শিশুদের বাইরে চলাচল ও কার্যাদি বন্ধ রাখতে হবে।
- আবহাওয়ার সর্বশেষ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি এবং দুর্যোগের গণসতর্কবার্তা জনসাধারণকে নিয়মিতভাবে শুনতে হবে এবং এ নিয়মাবলি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকলকে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সকল পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সভায় মিলিত হয়ে সম্ভাব্য সাড়াদানমূলক কার্যক্রমের সকল প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।

জনগণকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অন্য যে সকল সতর্কতামূলক কাজ করতে হবে তা নিম্নরূপ:

- বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিকলাঙ্গ, অপ্রকৃতিস্থ ও শিশুদেরকে আগে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠাতে হবে;
- মহিলা বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাকে আগেই আশ্রয়কেন্দ্রে প্রেরণ;
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি নিরাপদ উঁচু স্থানে স্থানান্তর;
- অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র এবং টাকা-পয়সা পলিথিনে মুড়ে

(বাড়ির আরও দু'একজনকে জানিয়ে)
মাটিতে পুঁতে রাখা;

- জরুরি মুহূর্তে প্রয়োজন মেটানোর জন্য কিছু শুকনো খাবার পলিথিনে মুড়ে মাটিতে পুঁতে রাখা;
- টিউবওয়েলের মাথা খুলে ওপরের খোলা মুখ শক্ত পলিথিনে দিয়ে ভালোভাবে মুড়ে রাখা;
- ফসলের বীজ বস্তায় বা পলিথিনে বেঁধে উঁচু স্থানে রাখা অথবা অন্যত্র নিরাপদ স্থানে প্রেরণ;
- মহাবিপদ সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে কালবিলম্ব না করে আশ্রয়কেন্দ্র অথবা অন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া;
- আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সময় বহনযোগ্য রান্নার চুলা, মোমবাতি, দিয়াশলাই ও কিছু জ্বালানি কাঠ সঙ্গে নেয়া;
- তাৎক্ষণিকভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

উপকূলীয় জেলাসমূহের এবং ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ এলাকার জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসনকে যেসব কাজ এসময় তাৎক্ষণিকভাবে করতে হবে, তাহলো :

- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা আহ্বান করতে হবে।
- জীবনহানি রোধ এবং ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের স্থানান্তর কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, সংকেত

প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ইত্যাদির মাধ্যমে মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ব্যবস্থা নিতে হবে।

- মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্যোগ লাঘবে উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তুতি নেয়া।
- বিদ্যমান ঝুঁকি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থাদি গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু থাকবে।

পাশাপাশি দুর্যোগে সৃষ্ট পরিস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সবধরনের পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে :

- উদ্ধার ও স্থানান্তর
- জরুরি চিকিৎসা
- অস্থায়ী আশ্রয়স্থল তৈরি
- নিরাপদ পানি সরবরাহ
- পয়ঃনিষ্কাশন
- জরুরি খাদ্য সরবরাহ
- যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করা
- আলো, বাতি ও জ্বালানি সরবরাহ
- ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা এবং অন্যান্য আনুষংগিক ব্যবস্থাদি

দুর্যোগ শেষে জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে যেসব কাজ করতে হবে—

- দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া শেষ হবার সাথে সাথে আশ্রয়কেন্দ্র থেকে নিজ ঘরবাড়িতে ফিরে যেতে হবে;
- বাড়ির আড়িনায় এবং উপযুক্ত স্থানে

দ্রুত শাক-সবজির আবাদ করা;

- দ্রুত ফলনশীল ফসলের চাষ করা;
- যৌথভাবে ঘরবাড়ি মেরামত বা খাদ্যশস্যের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা;
- ত্রাণ পাওয়ার অপেক্ষায় না থেকে নিজের যা আছে তাই দিয়ে অভাব মেটানোর চেষ্টা করা;
- কাজের সন্ধান করা, প্রয়োজনে অন্যত্র যেখানে কাজ পাওয়া যায় সেখানে গমন করা;
- সাহায্যের চেয়ে কাজ প্রদানের আবেদন করা;
- ত্রাণ সাহায্য যা পাওয়া যায় তা দিয়ে অভাব মেটাবার চেষ্টা করা;
- স্বেচ্ছাসেবামূলক ও পুনর্গঠন কাজে সহযোগিতা করা।

৪ নম্বর সতর্ক সংকেতের পর যে সংকেত দেখানো হবে সেটি হবে ৬ নম্বর বিপদ সংকেত। ৬ নম্বর সতর্ক সংকেত ঘোষণার পর প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর সতর্কবার্তা প্রচার করতে হবে।

৬ নম্বর বিপদ সংকেত

৬ নম্বর বিপদ সংকেতের সময়ে কি কি ক্ষতি হতে পারে :

- অনেক নারিকেল গাছ ভেঙে যেতে এবং ধ্বংস হতে পারে এবং অন্যান্য অনেক বড় বড় গাছপালা উপড়ে যেতে পারে।
- শস্যাদির মারাত্মকভাবে ক্ষতি হতে পারে।
- অধিকাংশ কাঁচা এবং আধাকাঁচা ঘরবাড়ি চালা উড়ে যেতে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। হালকা থেকে মাঝারি ধরনের পাকা ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা

বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

- এলাকা এবং তাদের নিম্নাঞ্চলসমূহ মাঝারি ঘূর্ণিঝড়ের ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে।

৬ নম্বর বিপদ সংকেতের সময়ে করণীয়

সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ :

- উপকূলীয় অঞ্চলের চেউগুলো বড় ও মারাত্মক আকার ধারণ করবে; যা মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহের জন্য বিপজ্জনক।
- উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে অনতিবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে।
- ঘূর্ণিঝড়টি মারাত্মক আকার ধারণ করবে যা জনগণের জন্য হুমকিস্বরূপ।
- ৬নং বিপদ সংকেতের আওতাধীন এলাকার জনসাধারণ নিরাপদ দালানকোঠা এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে পারে। জনগণকে সাগর উপকূল এবং নদীর তীর থেকে দূরে থাকতে হবে।
- ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু অতিক্রম করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ অতীব ঝঞ্জাবিস্ফুর্ত আবহাওয়ার পর হঠাৎ ভালো আবহাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু অতিক্রম করার ইঙ্গিত করে।
- ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু অতিক্রম করার সাথে সাথেই আশ্রয় কেন্দ্রের বাহিরে যাওয়া যাবে না। কারণ কিছুক্ষণের মধ্যে প্রবল বাতাসসহ আবহাওয়া বিস্ফুর্ত হতে পারে।
- দুর্যোগ প্রস্তুতিকরণ সংস্থাসমূহকে অবশ্যই জনগণ বিশেষ করে মহিলা,

শিশু এবং বৃদ্ধ অসহায়দের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে এবং ইমারজেন্সি অপারেশন কেন্দ্রের সর্বশেষ নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

- উপকূলে জোয়ার টার সময় বি.এস.টি।
- উপকূলে ভাটা টার সময় বি.এস.পি।

৬ নম্বর বিপদ সংকেতের পর যে সংকেত দেখানো হবে সেটি হবে ৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেত। ৮, ৯ ও ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত ঘোষণার পর প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রতি ৫ মিনিট অন্তর সতর্কবার্তা প্রচার করতে হবে।

৮, ৯ ও ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত

৮, ৯ ও ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের সময়ে কি কি ক্ষতি হতে পারে :

- মহাবিপদ সংকেতের আওতাভুক্ত সকল এলাকা/লোকালয় খুবই মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
- অসংখ্য নারিকেল এবং অন্যান্য বড় গাছ-পালা ধ্বংস হতে বা উপড়ে পড়তে পারে।
- শস্যক্ষেত্রসমূহ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।
- সকল কাঁচা ও আধাকাঁচা ঘরবাড়িসমূহ ধ্বংস হতে পারে। হালকা থেকে মাঝারি ধরনের পাকা ঘরবাড়ি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।
- এলাকা এবং তাদের নিম্নাঞ্চলসমূহে ফুট উচ্চতা

বিশিষ্ট জলোচ্ছ্বাসে প্রাবিত হতে পারে।
৮, ৯ ও ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের সময়ে করণীয়

সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ

- উপকূলীয় অঞ্চলের ঢেউগলো খুব বড় ও মারাত্মক আকার ধারণ করবে; যা মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহের জন্য বিপজ্জনক। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও নিরাপদ দালান কোঠায় অনতিবিলম্বে জনসাধারণকে স্থানান্তর করতে হবে।
- মহাবিপদ সংকেত নম্বর ৮ (পুন) ৮-এর আওতাভুক্ত সকল এলাকা এবং বন্দরসমূহ অগ্রসরমান ঘূর্ণিঝড়ের অবিরাম বর্ধিত গতির বাতাস প্রবাহিত হবে। এই ৮নং মহাবিপদ সংকেতের আওতাধীন কোনো এলাকার ওপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র অতিক্রম করতে পারে, অতিক্রমরত ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং হঠাৎ বৃষ্টিবিষ্ফুর্ত আবহাওয়ার উন্নতি দেখলেই নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করা যাবে না।
- দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা সংস্থাসমূহকে পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত থাকতে হবে এবং ইমারজেন্সি অপারেশন কেন্দ্রের সর্বশেষ নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে।
- উপকূলে জোয়ার টার সময় বি.এস.টি।
- উপকূলে ভাটা টার সময় বি.এস.পি।

মহাবিপদ সংকেতের দুর্ঘোণের সময় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে যেসব জরুরি ব্যবস্থা নিতে হবে, তাহলো :

- দুর্ঘোণকালে উপজেলা ও ইউনিয়নের সুবিধামতো স্থানে উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে পৃথক পৃথক 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' স্থাপন করতে হবে।
- উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভায় পৌরসভা চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়নে চেয়ারম্যান 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' এর সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন এবং 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা কমিটির একাধিক সদস্য ও অন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দিতে হবে।
- ওয়ার্ড সাব-কমিটির সাথে উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ'-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- জননিরাপত্তা ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রয়োজনে উপজেলা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে পুলিশের অথবা স্বেচ্ছাসেবক দলের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গ্রাম প্রতিরক্ষা, ইউনিয়ন চৌকিদার ও আনসারদের দ্বারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জানমালের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব নিতে হবে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা

- মহিলা এবং পুরুষরা কে কোথায় থাকবেন আশ্রয় কেন্দ্রে আসা মাত্র তা জনগণকে জানানো।
- অসুস্থদের আশ্রয়কেন্দ্রে সহায়তাদান।

- গর্ভবতী মহিলাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা দিতে হবে।

Cyclone Prone Areas in Bangladesh

বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাসমূহ

বাংলাদেশে সাইক্লোনের জন্য বিপদাপন্ন জেলাসমূহ হচ্ছে—

১. চট্টগ্রাম বিভাগ— চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, নোয়াখালী।
২. খুলনা বিভাগ— খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট।
৩. বরিশাল বিভাগ— বরিশাল, ভোলা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা ও পটুয়াখালী।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র একটি নির্দিষ্ট স্থান, যেখানে ঘূর্ণিঝড়ের সময় জনগণ আশ্রয় গ্রহণ করে জীবন রক্ষা করতে পারে। আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ অনেক ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে সাধারণ সরকারি বা কোনো সংস্থার সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে নির্মিত হয় আশ্রয়কেন্দ্র। সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে এই আশ্রয়কেন্দ্রের মতো শক্ত কাঠামোর বাড়ি উপকূল অঞ্চলে বসবাসকারী কারো একার পক্ষে নির্মাণ করা সম্ভব নয়। ঘূর্ণিঝড়ের সময় জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে তাই উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষদের নির্ভর করতে হয় আশ্রয়কেন্দ্রের ওপর। আশ্রয়কেন্দ্রগুলো স্বাভাবিক সময়ে স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার, ইউনিয়ন পরিষদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত, আশ্রয়কেন্দ্রের ধারণক্ষমতা ৫০০ থেকে ২৫০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। ইঁশিয়ারি

সংকেত (সংকেত ২ ও ৪) প্রচারের সময়ে উপকূলীয় জনগণ জিনিসপত্র গোছগাছ কিংবা কীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া যাবে অথবা কিছুটা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে কত সময়ে নিকটতম আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছানো যাবে তা জেনে নেয়। বিপদসংকেত প্রচারের পর এবং ঘূর্ণিঝড়টি উপকূল অঞ্চল হতে কত দূরে অবস্থান করছে এবং এর স্থান পরিবর্তনের গতিবেগ কত ও কোন দিকে সে স্থান পরিবর্তন করছে এসব তথ্য আশ্রয়কেন্দ্রে কিংবা নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য জানা অতি জরুরি। শিশু, গর্ভবতী মা, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ ও অসুস্থ নারী-পুরুষদেরকে উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিপদসংকেত প্রচারের সময়ই সবার আগে নিরাপদ স্থানে কিংবা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ মহাবিপদ-সংকেত প্রচারের পরে এদের নিয়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় চলাচল করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আশ্রয়কেন্দ্র বা নিরাপদ স্থানে অবশ্যই মহাবিপদ-সংকেত প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে অথবা আগেই যেতে হবে। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান শুধুমাত্র দুর্যোগে জীবন রক্ষার জন্য, কোনো প্রকার আরাম-আয়েশের জন্য নয়।

Tropical Cyclone

উষ্ণমণ্ডলীয় বা ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়

ক্রান্তীয় অঞ্চলের ৩০ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে ভারত মহাসাগর, মেক্সিকো উপসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের জাপান, ফিলিপাইন ও অস্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্তী অংশে এই ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। এসব

ঘূর্ণিঝড়ের আয়তন অপেক্ষাকৃত (মধ্যাক্ষাংশীয় ঘূর্ণিঝড় অপেক্ষা) ছোট, ব্যাস ১০০ থেকে ৪০০ মাইল হয়ে থাকে। কিন্তু বায়ুর গতিবেগ ঘন্টায় ৭৫ মাইল থেকে ১৭৫ মাইল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। এসব ঘূর্ণিঝড়ের সাথে প্রায়শই ভয়াবহ জলোচ্ছাস হতে দেখা যায়।

CYCLONE PREPAREDNESS PROGRAM (CPP) ঘূর্ণিঝড় পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি



Cyclone Preparedness Program (CPP)

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির সিপিপি বা সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এটা গঠন করার চিন্তা আরম্ভ হয়েছে ১৯৬৫ সালে। বর্তমান

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ১৯৬৫ সালে উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসরত মানুষের জন্য সতর্কতা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করার জন্য IRFC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)-কে অনুরোধ করেছিল। তারই ফলে আজকের সিপিপি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। সিপিপি বা সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম তাদের কার্যক্রম বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকার জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমে দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানো- এই নীতির মাধ্যমে পরিচালিত করে আসছে। বর্তমানে সিপিপির আওতায় উপকূলবর্তী এলাকার ১১টি জেলায়, ৩২টি উপজেলার, ৩৫২টি ইউনিয়নে ৪২,০০০ স্বেচ্ছাসেবক কাজ করছেন। এসব এলাকায় ২,৭৬০টি ইউনিট কাজ করছে, যাদের প্রতিটির আওতায় ১ থেকে ২টি গ্রাম রয়েছে। প্রত্যেক গ্রামে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ স্বেচ্ছাসেবকেরা সাফল্যের সঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছে। উচ্চস্তরের দক্ষতা বজায় রাখার জন্য রেড ক্রিসেন্ট তার স্বেচ্ছাকর্মীদের ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান, সতর্কতা সংকেত বিষয়ে ধারণা দেওয়া, স্থানান্তর করা, নিরাপদ আশ্রয় দান, উদ্ধার করা, প্রাথমিক সাহায্য প্রদান এবং ত্রাণ সরবরাহ করা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক কার্যকলাপ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সিপিপি বিভিন্ন উপায়ে ঘূর্ণিঝড়-প্রবণ উপকূলবর্তী এলাকায়

জনসচেতনতা কার্যকলাপ বাস্তবায়ন করে আসছে -

স্বেচ্ছাকর্মীদের মাধ্যমে জনসচেতনতা (Public Awareness Through Volunteers) : স্থানীয় স্বেচ্ছাকর্মীরা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। স্বেচ্ছাকর্মীদের অনুশীলনে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের মহড়া (Cyclone Drills and Demonstrations) : স্বেচ্ছাকর্মীরা প্রায়ই ঘূর্ণিঝড়ের মহড়া করে থাকে এবং এই মহড়ায় স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ করে।

সিনেমা/ভিডিও দেখানো (Films/Video Shows) : বাংলাদেশ সরকারের আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের সহযোগিতায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিবিষয়ক ডকুমেন্টারি উপকূলীয় এলাকায় দেখানো হয়।

প্রচার অভিযান (Publicity Campaign) : ঘূর্ণিঝড় মৌসুমের ঠিক আগে সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও এবং স্থানীয় জনগণের সহায়তায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচার অভিযানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বেতার ও টেলিভিশন (Radio and Television) : ঘূর্ণিঝড় মৌসুমের পূর্বে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি সম্পর্কিত ডকুমেন্টারি তৈরি করে জাতীয় দূরদর্শনে সম্প্রচার করা হয়। দুর্যোগ প্রস্তুতির ওপর বিশেষ প্রতিবেদন অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। বর্তমানে সিডিএমপি'র সহযোগিতায় উপকূলীয় এলাকায় জেলেদের জন্য সিপিপি'র মাধ্যমে বিনামূল্যে রেডিও প্রদানের কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

পোস্টার, লিফলেট এবং বই (Posters, Leaflets and Booklets) : পোস্টার, লিফলেট, বই ইত্যাদি তৈরি ও নিয়মিত উপকূলবর্তী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে। বিশেষ নির্দেশনার মাধ্যমে স্থান-ান্তর, সতর্কবার্তা জনগণের বোধগম্য করা, জেলেদের নির্দেশ দেয়া ইত্যাদি পোস্টার ও লিফলেট স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করা হয়।

নাটক মঞ্চায়ন (Staging of Dramas) : গ্রামবাসীদের প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষভাবে লিখিত নাটক উপকূলবর্তী এলাকায় মঞ্চস্থ করা হয়। এই পর্যন্ত ছয় লাখেরও বেশি মানুষ দর্শক হিসেবে এ ধরনের নাটক দেখেছে।

Committee কমিটি

সিপিপি কার্যক্রম যৌথভাবে পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন করার জন্য দুটো কমিটি রয়েছে। সাত সদস্যবিশিষ্ট কর্মসূচি কমিটির প্রধান হচ্ছেন খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা। বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির একটি যৌথ কর্মসূচি হিসেবে সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এর রয়েছে একাধিক কমিটি।

Unit Committee ইউনিট কমিটি

একটি ইউনিটে ১০ জন পুরুষ এবং ২ জন নারী স্বেচ্ছাকর্মী থাকেন। এঁদের মধ্যে একজনকে ইউনিটের টিম লিডার/দলের নেতা এবং অপর আরেকজনকে দলীয় নেতার প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হয়।

Union Committee ইউনিয়ন কমিটি

একটি ইউনিয়ন গড়ে ১০টি ইউনিট নিয়ে গঠিত হয়। ইউনিয়নের অন্তর্গত ইউনিটগুলোর টিম লিডার/দলীয় নেতাদের মধ্য থেকে একজনকে ইউনিয়নের দলীয় নেতা এবং অন্য আরেকজনকে দলীয় প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হয়।

Upazila Committee উপজেলা কমিটি

একটি উপজেলা গড়ে ১০টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত হয়। উপজেলার অধীনে যে সকল ইউনিয়ন আছে তাদের টিম লিডার/দলীয় নেতাদের মধ্য থেকে একজনকে উপজেলার দলীয় নেতা এবং অন্য আরেকজনকে দলীয় প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হয়।

Operational Method কার্যপ্রণালি

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জাতীয় সদর অফিসে সিপিপির প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। বঙ্গোপসাগরে যখন কোনো নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় তখন বাংলাদেশ আবহাওয়া অফিস বিশেষ বুলেটিনসহ ঝড়ের বিপদসংকেত প্রচার করতে থাকে। এই খবর তৎক্ষণাৎ ৬ জন জোনাল অফিসার এবং ৩০ জন উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তার কাছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফ্রিকোয়েন্সি বেতার/উচ্চ তরঙ্গ বেতারের মাধ্যমে পৌঁছানো হয়। পরবর্তী সময়ে সহকারী পরিচালকবৃন্দ এটা অতি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি/অতি উচ্চ তরঙ্গের মাধ্যমে বিভিন্ন ইউনিয়নে পৌঁছে দেন। যে সকল এলাকায়/জায়গায় অতি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি/অতি উচ্চ তরঙ্গের মাধ্যমে খবর পাঠানো

সম্ভব নয়, সেখানে বার্তাবাহকের মাধ্যমে খবর পাঠানো হয়। তখনই ইউনিয়ন টিম লিডাররা/দলীয় নেতারা ইউনিট টিম লিডার/দলীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ইউনিট দলীয় নেতাগণ তাঁদের স্বেচ্ছাকর্মীসহ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েন এবং ঘূর্ণিঝড়ের বিপদসংকেত মেগাফোন এবং সাইরেন, লাউডস্পিকার/মাইকের মাধ্যমে প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। এই সময় জাতীয় বেতারকেন্দ্র ও রেডিওর মাধ্যমে টিম লিডারগণ ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রগতির পথ অনুসরণ করতে পারেন। টিম লিডাররা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দেন। স্বেচ্ছাকর্মীরা আবহাওয়া বার্তা, ঘূর্ণিঝড়ের ধরন এবং আগমনপথ তাদের কর্মপ্রণালি অনুযায়ী ঘোষণা করতে থাকেন।

যখন অবস্থা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে তখন বাংলাদেশ সরকার উদ্ধারের আদেশ প্রদান করে। এই সময় উদ্ধারকর্মীগণ আদেশ এবং উপদেশ মান্য করার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেন। ঘূর্ণিঝড় শেষ হয়ে যাবার পর উদ্ধারকর্মীগণ আহত ও দুর্গত মানুষকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন এবং গুরুতর আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে নেন এবং ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন। ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকার ঘূর্ণিঝড়সংক্রান্ত আদেশ সূচনা করেন। যাতে প্রতিটি সরকারি মন্ত্রণালয়ে ডিভিশন, ডিপার্টমেন্ট এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির বিভিন্ন করণীয় উল্লেখ রয়েছে। এই বিশেষ আদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে/ধাপে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে সিপিপি কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণের উল্লেখ

করেছে। সিপিপি ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে তাদের উদ্ধারকর্মীদের মাধ্যমে সতর্কতা উদ্ধার এবং অপসারণ, প্রাথমিক চিকিৎসা, জরুরি সাহায্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম উপকূলীয় জেলাসমূহে বেতার সংস্থার মাধ্যমে প্রেরণ করে থাকে।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইউনিট দলনেতা/টিম লিডারদেরকে একটি করে সাইকেল দেয়া হয়েছে। উপজেলা দলনেতা/টিম লিডাররা এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি কর্মকর্তাদের প্রত্যেককে একটি করে মোটরসাইকেল দেয়া হয়েছে। মূল ভূখণ্ড হতে দূরবর্তী উপজেলাতে স্পিডবোট দেয়া হয়েছে। স্থানীয় অফিসগুলোতে পিক-আপ ট্রাকও সরবরাহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার, বিডিআরসিএস এবং আইএফআরসি থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে এসব খরচ মেটানো হয়। এ ছাড়া IPAC (অস্ট্রেলিয়া) বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি জোরদার করতে অর্থায়ন করে থাকে। উপকূলীয় জনগণের বিশেষত জেলেদেরকে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্ক সংকেত জানানোর জন্য- সিডিএমপি থেকে সিপিপি'র মাধ্যমে রেডিও সেট ও টর্চ লাইট প্রদান করা হয়েছে।

Training of Volunteers স্বেচ্ছাকর্মীদের প্রশিক্ষণ

উচ্চস্তরের দক্ষতা বজায় রাখার জন্য রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি তার স্বেচ্ছাকর্মীগণকে ঘূর্ণিঝড় এবং এর আচরণ, সতর্কতা সংকেত এবং তা সম্পর্কে ধারণা দেয়া, স্থানান্তর করা, নিরাপদ আশ্রয়দান, উদ্ধার করা, প্রাথমিক সাহায্য প্রদান এবং ত্রাণ সরবরাহ করা

সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। লোক নিযুক্ত করার সময় স্বেচ্ছাকর্মীদেরকে স্থানীয় সিপিপি অফিসে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। স্বেচ্ছাকর্মীদেরকে গ্রুপ আকারে তিন দিনের একটি মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে টিম লিডারকে পাঁচ দিন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লিডারশিপ ট্রেনিং দেওয়া হয়। অফিসার এবং উপজেলা টিম লিডাররা তাদের সাধারণ কাজের পাশাপাশি স্বেচ্ছাকর্মীদেরকে দক্ষতা বৃদ্ধি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের বিকাশবিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ফাস্ট এইড/প্রাথমিক সাহায্যকরণ ইনস্ট্রাক্টরগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বেচ্ছাকর্মীদেরকে ফাস্ট এইড প্রশিক্ষণ দেন।

Warning Equipment and Gears for Volunteers স্বেচ্ছাকর্মীদের সরঞ্জাম এবং সতর্কীকরণ যন্ত্রপাতি

সতর্কীকরণ যন্ত্রপাতি (Warning Equipment): আবহাওয়াসংক্রান্ত ঝড়ের সতর্কবার্তা গ্রহণ করার জন্য ইউনিট টিম লিডারদের ট্রানজিস্টার রেডিও প্রদান করা হয়। সতর্কবার্তা সম্পর্কে গ্রামবাসীকে ধারণা দেয়ার জন্য মেগাফোন, সতর্কবার্তা, বিশেষ বাতি এবং পতাকা প্রতিটি স্বেচ্ছাকর্মী দলকে দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছাসেবকদের সরঞ্জাম (Volunteers Gears): দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় চলাচলের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের রেইনকোট, বুট, শক্ত টুপি, জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেট এবং টর্চলাইট দেয়া হয়।

DISASTER দুর্যোগ

Disaster দুর্যোগ

দুর্যোগ হলো একটি মারাত্মক পরিস্থিতি যা প্রকৃতি বা মানবসৃষ্ট আপদের ফলে দেখা দেয়। এই পরিস্থিতি চলমান সমাজ জীবনকে গভীরভাবে ব্যাহত করে এবং মানুষ, সম্পদ ও পরিবেশের এত ক্ষতি সাধন করে যা মোকাবেলায় একটি সমাজকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি হয় তা শুধু নিজস্ব সম্পদ দিয়ে প্রায়ই পূরণ করা সম্ভব হয় না বরং বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

সাধারণ অর্থে দুর্যোগ বলতে আপদ বোঝায় কিন্তু সব আপদই দুর্যোগ নয়। আপদ ও বিপদাপন্নতা এ দুটো উপাদান একত্র হলেই তাকে দুর্যোগ পরিস্থিতি বলা হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও সৃষ্ট পরিস্থিতি দুর্যোগ কিনা তা নির্ধারণ একটি সমাজের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে।

Capacity সামর্থ্য

সামর্থ্য হচ্ছে সত্যিকার অথবা কাল্পনিক কোন দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক উপায়ে সাড়া দেবার সার্বিক সক্ষমতা। অর্থনৈতিক, জ্ঞান ও দক্ষতা সামাজিক সম্পর্ক, কারিগরি সক্ষমতা ও ভৌত সম্পদের অভিজ্ঞতা সবগুলোর মিলিত রূপই সার্বিক সক্ষমতা।

Hazard আপদ

আপদ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা, যা প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট কারিগরি ত্রুটির কারণে ঘটতে পারে এবং যা মানুষের জীবন ও জীবিকার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে। প্রাকৃতিক- সাইক্লোন, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, খরা, নদীভাঙন, মানবসৃষ্ট- ভবনধ্বস, নৌ-দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, সড়ক দুর্ঘটনা, কারিগরি- পারমাণবিক দুর্ঘটনা ‘আপদ দুর্যোগ নয়, বরং দুর্যোগের সম্ভাব্য কারণ’ ভূমিকম্প একটি আপদ, এর কারণে প্রাণহানিসহ অন্যান্য অবকাঠামো ধ্বংসের মাধ্যমে দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। মৃদু ভূ-কম্পন আপদ কিন্তু এতে দুর্যোগ দেখা দেয় না।

আপদের বৈশিষ্ট্য

অধিকাংশ আপদ বর্ণনা করতে নিম্নবর্ণিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে :

- তীব্রতা (কত বড়, কত দ্রুত, কত শক্তিশালী)
- সম্ভাব্যতা (আপদ ঘটার আশঙ্কা)
- বিস্তৃতি (যে ভৌগোলিক এবং সামাজিক এলাকায় একটি আপদ আক্রমণ করতে পারে)
- সময়সীমা (সতর্কতার সময়কাল, স্থায়িত্ব, দিন/সপ্তাহ/বছরের কোনো সময়)
- ব্যবস্থাপনা (কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে)

আপদ বিভিন্ন ধরনের হতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের আপদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উল্লেখ করা হলো :

Biological Hazard জৈবিক আপদ

মানুষ, শস্য এবং গৃহপালিত পশু-পাখির মাধ্যমে যে রোগগুলো উৎপন্ন হয় অথবা ছড়ায় তার ফলে যে আপদ সৃষ্টি হয় তাকে Biological Hazard বা জৈবিক আপদ বলে।

Geological Hazard ভূতাত্ত্বিক আপদ

অভ্যন্তরীণ ভূমি প্রক্রিয়ার টেকটনিক (Tectonic) উৎপত্তির ফলে যথাক্রমে- ভূমিকম্প (Earthquakes), সুনামি (Tsunamis) এবং অগ্ন্যুৎপাত, পুঞ্জীভূত গতি, ধস, শিলাপাত ইত্যাদির সমন্বয়ে যে আপদ সৃষ্টি হয় তাকে Geological Hazard বা ভূতাত্ত্বিক আপদ বলে।

Hydro Meteorological Hazard

আন্তঃবাৎসরিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী প্রভাবিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলো এত বেশি হচ্ছে যা আন্তঃবাৎসরিক টাইমস্কেলের তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করে। এই আঞ্চলিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে যে আপদের সৃষ্টি হয় তাকে Hydro Meteorological Hazard বলে। যেমন- বন্যা, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, প্রচণ্ড বেগে বাতাস প্রবাহিত হওয়া, ঝড়বৃষ্টি, বিজলি চমকানো, অনাবৃষ্টি, খরা, অগ্নিকাণ্ড, উচ্চ তাপমাত্রা, ধূলিঝড় ইত্যাদি।

Chronic Hazard তীব্র আপদ

সমুদ্র উপকূলবর্তী বালির স্তূপ এবং তীরের ক্ষয়, সমুদ্র তীরবর্তী আবহাওয়ার ক্রমাগত

পরিবর্তন ও নিচু ভূমিতে জলস্রোতের প্রবাহের ফলে যে স্থায়ী আপদের সৃষ্টি হয় তাকে Chronic Hazard বলে।

Technological Hazard প্রযুক্তিগত আপদ

প্রযুক্তিগত বা শিল্পায়ন দুর্ঘটনা বা মানুষের কর্মকাণ্ড- যা জীবন হারানোর কারণ, সম্পদের ক্ষতি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নকরণ বা পরিবেশের অবনতির জন্য যে আপদের সৃষ্টি হয় তাকে Technological Hazard বা প্রযুক্তিগত আপদ বলে। যেমন- দূষিত শিল্পাঞ্চল, যানবাহন, শিল্প বা প্রযুক্তি দুর্ঘটনা।

Hazard Analysis আপদ বিশ্লেষণ

যেকোনো আপদ সনাক্তকরণ, অধ্যয়ন এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার সম্ভাব্যতা, উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য ও আচরণ নির্ধারণ করাই হচ্ছে আপদ বিশ্লেষণ।

Hazard Mapping আপদ মানচিত্র

সাধারণত আপদের মাত্রা চিহ্নিত করে যে মানচিত্র অঙ্কন করা হয় তাকে আপদ মানচিত্র বলে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় কোন অঞ্চলগুলো কতখানি আপদপূর্ণ।

Hazard Assesment আপদ নিরূপণ

আপদ নিরূপণের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো একটি নির্দিষ্ট আপদ সংঘটনের আশঙ্কা, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে তা ঘটতে পারে, এর তীব্রতা কতটুকু হতে পারে, এর দ্বারা

কতখানি অঞ্চল আক্রান্ত হতে পারে ইত্যাদি চিহ্নিত করা।

Vulnerability বিপদাপন্নতা

কোন জনগোষ্ঠীর (Community) বা তার অংশের (ব্যক্তি বা পরিবার) কোনো এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট আপদে আক্রান্ত বা সম্ভাবনা এবং ঐ আপদ সংঘটনের ফলে সমাজ ও ব্যক্তির জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য মাত্রা।

Risk ঝুঁকি

কোনো আপদ বা আপদসমূহ, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয়, সম্পদ এবং পরিবেশ- এই তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রণের ফলে (Interaction) ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভাবনা।

অর্থাৎ সহজে বললে কোনো আপদ ঘটানো সম্ভাবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির সম্ভাবনা এই দুয়ের পারস্পরিকতাই ঝুঁকি

ঝুঁকি = আপদ সম্ভাবনা x বিপদাপন্নতা
বিপদাপন্নতা = ক্ষতির সম্ভাবনা/সমাজের সামর্থ্য

দুর্যোগ চক্র

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পরস্পর সম্পর্কিত পর্যায়গুলোকে দুর্যোগ চক্র বলে।

দুর্যোগ চক্রের পর্যায়সমূহ ক. প্রতিরোধ (Prevention) খ. উপশন (Mitigation) গ. প্রস্তুতি (Preparedness) ঘ. সাড়া প্রদান (Response) ঙ. পুনর্বাসন (Rehabilitation) চ. পুনর্গঠন (Reconstruction) ছ. উন্নয়ন (Development)

Steps of Disaster Management Activity দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধাপসমূহ

- প্রতিরোধ : বিপদ/দুর্ঘটনার বাধা প্রদান।
- প্রশমন : পদক্ষেপসমূহ যা কোনো বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাজনিত ফলাফলকে কমাতে পারে।
- প্রস্তুতি: প্রকৃত জরুরি অবস্থার সময় অধিকতর কার্যকরীভাবে অথবা সময়োচিত সাড়া প্রদানের জন্য পূর্বে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ।
- সাড়া প্রদান: জরুরি অবস্থায় অত্যাৱশ্যকীয় সেবা প্রদান এবং জনগণের ইতিবাচক সাড়া প্রদান।
- পুনর্বাসন: একটি জনগোষ্ঠীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অত্যাৱশ্যকীয় সেবাসমূহের দ্রুত স্বাভাবিক এবং প্রতিস্থাপনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা।
- পুনর্গঠন: প্রাতিষ্ঠানিক এবং জনগণের সুযোগ-সুবিধাসমূহকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে সহায়তা প্রদান।
- উন্নয়ন: জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং তা বজায় রাখার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা।

(দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ১৯৯৭ অনুযায়ী)

Causes of Disaster দুর্যোগের কারণসমূহ

বিভিন্ন কারণে দুর্যোগের সৃষ্টি হতে পারে, যেমন বন্যা সৃষ্টির কারণ হচ্ছে- অতি বৃষ্টি, পলি পড়ে নদী ভরাট, সমুদ্রের জোয়ার,

ভূমিকম্প প্রভৃতি। আবার ভূমিকম্প সৃষ্টির কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে- ভূপৃষ্ঠের প্লেটসমূহের পারস্পরিক ধাক্কা, ভূপৃষ্ঠের চ্যুতি ও ফাটলে শিলার অবস্থান পরিবর্তন, ভূ-অভ্যন্তরের গলিত লাভা বা গ্যাসের প্রবল ধাক্কা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি। সমুদ্রের উত্তপ্ত তাপমাত্রা, সমুদ্রে সৃষ্ট নিম্নচাপ, বায়ুমণ্ডলে বাতাসের গতিবেগ এক হওয়া প্রভৃতি কারণে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হতে পারে। খরা সৃষ্টির কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে- অনাবৃষ্টি, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, বৃক্ষনিধন প্রভৃতি।

Slow-Onset Disaster ধীর গতিসম্পন্ন দুর্যোগ

এটি হচ্ছে এমন একটি অবস্থা, যা মানুষের খাদ্য ও জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টাকে মন্থর করে দেয়। যেসব কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয় সেগুলো হলো খরা, শস্যহানি, পোকামাকড়ের আক্রমণ, বাস্তুসংস্থানিক দুর্যোগ। আগে থেকেই যদি এটি চিহ্নিত করা যায়, তবে জনগণকে অতিরিক্ত ভোগান্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষাকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু এ ধরনের দুর্যোগকে যদি অবহেলা করা হয়, তবে পরবর্তী সময়ে তা চরম দুর্গতি ও দুর্দশা বয়ে আনবে, যার ফলে জরুরি ভিত্তিতে মানবিক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

Rapid Disaster দ্রুত গতিসম্পন্ন দুর্যোগ

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা যেমন ভূমিকম্প, বন্যা, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় অথবা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি কারণে আকস্মিক দুর্যোগ

ঘটে। এ ধরনের দুর্যোগ সম্পর্কে কখনো স্বল্প সময়ে সতর্কীকরণ ব্যবস্থা নেয়া যায় আবার কখনো সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো সুযোগ থাকে না। যার প্রেক্ষাপটে মানবগোষ্ঠী, তাদের কার্যাবলি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। এ ধরনের দুর্যোগকে দ্রুতগতিসম্পন্ন দুর্যোগ বলে।

Disaster and Gender দুর্যোগ-ঝুঁকিতে নারী-পুরুষের সমতা বিবেচনা

দুর্যোগের ফলে মানবসমাজ বা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে পুরুষের তুলনায় নারীই বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থানগত পার্থক্য এবং নারীর প্রতি বৈষম্যের কারণে নারীর বিপদাপন্নতা বেশি। ফলে নারী দুর্যোগে পুরুষের তুলনায় সহজেই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ বিশ্লেষকবৃন্দ দেখিয়েছেন যে, নারীর এমন কিছু সক্ষমতা রয়েছে, যা শুধু নারীর নিজের জন্য নয়, গোটা পরিবারের জন্য দুর্যোগ মোকাবিলায় সহায়ক হয়ে থাকে। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিবেচনায় জেডার ইস্যু বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জেডার বিবেচনা : ঝুঁকি পর্যালোচনায় নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং এতদসংক্রান্ত তথ্যাবলি পৃথক পৃথকভাবে সংগ্রহ করা দরকার। সংগৃহীত তথ্যের আলোকেই স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে হবে। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের জন্য পুরুষদেরকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের কাছ থেকে পৃথকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা দরকার— কেননা তাদের মতামত ও অগ্রাধিকারের মধ্যে ভিন্নতা থাকবে। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় জেডারবিষয়ক যে দিকগুলো খতিয়ে দেখা দরকার সেগুলো হলো : শ্রমবিভাজন, আয়ের উৎস, অংশগ্রহণ ও অবদানের প্রতিশ্রুতি, অবকাঠামোগত সম্পদের (জমি, নগদ অর্থ, ঋণ, লোকবল ইত্যাদি) ওপর নিয়ন্ত্রণ, অন্যান্য সম্পদে (শিক্ষা, তথ্য, পরামর্শ প্রদান) নিয়ন্ত্রণ ও সুযোগ, চলাচলের স্বাধীনতা, সংগঠনের ধরন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনে অংশগ্রহণের সুযোগ।

Disaster and Poverty দুর্যোগ ও দারিদ্র্য

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর ওপর এবং এ সকল দেশের মধ্যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলো দুর্যোগে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্বের দুর্যোগ ধ্বংসযজ্ঞের অর্ধেকের বেশি সংঘটিত হয় স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে। কিন্তু এ সকল দুর্যোগ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে প্রভাব সৃষ্টি করে, তা আরো বেশি আশঙ্কার বিষয়। দরিদ্র দেশগুলো মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের তুলনায় অনেক বেশি অর্থনৈতিক ক্ষতির শিকার হয়। দরিদ্র দেশগুলোর সম্পদ সীমিত এবং সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সামর্থ্যও কম। উপরন্তু এ সকল দরিদ্র দেশের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি

বিপর্যয়ের শিকার হয়। তারা প্রায়শই বিপদাপন্ন পরিবেশে বসবাস করে এবং জীবিকার জন্য কাজ করে দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায়, যেমন— বলিভিয়ার লা পাজের চারিদিকে ‘শান্তি টাউনে’ (বস্তি এলাকায়), যেখানে ভূমিধস একটি নিয়মিত ভয়াবহ দুর্যোগ কিংবা নীল নদের তীরে যেখানে বন্যার আশঙ্কা ব্যাপক অথবা বাংলাদেশের নদী মধ্যস্থ চর এলাকা, যে এলাকা বর্ষাকালে বন্যা না হলেও নদীর ক্রমবর্ধমান পানিতে প্লাবিত হয়। এ ছাড়া উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোতে শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা, নারী-পুরুষের বৈষম্য, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাসহ নানাবিধ প্রভাবক উপাদান দরিদ্র মানুষের জীবনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে, যা তাদের দুর্যোগ-ঝুঁকি এবং দুর্যোগকালে তাদের দুর্ভোগ ক্রমেই বাড়িয়ে তোলে।

এ সকল দুর্দশার একত্রিত ফলাফল হলো এই যে, দরিদ্র মানুষ দুর্ভোগের শিকার হয় বেশি এবং তার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কিংবা তা কাটিয়ে ওঠার জন্য তাদের সামর্থ্য খুবই কম। একই সঙ্গে তারা পরোক্ষভাবে গোটা দেশের উৎপাদন ও অবকাঠামোগত ক্ষতির শিকার হয় এবং ত্রাণ সহায়তা কিংবা পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে বৈষম্যের শিকার হয় একটি দুর্ভাগ্য চক্রের মতোই। দুর্যোগ মানুষকে দরিদ্র থেকে হতদরিদ্র করে তোলে এবং পরবর্তী দুর্যোগের মুখোমুখি করে।

DISASTER MANAGEMENT দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

Disaster Management দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী যাবতীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণসহ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পর্যন্ত সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলা যায়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যা ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু প্রয়োগ ও এর উন্নতি সাধনের প্রয়াস দেয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে— জীবনহানি রোধ এবং ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করা; সর্বোচ্চ ঝুঁকির মধ্যে বসবাসকারী জনসাধারণকে সংকেত প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ইত্যাদির মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধান করা; মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগ লাঘব করা। উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করা; বিদ্যমান ঝুঁকি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা এবং ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা; দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে গণসচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করা; সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং অর্থনৈতিক লোকসান কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বেড়িবাঁধ নির্মাণ, মজবুত অবকাঠামো তৈরি, ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ব্যবস্থা করা; দ্রুত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড ও পরিবেশগত ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। দুর্যোগের পর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন এবং উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সাধারণত ৩টি পর্যায়ে কাজ করা হয়।

১. দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি পর্যায়
২. দুর্যোগকালীন সেবা পর্যায়
৩. পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

বিভিন্ন পর্যায়ে পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনীয়তা যেমন সম্পূর্ণ ভিন্নতর, তেমন সকলের দায়িত্বও ভিন্ন ভিন্ন। অপরদিকে প্রকৃতিগতভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে দুটো ভাগ করা হয়।

১. কাঠামোগত দুর্যোগ প্রশমন
২. অকাঠামোগত দুর্যোগ প্রশমন

উভয় প্রকার ব্যবস্থাপনায় কার কী দায়িত্ব সম্পাদন করা উচিত তাও নির্ধারণ করা থাকে।

Elements of Disaster Management

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপাদানসমূহ

যেকোনো ব্যবস্থাপনার মতো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাও একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা, যাতে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষ ব্যবস্থাপকের নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অতীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। আর এর অতীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে বিপর্যয়ের কবল থেকে আক্রান্ত এলাকার জানমালের ক্ষয়ক্ষতি

যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ হচ্ছে—

- ক. সমস্যা বিশ্লেষণ
- খ. চাহিদা নিরূপণ
- গ. বাস্তবায়ন
- ঘ. তথ্য ব্যবস্থাপনা
- ঙ. করণীয় নির্ধারণ
- চ. সম্পদের উৎস নির্ধারণ ও সমন্বয়সাধন
- ছ. কৌশলগত নির্দেশনা
- জ. দায়িত্বের পর্যবেক্ষণ
- ঝ. কার্যকারিতা মূল্যায়ন

Comprehensive Disaster Management

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

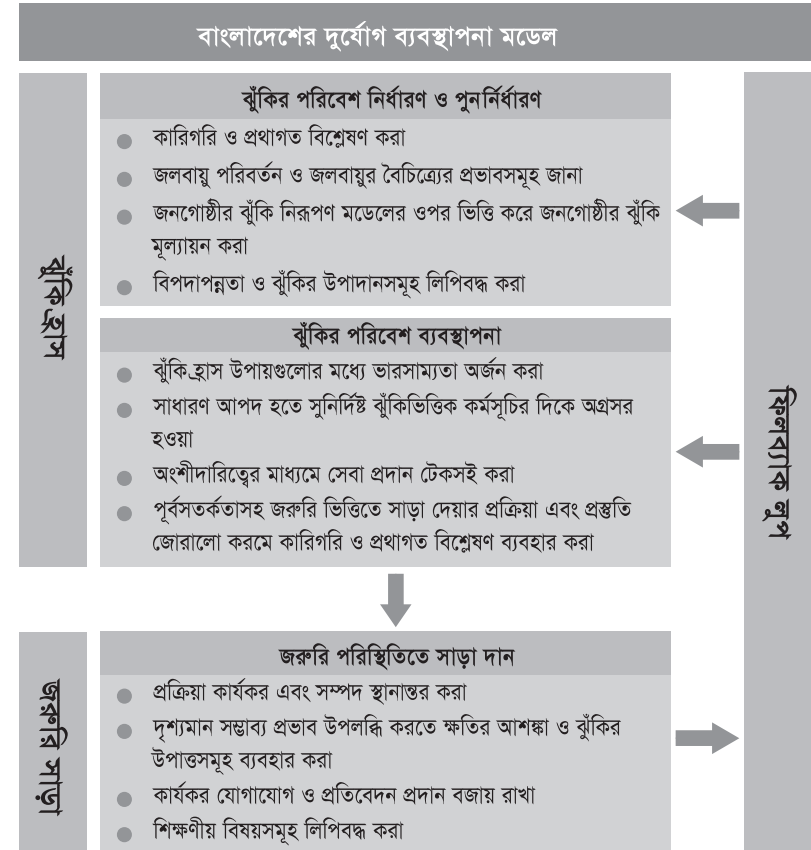
সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে, “আপদের সময় জরুরি ভিত্তিতে সাড়া দেওয়াসহ ঝুঁকির পরিবেশ জানা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করার ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া।” সার্বিক বলতে আমরা বুঝি সকল আপদে, সকল সেক্টরে, সকল ঝুঁকিকে লক্ষ্য করে সকলে মিলে সমন্বিতভাবে ঝুঁকি হ্রাসের জন্য কাজ করা।

Disaster Management Model

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল

দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়া ব্যবস্থাপনাকে পর্যালোচনা করতে বাংলাদেশ একটি সহজ মডেল সৃষ্টি করেছে। এই মডেলে দুটি প্রধান উপাদান আছে এবং এটি ঝুঁকি-হ্রাস এবং জরুরি সাড়াকে হ্রাস সংস্কৃতি সকল প্রচেষ্টার কেন্দ্রে রাখা নিশ্চিত করে।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য : সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়— প্রশমন, প্রস্তুতি,



সূত্র : National Plan for Disaster Management, Ministry of Food and Disaster Management, June 2007

সাড়া এবং পুনর্গঠনের ওপর সমান গুরুত্ব দেয়া হয়— আনুষ্ঠানিক এবং প্রথাগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়; সামগ্রিক থেকে সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি-হ্রাস কর্মসূচি নেয়া যায়— আনুষ্ঠানিক এবং প্রথাগত ঝুঁকি নির্ধারণ করা হয়; ঝুঁকি হ্রাস প্রক্রিয়াকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়; অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন করা যায়।

Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP)

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি)

২০০৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি) চালু

করা হয়। বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার ইউএনডিপি, ডিএফআইডি এবং ইউরোপীয় কমিশনের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত এই কর্মসূচির আওতায় ১২টি কম্পোনেন্ট রয়েছে। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ছাড়াও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়সহ বেশ কয়েকটি সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থা এই কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। ইতোমধ্যে সিডিএমপি দক্ষিণ এশিয়ায় সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি অনুস্মরণীয় মডেল হিসেবে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০০৯ সিডিএমপি প্রথম পর্বের কাজ শেষ হবে এবং জানুয়ারি ২০১০ হতে দ্বিতীয় পর্ব (2nd Phase)-এর কাজ শুরুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সচিব সিডিএমপির National Programme Director (NPD) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালক Deputy Programme Director (DPD) এর দায়িত্ব পালন করছেন।

Disaster Risk Management দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। এখানে দুর্যোগের পূর্বে ঝুঁকি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিপদাপন্নতা কমানোর জন্য পূর্বপ্রস্তুতি-বিষয়ক কার্যাবলি গ্রহণ করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে দুর্যোগের মারাত্মক প্রভাব রোধ করা সম্ভব হয়। সুতরাং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপদাপন্নতাহ্রাস ও সামর্থ্য ও সক্ষমতা বাড়ানো।

দুর্যোগ-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপাদানগুলো হচ্ছে- ক. ঝুঁকি বিশ্লেষণ খ. প্রশমন গ. প্রস্তুতি

NATIONAL AND INTERNATIONAL DRIVERS OF DISASTER MANAGEMENT দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চালিকাশক্তি

যা কোনো কাজ করার জন্য বা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য শক্তি যোগায় ও পথনির্দেশ করে বা ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সেগুলোই চালিকাশক্তি।

International Drivers আন্তর্জাতিক চালিকাশক্তিসমূহ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক চালিকাশক্তিসমূহ হচ্ছে-

United Nations Millennium Development Goals জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন কৌশলসমূহ

জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন কৌশলসমূহ সেপ্টেম্বর ২০০০-এর সহস্রাব্দ ঘোষণা ‘বিপদাপন্নতাকে রক্ষা করা’র মূল উদ্দেশ্যকে তুলে ধরেছে। সহস্রাব্দ ঘোষণা নিম্নলিখিত আটটি লক্ষ্য চিহ্নিত করেছে-

- অতি দারিদ্র্য ও ক্ষুধাকে সমূলে উৎপাটন করা।
- সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন।
- জেডার সমতাকে উৎসাহিত করা ও নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করা।
- শিশুমৃত্যু হার হ্রাস করা।
- মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি করা।

- এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক রোগসমূহ প্রতিরোধ করা।
- টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা, এবং
- উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ করা।

World Conference on Disaster Reduction দুর্যোগহ্রাসে বিশ্বসম্মেলন

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দুর্যোগ প্রশমনের ওপর একটি বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করে- যা কোবে, হিউগো, জাপানে ১৮ থেকে ২২ জানুয়ারি ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪ সালের ইয়োকোহামা সম্মেলন হতে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের তথ্য সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তী দশ বছরের পরিকল্পনা করার জন্য এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিশ্ব সম্মেলনের ফলাফল

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিশ্ব সম্মেলনের ফলাফল হলো হিউমো কর্মকাঠামো ২০০৫-২০১৫ প্রণয়ন। এ বিশ্ব সম্মেলনে ১৬৪টিরও বেশি দেশ হিউমো কর্মকাঠামোকে স্বীকৃতি দেয়।

এ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকল দেশকে নিম্নোক্ত অঙ্গীকার করতে আহ্বান জানানো হয়েছে- যা Hyogo Framework for Action (HFA) নামে পরিচিত।

এই কর্মকাঠামোতে যে দিকনির্দেশনা আছে তা হলো-

- টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি বিভিন্মমুখী আপদ মোকাবিলা কৌশল

গ্রহণ করা এবং দুর্যোগের ভয়াবহতা ও প্রাদুর্ভাব/প্রকোপ হ্রাস করা।

- জাতীয় রাজনীতির নীতি ও অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে দুর্যোগের ঝুঁকিকে স্থান দেয়া
- দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা
- ঝুঁকি মোকাবিলায় দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর জাতীয় সামর্থ্যকে শক্তিশালী করা
- দুর্যোগ প্রস্তুতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিনিয়োগ করা
- আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে দ্রুত দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করা
- কর্মকাঠামোর বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে এই বিশ্ব সম্মেলনকে গতিশীল করে তোলা।

International Strategy for Disaster Reduction

দুর্যোগহ্রাসে আন্তর্জাতিক কৌশল

দুর্যোগ হ্রাসে আন্তর্জাতিক কৌশলের লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক আপদ, প্রযুক্তিগত ও পরিবেশগত দুর্যোগের কারণে জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত ক্ষতি কমানোর পরিকল্পনার সঙ্গে টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে দ্রুত দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে, এমন জনগোষ্ঠী তৈরি করা।

দুর্যোগ হ্রাসে আন্তর্জাতিক কৌশল সকলের জন্য দুর্যোগ হ্রাস করতে চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলে। যেমন:

- ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা এবং দুর্যোগ হ্রাস

- সম্পর্কে ধারণা লাভে বিশ্বব্যাপী জনগণের সচেতনতা বাড়ানো।
- দুর্যোগ হ্রাস নীতি এবং পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করতে জনপ্রতিনিধির অঙ্গীকার নিশ্চিত করা।
- ঝুঁকি হ্রাস নেটওয়ার্ক বাড়ানোসহ আন্তঃপেশা এবং আন্তঃখাত অংশদারিত্বে উৎসাহিত করা।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো। উন্নয়ন ঘটানো।

National Drivers

জাতীয় চালিকাশক্তিসমূহ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় চালিকাশক্তিসমূহ হচ্ছে—

Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP)

দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র

এই কৌশলপত্র—

- সকল ক্ষেত্রের নীতিমালায় দুর্যোগ-ঝুঁকি প্রশমন যুক্ত করা হয়েছে
- দারিদ্র্য কমানো এবং প্রবৃদ্ধির দিকে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা'র ওপর পৃথক নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এই কৌশলপত্রের প্রধান কৌশলগত লক্ষ্য হলো :

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি প্রশমনকে জাতীয় নীতিমালা, প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াসমূহের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাসের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।
- দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

- দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য জনগোষ্ঠী পর্যায়ে সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।
- পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

Standing Orders on Disasters

দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনামূলক দলিল। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার এই আদেশাবলি প্রকাশ করে যা দেশে এবং বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

এই আদেশাবলির উদ্দেশ্য হল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্থাসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য চিহ্নিতকরণ। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহকে তাদের নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কৌশল SODতে রয়েছে।

ভূমিকম্প ও সুনামির মতো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কৌশলসহ দুর্যোগের সাম্প্রতিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বর্তমানে SOD-এর সংস্করণ ও আধুনিকায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (খসড়া)

দেশের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৮ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত এ আইনে সারা দেশে সকল ধরনের দুর্যোগের সৃষ্টি ব্যবস্থাপনার জন্য 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' গঠন এবং জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এছাড়া ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিকে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অঙ্গ সংগঠন/অনুবিভাগ হিসাবে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে এবং সব ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দ্রুত জরুরি সাড়ার ব্যবস্থা করার জন্য জাতীয় দুর্যোগ মেচ্ছাসেবক ফোর্স গঠনের উল্লেখ রয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রয়োজন বিবেচনায় সমগ্র দেশ বা দেশের কোনো অংশে দুর্যোগ অবস্থা ঘোষণার বিষয়টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনে উল্লেখ রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই এ আইনটি মন্ত্রী পরিষদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

National Plan for Disaster

Management

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের মিশন, ভিশন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের আলোকে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

এ কর্মপরিকল্পনায় জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার রূপরেখা ছাড়াও নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের বিশেষ চাহিদা বিবেচনায় বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করে খাতওয়ারি পরিকল্পনা গ্রহণের কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় ও বণ্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা, সুনামী সাড়া পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ফলো-আপ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সাড়া ও পুনর্বাসন তহবিল, জাতীয় ঝুঁকি হ্রাস তহবিল এবং সেন্ট্রাল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থ ব্যবস্থাপনা সহ দেশে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অর্থ ব্যবস্থাপনার কার্যকর কৌশল এ পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

DISASTER MANAGEMENT COMMITTEE

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

Disaster Management Committee

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী আদেশ বলে বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য যে কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছে সেগুলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বলে। এই কমিটিগুলো স্বাভাবিক সময়ে, দুর্যোগের সময় ও দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকে, এই দায়িত্বসমূহ দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি দ্বারা নির্ধারণ করা আছে।

National Disaster Management Council

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়গণ ও সচিবগণ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পিএসও নিয়ে এই কাউন্সিল গঠিত। এই ও দায়িত্বসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো :

কাউন্সিলের গঠন

সভাপতি	সদস্য-সচিব
প্রধানমন্ত্রী	মন্ত্রিপরিষদ সচিব
	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
সদস্য	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সচিব, অর্থ বিভাগ
মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ
মন্ত্রী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সচিব, যমুনা সেতু বিভাগ
মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সেনাবাহিনী প্রধান	সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
নৌবাহিনী প্রধান	সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, পরিকল্পনা কমিশন
বিমানবাহিনী প্রধান	পিএসও, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কার্যাবলি

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণ ও এতদ সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করা।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা ও তা বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করা।
- দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদন করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক পরিকল্পনায় বেসামরিক প্রশাসন, প্রতিরক্ষা বাহিনী ও এনজিওদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা।
- দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন ও মোকাবিলায় জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- আসন্ন দুর্যোগের সতর্কীকরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুতি অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী কার্যাবলির অগ্রাধিকার নির্ণয় ও ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দের নীতিমালা প্রণয়ন করা।
- অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনা ও নিষ্পন্ন করা।

National Disaster Management Advisory Council

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কাউন্সিল

কাউন্সিলের গঠন

চেয়ারম্যান

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অভিজ্ঞ/এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কমিটির চেয়ারম্যান হবেন।

সদস্য

দুর্যোগ প্রবণ এলাকা হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য (৮), সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও, সাহায্য সংস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি যাদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হবে পানি সম্পদ, আবহাওয়া, ভূমিকম্পন প্রকৌশল, ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা, সামাজিক নৃতত্ত্ব (Social Anthropology), শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি (মোট ৩০ সদস্য) চেয়ারম্যান, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি; প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ; প্রেসিডেন্ট,

ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারস, চেয়ারম্যান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এসোসিয়েশন, কৃষি ব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংক, মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর।

সদস্য-সচিব

মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো।

সভাসংখ্যা

বছরে দু'বার; চেয়ারম্যান প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত সভা আহ্বান করতে পারবেন।

সাবকমিটি

সাবকমিটি গঠন এবং তা চেয়ারম্যান নির্ধারণ করে ঐ সমস্ত সাবকমিটিতে বিশেষজ্ঞ কো-অপ্ট করা যেতে পারে। ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ, বন্যার পূর্বাভাস, ভূমিকম্পের ঝুঁকি, জনগণের অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে সাবকমিটি গঠন করা যেতে পারে।

সাধারণ কার্যাবলি

- দুর্যোগ প্রতিরোধ/প্রশমন, প্রস্তুতি, জরুরি মোকাবেলা, পুনর্বাসন, পুনঃনির্মাণের টেকনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে পরামর্শ প্রদান করবে।
- কমিটিসমূহের সদস্যদের দুর্যোগের ঝুঁকি (Risk) এবং প্রশমন সম্ভাবনা (Mitigation Possibilities) সম্বন্ধে সজাগ করবে এবং কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার বিষয়ে তাহাদের উৎসাহিত করবে।
- দুর্যোগের ঝুঁকির বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনার একটি 'ফোরাম' সৃষ্টি করবে যেখানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- বিশেষ প্রকল্প বা কাজের জন্য অর্থ প্রদানের সুপারিশ করবে। বিশেষ জরুরি পদ্ধতির প্রবক্তা বা ক্ষমতা প্রদানের জন্য প্রয়োজনে সুপারিশ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো বা অন্য কোনো সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক চিহ্নিত সমস্যার সমাধানের সুপারিশ করবে।
- দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের প্রস্তাব পেশ করবে।
- সংঘটিত দুর্যোগসমূহের মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমের 'পোস্ট মর্টেম' এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন করবে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নিকট এ ব্যাপারে সুপারিশসহ প্রতিবেদন পেশ করবে।

Inter Ministerial Disaster Management Co-ordination Committee

আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি

সভাপতি

১. মন্ত্রী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

সহ-সভাপতি

২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সদস্য

৩. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৪. সদস্য (প্রোগ্রামিং) পরিকল্পনা কমিশন

৫. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৬. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

৭. সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

৮. সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৯. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১০. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

১১. সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১২. সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৩. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

১৪. সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

১৫. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

১৬. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

১৭. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

১৮. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

১৯. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

২০. সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২১. সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ

২২. সচিব, যমুনা সেতু বিভাগ

২৩. সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

২৪. সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার মন্ত্রণালয়

২৫. প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

২৬. মহাপরিচালক, এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো

২৭. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

২৮. মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর

২৯. মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি।

নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণও আমন্ত্রণক্রমে উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করবেন। পরিচালক, আবহাওয়া অধিদপ্তর; যুগ্ম সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়; চেয়ারম্যান, পানি উন্নয়ন বোর্ড; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, টিঅ্যান্ডটি বোর্ড; মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ; পরিচালক, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি); পরিচালক, এডাব; প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ; ইউএন, রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর; জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি; প্রধান প্রকৌশলী,

গণপূর্ত এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং অন্য কোনো বিশেষজ্ঞ।

আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব

ক. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। দুর্যোগ প্রতিরোধ/প্রশমন, প্রস্তুতি, মোকাবিলা এবং পুনর্বাসনবিষয়ক কর্মকাণ্ডের পরিবীক্ষণ ও তার অগ্রগতি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে অবহিত করা।

খ. দুর্যোগ-বিষয়ে সরকারি সংস্থাসমূহের কাজের সমন্বয় সাধন করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর সার্বিক কাজের পর্যালোচনা করা।

গ. প্রতি ৬ মাস অন্তর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার দুর্যোগ প্রস্তুতি পর্যালোচনা করা।

ঘ. দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ তৎপরতা সমন্বয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং

ঙ. অন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

দুর্যোগ প্রতিরোধ/প্রশমনবিষয়ক দায়িত্ব

ক. দুর্যোগ প্রতিরোধ/প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্পসমূহ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করবার নীতি ও অগ্রাধিকারের বিষয়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ পেশ করা।

খ. বৃহৎ প্রকল্পগুলো দুর্যোগে নষ্ট হবে কি না বা এই প্রকল্পগুলো দুর্যোগ বৃদ্ধি বা দুর্যোগকালে ক্ষয়ক্ষতি বাড়াবে কি না তা পরীক্ষা করবার (Disaster Impact Assessment-DIA) পদ্ধতি

নির্ধারণ করা।

গ. দুর্যোগ প্রতিরোধ/প্রশমন প্রকল্পসমূহের প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমন্বয় করা এবং এতদুদ্দেশ্যে নীতি প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং সম্পদ বণ্টনের সুপারিশ করা।

ঘ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঙ. দুর্যোগের ঝুঁকি ও দুর্যোগ প্রশমনের জাতীয় নীতিমালা এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ (Monitoring) করা এবং অগ্রগতি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে অবহিত করা।

দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ে দায়িত্ব

ক. দুর্যোগের পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ পদ্ধতি পর্যালোচনা করা এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা।

খ. দুর্যোগ-সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) পর্যালোচনা করা।

গ. সার্বিক দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিবীক্ষণপূর্বক এর অবস্থা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে অবহিত করা।

ঘ. স্থানীয় পর্যায়ে সতর্কীকরণ ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা।

ঙ. দুর্যোগে করণীয় বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

চ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কাজে সরকারি সংস্থা ও এনজিওর মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা।

ছ. দুর্যোগে কোনো স্থানের টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে সেখানে দ্রুত অতিরিক্ত

যন্ত্রপাতি দেয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
জ. দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত নির্ধারণ এবং পুনর্নির্মাণের গুণগত মান নিশ্চিত করা।

জরুরি অবস্থা মোকাবিলা-বিষয়ক দায়িত্ব সতর্কীকরণ অবস্থা

ক. সতর্কবাণী যাতে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, সংস্থা, গণপ্রচারমাধ্যমের নিকট পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা।

দুর্যোগকাল

খ. দুর্যোগকবলিত এলাকার প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাহায্যার্থে প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা।

গ. যোগাযোগ ও জরুরি সুবিধাদি প্রদানের জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য প্রেরণ করা ও সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা।

ঘ. ত্রাণসামগ্রী অর্থ ও যানবাহন বিষয়ক নির্দেশ প্রদান ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা।

Ministry of Food and Disaster Management খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় দুর্যোগ বিষয়ে সরকারের ‘ফোকাল পয়েন্ট’। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো এই মন্ত্রণালয়কে স্বাভাবিক সময়ে, সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়ে, দুর্যোগ মোকাবিলা পর্যায়ে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দ্বারা সহায়তা প্রদান করে। এই মন্ত্রণালয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিকে তথ্য প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে

আসছে। এই মন্ত্রণালয় সচিব জরুরি ত্রাণকার্য পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করেন।

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

স্বাভাবিক সময়ে

ক. প্রতি তিন মাস অন্তর মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করা।

খ. দুর্যোগপ্রবণ থানাসমূহ এবং থানাধীন বিশেষ দুর্যোগপ্রবণ এলাকা এবং যে সকল জনসাধারণ দুর্যোগকবলিত হতে পারে তাদের চিহ্নিত করা।

গ. বিদেশী ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ, যারা দুর্যোগ প্রস্তুতি, মোকাবিলা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক তাদের তালিকা হালনাগাদ করা।

ঘ. সর্বপর্যায়ে দুর্যোগকালে ব্যবহার্য খাদ্য, ত্রাণসামগ্রী এবং যানবাহনের তথ্য সংরক্ষণ করা।

ঙ. স্থায়ী আদেশাবলি যাতে গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে পৌঁছায় তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা।

চ. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সিপিপি, রেড ক্রিসেন্ট, এনজিও প্রভৃতির দুর্যোগ প্রস্তুতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভার ব্যবস্থা করা।

ছ. মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জেলা ও থানা

সদরের সার্বক্ষণিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।

জ. দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবিলার পদক্ষেপগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করা।

সতর্ক ও হুঁশিয়ারি পর্যায়ে

ক. ত্রাণসামগ্রী যথাস্থানে পৌঁছাবার ও যানবাহন মোতায়েনের নির্দেশ প্রদান করা।

খ. মন্ত্রণালয়ে একটি ‘কন্ট্রোল পয়েন্ট’ নির্ধারণ এবং তার পদবি ও টেলিফোন নম্বর সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা।

গ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর জরুরি অপারেশন কেন্দ্র চালু রাখা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরসহ সব পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র চালু করবার নির্দেশ প্রদান করা।

ঘ. আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা এবং হুঁশিয়ারিসংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও আদেশ জারি করা।

ঙ. বেতার, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স, টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে হুঁশিয়ারি আদেশজারি নিশ্চিত করা। মন্ত্রণালয়, সংস্থা, অধিদপ্তর, সিপিপি, বিডিআরসিএস, এনজিও, জেলা প্রশাসক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও কর্মকর্তাকে অবহিত করা।

চ. নিয়ন্ত্রণ কক্ষসমূহ দিনরাত চালু রাখা।

ছ. সিপিপির বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা আহ্বান এবং তার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা।

জ. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান (প্রধানমন্ত্রী) এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

সমন্বয় কমিটির সভাপতিকে পরিস্থিতি ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অবহিত করা।

ঝ. সংশ্লিষ্ট জেলা, থাকা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিশ্চিত করা।

ঞ. ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও ত্রাণকার্যের জন্য হেলিকপ্টার/পরিবহণ বিমান প্রস্তুত রাখতে বিমান বাহিনীকে অনুরোধ করা।

ট. উদ্ধার ও ত্রাণকাজের জন্য জলযান প্রস্তুত রাখতে নৌবাহিনী ও অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা।

ঠ. জানমাল বাঁচানোর লক্ষ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা।

ড. সেনাবাহিনীকে দ্রুত দুর্গত এলাকায় যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা।

ঢ. মহাবিপদ-সংকেত ও এতদসংক্রান্ত ব্যবস্থা সকলকে, বিশেষ করে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, থানা নির্বাহী অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং অন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে অবহিত করা।

ণ. উদ্ধার ও ত্রাণকাজের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন অধিগ্রহণ করবার জন্য জেলা ও থানা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা।

ত. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করা।

থ. আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সম্ভাব্য বিপদগ্রস্ত লোকদের নিরাপদ আশ্রয়ে অপসারণের

জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করা।

দ. বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক ঘন ঘন ইঁশিয়ারি বার্তা প্রচার নিশ্চিত করা।

ধ. জেলা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সিপিপি এবং আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ নিশ্চিত করা।

ন. দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী আগাম বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।

দুর্যোগ পর্যায়ে

ক. আবহাওয়া অনুকূলে আসার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ এবং উদ্ধার কাজের লক্ষ্যে নৌ ও বিমান বাহিনীর জাহাজের জন্য অনুরোধ করা।

খ. জরুরি অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োজন মতো প্রতিরক্ষা বাহিনীকে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে সাহায্য করবার জন্য আহ্বান করা।

গ. এনজিওদের সাথে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজের সমন্বয় করা।

ঘ. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভার ব্যবস্থা করা।

ঙ. ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা।

চ. ত্রাণ ও পুনর্বাসনে অতিরিক্ত সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা।

ছ. খয়রাতি অর্থ এবং অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী দ্রুত ব্যবস্থা করা।

পুনর্বাসন পর্যায়ে

ক. গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি, টেস্ট রিলিফ এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের ব্যবস্থা করা।

খ. দুর্গত এলাকায় অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত জরুরি পুনর্বাসন কাজ অব্যাহত রাখা।

গ. পুনর্বাসন কর্মসূচি সমন্বয় করা।

MoFDM Corporate Plan '05-09

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

মন্ত্রণালয়ের কর্পোরেট

প্ল্যান '০৫-০৯

বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় প্রণীত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাই হলো করপোরেট প্ল্যান (২০০৫-২০০৯)। সিডিএমপি'র সহযোগিতায় এই পরিকল্পনা তৈরি করা হয়, যার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য যেকোনো প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে জনগণের বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপন্নতাকে প্রতিরোধযোগ্য ও মানবিক দিক থেকে সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা। আর এর লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে : একটি পেশাগত মানসম্পন্ন, দক্ষ এবং অনুশীলনযোগ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা, সরকারি ও জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতি ও ব্যবস্থাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা এবং মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ, দুর্যোগ সহনীয় প্রতিরোধক্ষম এমন একটি জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা, যাদের থাকবে নানামুখী দুর্যোগ মোকাবিলার দক্ষতা ও সামর্থ্য, বিভিন্ন দুর্যোগে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যথাযথভাবে নিরূপণের মাধ্যমে প্রতিরোধ কর্মসূচির নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বৃহত্তর পরিসরে নেটওয়ার্কিং এবং সরকারি পর্যায়ে

তথ্যবিনিময়, সতর্কীকরণ ও অবহিতকরণ পদ্ধতির মান উন্নয়ন, একটি শক্তিশালী, সুব্যবস্থিত, সুসম ও দুর্যোগ প্রতিরোধক্ষম জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি কমানো, সকল স্তরের দুর্যোগ মোকাবিলা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন এবং জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতির সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জোরদার করা হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

Disaster Management Bureau

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৯২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে এ ব্যুরোর কার্যক্রম 'সাপোর্ট টু কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট' প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। ব্যুরোর কার্যক্রম গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় Rights Based Planning and Monitoring: Disaster Preparedness শীর্ষক প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সিডিএমপি এর এডভোকেসি কার্যক্রম ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিষয়ক দু'টো কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর প্রধান কাজসমূহ

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।
২. দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনসাধারণ, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী

এবং বিভিন্ন পেশার লোকদের মধ্যে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ;

৩. মাঠ পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের কার্যক্রম জোরদারকরণে কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও অন্যান্য সহায়তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, জাতীয় পর্যায়ের কমিটিসমূহের সাথে সমন্বয় রক্ষা, জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় পর্যায়ের ৪টি কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিশ্চিতকরণ;
৪. পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় দুর্যোগ প্রশমনের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫. দুর্যোগ প্রতিরোধে প্রস্তুতি ও প্রশমন বিষয়ক আইন ও অন্যান্য কার্যাবলি প্রণয়ন;
৬. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, এনজিওদের সহযোগিতায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং অন্যান্যদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৭. জাতীয় পর্যায়ে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বলিত একটি ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার (EOC) স্থাপন এবং সেন্টার হতে দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য সরকারি ও

বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট বিতরণ;

৮. ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, কিল্লা, বাঁধ বন্যার লেভেলের উঁচু প্লাটফর্ম প্রভৃতির তালিকা, ঠিকানা অবস্থা ও মালিকানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
৯. আবহাওয়ার সতর্কবার্তা (সিগন্যাল) সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করা, বিভিন্ন দুর্যোগের বিষয়ে বেতার ও টেলিভিশনে মাঝে মাঝে গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা, দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয়, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সভা/সেমিনার/কর্মশালা অনুষ্ঠান আয়োজন;
১০. সম্ভাব্য বিপদাপন্ন এলাকার বিভিন্ন সংস্থা ও জনগণের জরুরি করণীয় বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান;
১১. দুর্যোগকালে বিদেশী দূতাবাস ও জাতিসংঘ মিশনসমূহের জন্য দৈনিক বুলেটিন প্রকাশ, ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও ত্রাণের প্রয়োজন নির্ধারণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান;
১২. উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, সমস্যা ও প্রয়োজন চিহ্নিতকরণ, নিশ্চিতকরণ এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

Directorate of Relief and Rehabilitation

ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর

ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ে অধীনে ১৯৮৪ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের যাত্রা

শুরু হয়। এই অধিদপ্তরের চলমান কার্যক্রম নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করা।
২. কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফসহ খাদ্য সহায়তা সম্পৃক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা।
৩. পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
৪. Vulnerable Group Feeding (VGF) এবং Vulnerable Group Development (VGD) কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
৫. দুর্যোগ পরবর্তী গৃহনির্মাণ সহায়তা প্রদান।
৬. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয় এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।
৭. ছোট সেতু, কালভার্ট, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা।
৮. খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
৯. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
১০. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি)-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান।

সাংগঠনিক কাঠামো

ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। অধিদপ্তরের আওতায় দেশের জেলা পর্যায়ে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের মাধ্যমে মার্চ

পর্যায়ের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এছাড়া মার্চ পর্যায়ে সমন্বয়ের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কাজের বিনিময়ে খাদ্য এবং টেস্ট রিলিফ সমন্বয় কমিটি কার্যকর রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

অধিদপ্তরের শাখাসমূহ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম ৫টি শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

১. প্রশাসন
২. কাজের বিনিময়ে খাদ্য
৩. ত্রাণ
৪. Vulnerable Group Development (VGD) কর্মসূচি
৫. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

City Corporation Disaster Management Committee

সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ

ব্যবস্থাপনা কমিটি

সিটি কর্পোরেশনে মেয়র এর নেতৃত্বে সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ অন্তর্ভুক্ত হবেন। সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের সচিব কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

এই কমিটির দায়িত্বসমূহ

- সিটি কর্পোরেশনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সিটি কর্পোরেশনে আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ নিশ্চিত করবে।
- বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে ঝুঁকি চিহ্নিত করবে।
- ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদি বিপদাপন্নতা হ্রাস ও তৈরির জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।
- সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সরকার এনজিও সকল ত্রাণ তৎপরতা সমন্বয় করবে।

District Disaster Management Committee

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

এই কমিটি একজন সভাপতি, একজন সদস্য-সচিব ও জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জেলার সকল সংসদ সদস্য/সদস্যগণ এই কমিটির উপদেষ্টা থাকেন। স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে আরো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন। এই কমিটি বছরে অন্তত ৪ বার সভায় মিলিত হবে। আপদকালীন সময়ে প্রত্যহ একবার এবং অবস্থার কিছু উন্নতি হলে প্রতি সপ্তাহে ২ বার সভায়

মিলিত হবে। এই কমিটির গঠন ও কার্যাবলি নিচে উল্লেখ করা হলো :

সভাপতি

১. জেলা প্রশাসক

সদস্য

২. জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ
৩. জেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দ
৪. মহিলা প্রতিনিধি
৫. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধি
৬. ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) প্রতিনিধি
৭. এনজিও প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

৮. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা
৯. সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি (দুর্যোগকালীন সময়ে)

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব (স্বাভাবিক সময়ে)

- ব্যাপকভিত্তিক উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন, সক্রিয়করণ, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও তথ্য প্রাপ্তির এবং প্রাপ্য প্রশিক্ষণ সুবিধাদি হতে উপকার আহরণ নিশ্চিতকরণ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে অবহিত করে নিয়মিত দুর্যোগ-বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন।
- জেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে, দুর্যোগের ঝুঁকি ও ঝুঁকি হ্রাসকরণের সম্ভাবনাসমূহ পূর্ণভাবে বিবেচিত করা নিশ্চিতকরণ।

- দুর্যোগসংক্রান্ত পূর্বাভাস প্রদান ও জনগণকে সচেতন করা।
- নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আসন্ন বিপদ-সংক্রান্ত সতর্কবার্তা এবং দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সংস্থাসমূহ যে কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত ও ক্ষমতাসম্পন্ন সে লক্ষ্যে দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাসংক্রান্ত পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে জেলার সকল কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠান এবং উপজেলা পর্যায়ে এতদ্বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- যদি প্রয়োজন হয় জেলা সদরের জনসাধারণকে অপসারণের জন্য নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্র নির্ধারণ ও উক্ত স্থানগুলোতে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে দায়িত্ব বণ্টন।
- যখন প্রয়োজন, জেলা সদরে অবস্থিত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে পাট্রে ভরা যায়, এমন খাওয়ার পানি সরবরাহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ ক্রমে ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে একই সুবিধাদি ও সেবা নিশ্চিতকরণ।
- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে উদ্ধারকাজ, প্রাথমিক ত্রাণকার্যে, সহায়তার জন্য উপজেলা সদর ও জাতীয় জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও জেলার অভ্যন্তরে অতি প্রয়োজনীয় সেবা ব্যবস্থা

সংরক্ষণ/পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা-সংবলিত আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।

দুর্যোগকালে

- জেলার অভ্যন্তরে সকল স্থানে অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ এবং প্রাথমিক পুনর্বাসনসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সহায়তামূলক সমন্বয়ের জন্য 'জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র' পরিচালনাকরণ।
- প্রয়োজন হলে, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করে উদ্ধারকার্য পরিচালনা এবং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাসমূহের উদ্ধারকার্য পরিচালনার জন্য উদ্ধারকারী দলসমূহ প্রেরণ ও কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও অন্যান্য জাতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা কর্মকর্তাবৃন্দ ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষতির উপাত্ত সংগ্রহ ও যাচাইকরণ, কর্মকর্তা বা অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তিবর্গ দ্বারা জরুরি জরিপ পরিচালনা করে প্রয়োজন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ।
- খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের নিকট ক্ষতির তথ্য, প্রয়োজন ও প্রাপ্য সম্পদ এবং ত্রাণকাজের ও পুনর্বাসন কাজের জন্য নির্ধারিত অগ্রাধিকারভিত্তিক উপকরণাদির প্রয়োজন-সংক্রান্ত বিবরণ/উপাত্ত সরবরাহ।
- জেলা পর্যায়ে পুনর্বাসন কাজের জন্য ঝুঁকি হ্রাসকরণের সম্ভাব্য ব্যবস্থাসহ সতর্কতার সঙ্গে অগ্রাধিকারভিত্তিক

পরিকল্পনা প্রণয়ন।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে স্থানীয়ভাবে বা ত্রাণ অধিদপ্তর/অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্য সম্পদ, বস্তুনিষ্ঠভাবে নিরূপিত প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বরাদ্দ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ত্রাণ ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত সহায়তা সামগ্রী বিতরণের তদারকি ও হিসাবাদি সংরক্ষণ এবং তা জাতীয় কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য ত্রাণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের নিকট প্রেরণ।
- জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। এ ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলি এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তাত্ক্ষণিক আদেশ অনুসরণ করা।

Upazila (Subdistrict) Disaster Management Committee

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

এই কমিটির সভাপতি হিসেবে থাকবেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। স্থানীয় সংসদ সদস্য/সদস্যগণ এই কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন। আর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা থাকবেন সদস্য-সচিব হিসেবে। স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে আরও সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন। এই কমিটি প্রতি ২ মাস পরপর সভায় মিলিত হবে। আপদকালীন

সময়ে প্রত্যহ একবার এবং অবস্থার কিছু উন্নতি হলে প্রতি সপ্তাহে ২ বার সভায় মিলিত হবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলি নিচে উপস্থাপন করা হলো :

সভাপতি

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার

সদস্য

২. পৌরসভা চেয়ারম্যান (যদি থাকে)

৩. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ

৪. উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ (উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা (উপবৃত্তি), উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পুলিশ), উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কমান্ডার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা)

৫. মহিলা প্রতিনিধি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির প্রতিনিধি

৬. উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সভাপতি

৭. ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) প্রতিনিধি (যদি থাকে)

৮. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি (যদি থাকে)

৯. এনজিও প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওর প্রতিনিধি)

১০. গণ্যমান্য ব্যক্তি/সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (প্রেসক্লাবের সভাপতি, বণিক সমাজের সভাপতি এবং সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কলেজ/মাদ্রাসার অধ্যক্ষ)

১১. উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার

সদস্য-সচিব

১২. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব

স্বাভাবিক সময়ে

■ ব্যাপকভিত্তিক ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন, সক্রিয়করণ, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও তথ্য প্রাপ্তি এবং প্রাপ্য প্রশিক্ষণ সুবিধাদি হতে উপকার আহরণ নিশ্চিতকরণ।

■ সতর্কতা বর্ধন, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকরণ, নিশ্চিত কার্যকর বেঁচে থাকার উপায়গুলো জ্ঞাত করানোর বিষয় নিশ্চিতকরণ।

■ স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্যোগের ঝুঁকি এবং তা কমানোর সম্ভাবনার বিষয় পূর্ণভাবে বিবেচিত হয়েছে কি না, তা নিশ্চিতকরণ।

■ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে অবহিত করে নিয়মিত দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন।

■ আসন্ন বিপদ-সংক্রান্ত সতর্কবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা কর্তৃপক্ষ ও

স্থানীয় সংস্থাসমূহ যে কার্যকরভাবেও দক্ষতার সঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত ও ক্ষমতাসম্পন্ন সে লক্ষ্যে দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

■ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাসংক্রান্ত পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে জেলার সকল কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে এতদ্বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

■ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে উপজেলা সদরের জনসাধারণকে অপসারণের জন্য নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্র নির্ধারণ ও সেই স্থানগুলোতে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে দায়িত্ব প্রদান।

■ আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে পাণ্ডা যায় এমন খাওয়ার পানি সরবরাহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ ক্রমে ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে একই সুবিধাদি ও সেবা নিশ্চিতকরণ।

■ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে উদ্ধারকাজ, প্রাথমিক ত্রাণকার্যে, সহায়তার জন্য জেলা সদর ও ইউনিয়নসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা সংবলিত আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।

■ জেলা ও ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় মাঝে মাঝে উপজেলার অভ্যন্তরে তথ্যের প্রচারণা ও সতর্কবার্তা, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ।

■ গ্রাম পর্যায়ে দুর্যোগের পূর্বাভাস ব্যাপক প্রচার করে গণসচেতনতা সৃষ্টিকরণ।

দুর্যোগকালে

■ উপজেলা পর্যায়ে অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ের জন্য 'জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র' পরিচালনা।

■ স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করে উদ্ধারকার্য পরিচালনা ও অন্যদের উদ্ধারকার্য পরিচালনার জন্য সমন্বয় সাধন।

■ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা কর্মকর্তাবৃন্দ ও ইউনিয়ন থেকে দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির উপাত্ত সংগ্রহ ও যাচাইকরণ, কর্মকর্তা বা অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সমীক্ষা পরিচালনা করে তথ্য বিন্যাসের মাধ্যমে প্রয়োজন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ।

■ জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষতি, প্রয়োজন ও প্রাপ্ত সম্পদ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনসংক্রান্ত বিবরণ/উপাত্ত সরবরাহকরণ।

■ স্থানীয় পর্যায়ে পুনর্বাসন কাজের জন্য ঝুঁকি হ্রাসকরণের সম্ভাব্য ব্যবস্থাসহ সতর্কতার সঙ্গে অগ্রাধিকারভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।

■ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে স্থানীয়ভাবে বা ত্রাণ অধিদপ্তর/অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্য সম্পদ, বস্তুনিষ্ঠভাবে নিরূপিত প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের জন্য বরাদ্দ ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

- ত্রাণ ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত সহায়তা সামগ্রী বিতরণের তদারকি ও হিসাবাদি সংরক্ষণ এবং তা জাতীয় কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য ত্রাণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের নিকট প্রেরণ।
- উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করা।

এ ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলি এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক আদেশ অনুসরণ করবে।

Municipal Disaster Management Committee পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্থানীয় সংসদ সদস্য/সদস্যগণ এই কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন। স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে সর্বোচ্চ ৩ জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন। স্বাভাবিক সময়ে এ কমিটি প্রতিমাসে একবার সভায় মিলিত হবে। আপদপূর্ব মুহূর্তে বা সতর্ককালীন সময়ে সপ্তাহে একাধিকবার, আপদকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (অন্তত একবার) এবং আপদ-অব্যবহিত পরে (অবস্থার কিছু উন্নতি হলে) প্রতি সপ্তাহে একবার সভায় মিলিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে এ কমিটি জরুরি সভায় মিলিত হতে পারবে। সভাপতির অনুমোদনক্রমে কমিটির কিছু সদস্য অন্যান্য উন্নয়নবিষয়ক কমিটির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সভায় যোগ দিতে পারবেন। সভায় সকল সদস্য উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। স্বাভাবিক বা আপদ-পরবর্তী সময়ে তিন ভাগের এক ভাগ

সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। সতর্ককালীন এবং আপদকালীন সময়ে চার ভাগের এক ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা উপজেলা/জেলা (জেলা সদরে পৌরসভার ক্ষেত্রে) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পেশ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আগের বছরের কমিটির কোনো রদবদল না হলেও তালিকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠাতে হবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

সভাপতি

১. পৌরসভার চেয়ারম্যান

সদস্য

২. পৌরসভার কমিশনারবন্দ
৩. পৌরসভার মেডিকেল অফিসার/স্যানিটারি পরিদর্শন
৪. পৌরসভার নির্বাহী বা সহকারী প্রকৌশলী
৫. উপ-পরিচালক কর্তৃক মনোনীত একজন কৃষি কর্মকর্তা
৬. উপ-পরিচালক কর্তৃক মনোনীত একজন পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
৭. নির্বাহী প্রকৌশলী (ডিপিএইচই)-এর প্রতিনিধি
৮. পৌর এলাকায় অবস্থিত প্রেসক্লাবের সভাপতি
৯. পৌর এলাকায় কর্মরত এনজিওর প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও প্রতিনিধি)

১০. জেলা সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি
১১. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি
১২. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
১৩. মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি (জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত)
১৪. সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)
১৫. ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির জেলা কর্মকর্তার প্রতিনিধি
১৬. পৌরসভার যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)
১৭. সমাজসেবা কর্মকর্তার প্রতিনিধি
১৮. চেম্বার সভাপতি
১৯. জেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার প্রতিনিধি
২০. নির্বাহী প্রকৌশলী (পিডিবি) বা জেনারেল ম্যানেজার পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির প্রতিনিধি
২১. উপজেলা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তার প্রতিনিধি
২২. উপজেলা আনসার বা ভিডিপি কর্মকর্তার প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

২৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিব
পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব স্বাভাবিক সময়ে :

১. পৌরসভা পর্যায়ে আপদ, বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরূপণ করা।
২. লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক সক্ষমতা, সামাজিক অবস্থান, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় সবচেয়ে

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী সনাক্ত করা এবং এর ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং অবস্থান মানচিত্র তৈরি করা।

৩. সনাক্তকৃত সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ-ঝুঁকি-হাসকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।
৪. স্থানীয় জনগোষ্ঠী, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সংগঠনগুলো যেন দরদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহাসকরণের জন্য আয়সহ অন্যান্য সামর্থ্য বাড়াতে সহযোগিতা করতে পারে এবং আসন্ন বিপদ-সংক্রান্ত সতর্কবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে বা আপদ সংঘটিত হলে যাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয়ে ওঠে, সে লক্ষ্যে একটি সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।
৫. পৌরসভা পর্যায়ে সরকারি বিভাগ, এনজিও এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি-হাসকরণের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া।
৬. দুর্যোগ-ঝুঁকি-হাসকরণের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী তহবিল গঠন করার উদ্যোগ নেয়া।
৭. কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করা।

৮. গৃহস্থালী বা সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাসকরণে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণের বিষয় সম্পর্কে যাতে স্থানীয় জনসাধারণ অবহিত হয় এবং সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করা এবং গৃহস্থালী বা সমাজ পর্যায়ের দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাসকরণের সফল ঘটনাগুলোর ব্যাপক প্রচার নিশ্চিত করা।

৯. জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে (জেলা সদরের পৌরসভা জেলা কমিটিকে এবং অন্যান্য পৌরসভা সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটিকে) অবহিত করে নিয়মিত দুর্যোগবিষয়ক সহায়তামূলক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা।

১০. দুর্যোগসংক্রান্ত পূর্বাভাস গ্রহণ এবং ওয়ার্ড কমিশনার ও সাধারণ জনগণকে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সিস্টেম গড়ে তোলা (উদাহরণ- একজন জরুরি বার্তার ফোকাল পয়েন্ট প্রত্যেক ওয়ার্ডে নির্বাচন করা, তাদের নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগের মাধ্যম নির্ধারণ করে রাখা, বিকল্প ফোকাল পার্সন এবং তাদের যোগাযোগ-ঠিকানা ও মাধ্যম নির্বাচন করে রাখা)

১১. সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা (প্রয়োজনে জেলা/উপজেলা কর্তৃপক্ষের সহায়তা চাওয়া যেতে পারে)

জরুরি সময়ে : (জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা)

১. সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার করা, অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী

বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে অপসারণ করা, উদ্ধারকার্য পরিচালনার সামগ্রিক প্রস্তুতি পরীক্ষা করা ও উদ্ধার দলকে সতর্কবাহ্য প্রস্তুত করা

২. প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে দুর্যোগ-সংক্রান্ত পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাঠে নিয়োজিত করা এবং পুরো সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচারের সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা

৩. পূর্বনির্ধারিত জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে সতর্কবাহ্য প্রস্তুত রাখা

৪. আশ্রয়কেন্দ্রের কাছে নির্ধারিত স্থান হতে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয় বিকল্পগুলো নির্ধারণ করে রাখা।

৫. প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী, যুবক-যুবতী, ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবীদের সমাজভিত্তিক খাবার স্যালাইন তৈরি ও পানি বিশুদ্ধকরণের একটি মহড়া পরিচালনা করা এবং কীভাবে দ্রুত খাবার পানি বিশুদ্ধ করে সরবরাহ করা যাবে তার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পর্কে নিশ্চিত করা।

৬. আপদকালে ব্যবহার করার মতো জীবনরক্ষাকারী ওষুধ পৌরসভা পর্যায়ে মজুদ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখে জরুরিভাবে মজুদ ঘাটতি (যদি থাকে) পূরণ করার ব্যবস্থা নেয়া।

৭. আপদকালে কী কী জরুরি কাজ এবং কাকে কাকে কোন সময়ে প্রয়োজন সে

সম্পর্কিত একটি চেকলিস্ট তৈরি করা।

৮. উদ্ধারকারী দলের উদ্ধারকার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, ত্রাণকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহযোগিতা এবং আত্মরক্ষার উপকরণ (যেমন: লাইফ জ্যাকেট) আছে কি না তা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় জরুরি উপকরণ ও লজিস্টিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা নেয়া; প্রয়োজনে অন্যান্য এলাকার বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেয়া এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের উৎসের অন্বেষণ করা।

আপদকালে

১. স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করে প্রাথমিক উদ্ধারকার্য পরিচালনা, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত হলে, অন্যদেরকে উদ্ধারকাজে সহযোগিতা প্রদান করা।

২. প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী, যুবক-যুবতী, ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে স্থানীয় সম্পদ বা দ্রুত সহায়তা ব্যবহার করে পানি শোধনের ট্যাবলেট এবং খাবার স্যালাইন প্রস্তুত করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের মধ্যে বিতরণের মাধ্যমে ডায়রিয়াসহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগ থেকে মুক্ত করার জন্য সার্বিক জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. পৌরসভা পর্যায়ে যেন প্রয়োজন/ন্যায্যতার ভিত্তিতে জরুরি ত্রাণ বিতরণ হয়, সেজন্য সকল ত্রাণ বিতরণ কার্যের (সরকারি ও বেসরকারি) সমন্বয় করা।

৪. আপদসংক্রান্ত বিভিন্ন গুজব থেকে যেন জনগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে না পড়ে সেজন্য

জনসাধারণকে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা।

৫. আপদের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগকালে সহায়তা প্রদানের জন্য আসা স্থানীয় এবং বাইরের সাহায্য-কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. আপদকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্রে এবং অন্যান্য স্থানে অবস্থানরতদের) নিশ্চিতকল্পে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭. আপদকালে মৃত ব্যক্তিদের দ্রুত সংকার এবং মৃত প্রাণীদের দ্রুত অপসারণের মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮. আপদকালে জনগণকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদসমূহ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন তেল, হারিকেন, দিয়াশলাই, জ্বালানি সামগ্রী, রেডিও ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে সহযোগিতা করা।

৯. দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন উপজেলা বা জেলা (জেলা সদরের পৌরসভার ক্ষেত্রে) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে পেশ করা।

আপদ-পরবর্তী সময়ে/পুনর্গঠন পর্যায়ে :

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও জেলা/উপজেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে আপদের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিসংক্রান্ত উপাত্ত চূড়ান্তভাবে যাচাই করে উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।

২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও জেলা/উপজেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালার অনুসরণে স্থানীয়ভাবে এবং সরকারি বা অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত পুনর্বাসন উপকরণাদি বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. প্রাপ্ত সম্পদ বিতরণের হিসাব জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করা।
৪. আপদ-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্র হতে ফেরা জনগণ যেন তাদের পূর্বস্থানে ফিরে যেতে পারে সেজন্য সার্বিক ব্যবস্থা নেয়া, এ ক্ষেত্রে পূর্বস্থান দখলজনিত কোনো আইনগত জটিলতা থাকলেও, আপদ-অব্যবহতি পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবারের পূর্বের জায়গায় ফিরে আসার ক্ষেত্রে যেন কোনোরূপ বাধার সম্মুখীন না হয় সেজন্য সার্বিক ব্যবস্থা নেয়া।
৫. আপদের ফলে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।
৬. আপদের ফলে আহত ব্যক্তির যেন যথোপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা পায় সেজন্য পৌরসভা পর্যায়ের স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া এবং প্রয়োজনে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সহযোগিতার জন্য সুপারিশ করা।
৭. আপদকালীন ও আপদ-পরবর্তী কাজের জন্য অর্জিত শিক্ষণগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কর্মশালার আয়োজন করা।

এ ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলি এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক আদেশ অনুসরণ করা।

স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন।

Union Disaster Management Committee

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কমিটির সভাপতি হিসেবে থাকবেন। স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে আরো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন। এই কমিটি প্রতি ২ মাস পরপর সভায় মিলিত হবে। আপদকালীন সময়ে প্রত্যহ একবার এবং অবস্থার কিছু উন্নতি হলে প্রতি সপ্তাহে ২ বার সভায় মিলিত হবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সভাপতি

১. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/চেয়ারপার্সন

সদস্য

২. ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ
৩. শিক্ষক প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)
৪. ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ; বিশেষত স্বাস্থ্য কর্মীগণ
৫. দুস্থ মহিলা প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)
৬. ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি)

প্রতিনিধি (যদি থাকে)

৭. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি (যদি থাকে)
৮. এনজিও প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওর প্রতিনিধি)

সদস্য-সচিব

১৪. ইউনিয়ন পরিষদের সচিব

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব স্বাভাবিক সময়ে

- ব্যক্তিগতভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে ঝুঁকি হ্রাসকরণে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণের বিষয় সম্পর্কে যাতে স্থানীয় জনসাধারণ অবহিত হয় তা নিশ্চিতকরণ এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং বেঁচে থাকার উপায়গুলোর ব্যাপক প্রচার নিশ্চিতকরণ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে অবহিত করে নিয়মিত দুর্যোগবিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন।
- আসন্ন বিপদ-সংক্রান্ত সতর্কবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে বা দুর্যোগ সংঘটিত হলে স্থানীয় জনসাধারণ, ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সংস্থাসমূহ যাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাসংক্রান্ত পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জনসাধারণকে এই পর্যায়ে তাদের জানমাল রক্ষায় করণীয় সম্পর্কে অবহিতকরণ।
- প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কোন এলাকার

জনসাধারণ কোন নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্রে যাবে, তা নির্ধারণ এবং আশ্রয়কেন্দ্রের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে দায়িত্ব প্রদান।

- থানা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আশ্রয়কেন্দ্র/আশ্রয়স্থলসমূহের কাছে নির্ধারিত স্থান হতে পানি সরবরাহ এবং প্রয়োজনে অন্যান্য সেবা প্রদানের বিষয় নিশ্চিতকরণ।
- স্থানীয় উদ্ধারকার্য পরিকল্পনা, প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা, উপজেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের স্থানীয় ব্যবস্থা সংবলিত আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- থানা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ।

দুর্যোগকালে

- প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করে প্রাথমিক উদ্ধার কার্য পরিচালনা এবং নির্দেশিত হলে, অন্যদেরকে উদ্ধার কাজে সহযোগিতা প্রদান করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও উপজেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে দুর্যোগের ক্ষতিসংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত নীতিমালার অনুসরণে স্থানীয়ভাবে এবং অন্য কোনো উৎস বা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত

পুনর্বাসন উপকরণাদি বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- প্রাপ্ত সম্পদ বিতরণের হিসাব উপজেলা কর্তৃপক্ষ বা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করা।

এ ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলি এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক আদেশ অনুসরণ করা।

অন্যান্য কমিটি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে সার্বিক সমন্বয়ের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো-র মহাপরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত ৪টি কমিটির নাম ও কর্মপরিধি

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টস কার্যক্রম সমন্বয়কারী দল

- জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমিটিসমূহের ফোকাল পয়েন্টদের কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় প্রদান;
- দুর্যোগ প্রস্তুতি ও দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনা করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সে মোতাবেক সুপারিশমালা প্রণয়ন।

২. আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রচারের কৌশল নির্ধারণ এবং দ্রুত প্রচারের ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিটি

- দুর্যোগ-সংক্রান্ত প্রচার কার্যের লক্ষ্য, পদ্ধতি ও কৌশল উন্নয়ন, আবহাওয়া সংক্রান্ত সতর্ক বার্তা, সংকেত ইত্যাদি প্রচারের কৌশল নির্ধারণ এবং এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন।

- দুর্যোগ-সংক্রান্ত প্রচার বিশেষ করে আবহাওয়া সংক্রান্ত সতর্কবার্তা ও সংকেত প্রচারের ক্ষেত্রে গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের সুপারিশ প্রণয়ন ও দ্রুত প্রচারের ব্যবস্থাকরণ।

৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয় সংক্রান্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ এবং গণসচেতনতা বিষয়ক টাস্ক ফোর্স

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এই কমিটি পরামর্শ দাতা হিসেবে কাজ করবে;

- দুর্যোগ-সংক্রান্ত গণসচেতনতা তৈরিতে জাতীয় পর্যায়ে এই কমিটি সহায়তা প্রদান করবে;

৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সার্বিক সমন্বয়ের স্বার্থে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট NGO সমূহের সমন্বয় কমিটি

- দুর্যোগের ত্রাণ কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয়ের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ত্রাণ সহায়তা সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন;
- দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্যাবলি প্রচার ও দুর্যোগ প্রতিরোধ বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরি নিশ্চিতকরণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যেকোনো সমন্বয় ও সমস্যাবলি চিহ্নিত করা ও সে মোতাবেক সুপারিশমালা তৈরি।

DISASTER PREPAREDNESS

দুর্যোগ প্রস্তুতি



Preparedness প্রস্তুতি

প্রস্তুতি বলতে সেই সকল কাজের সমষ্টিকে বোঝায়, যা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাসে সহায়ক হয়। এ ধরনের কার্যক্রম দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান দুর্যোগের পূর্বেই গ্রহণ করে থাকে। প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের মধ্যে আগাম সতর্কীকরণ, উদ্ধার ও স্থানান্তর পরিকল্পনা, সম্পদ সমাবেশ ও সংরক্ষণ, পারিবারিক প্রস্তুতি, সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, দুর্যোগ প্রস্তুতি মহড়া, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

Disaster Preparedness দুর্যোগ প্রস্তুতি

দুর্যোগ ঘটার পূর্বেই দুর্যোগের আশঙ্কা করে অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষ পদক্ষেপ ও

কর্মসূচি গ্রহণ করাকে দুর্যোগ প্রস্তুতি বোঝায়। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, দুর্যোগ প্রস্তুতি হচ্ছে এমন কিছু পদক্ষেপ/কর্মসূচি/কাজ যেখানে কোনো দুর্ঘটনার ভয়াবহতা সচেতনভাবে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে মানসিক, শারীরিক, সাংগঠনিক, আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে সতর্কতার সঙ্গে তৈরি থাকা। দুর্যোগ প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ দুইটি অংশ- প্রথমত, পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয়ত, প্রস্তুত থাকা। যেকোনো দুর্যোগে জীবন রক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যেই এই পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। সাধারণত পরিকল্পনা হচ্ছে সম্পদ ও সময়ের সঠিক ব্যবহার। দুর্যোগের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। শুধু তফাৎ এই যে এখানে শিথিলতা কম। কারণ আমাদের সম্পদ সীমিত আর সময় অল্প। প্রস্তুতি হচ্ছে এমন কিছু করণীয়, যা দুর্যোগ আসার পূর্বেই করতে হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি বা পরিবার তার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। তার সেই প্রস্তুতিকে বেগবান এবং চালু রাখতে সহায়তা করে সংগঠন। যে সমস্ত বিষয়ে ব্যক্তি বা পরিবারের পক্ষে প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয় না, সে সমস্ত ক্ষেত্রে সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুতির চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তি, পরিবার ও সংগঠন পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক।

ভৌগোলিক অবস্থান এবং অন্যান্য কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা অত্যন্ত বিপদাপন্ন। প্রায় প্রতিবছরই এ দেশে কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটছেই। যেহেতু অধিকাংশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, তাই শুধুমাত্র সম্ভাব্য দুর্যোগের

কথা বিবেচনা করে পূর্ব হতেই বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা যায়। দুর্যোগ প্রস্তুতির মাধ্যমে মানুষের দুর্যোগ সহনশীলতা এবং ক্ষয়ক্ষতি বা ঝুঁকি প্রতিরোধের ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনায় যেসব বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখতে হয় তা হলো : দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ (অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে), দুর্যোগ সম্পর্কে সতর্কীকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, অনুসন্ধান, উদ্ধার এবং ব্যবস্থা, জীবন রক্ষা ও কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা, জরুরি ওষুধ ও খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা, অস্থায়ী আশ্রয়স্থল ও এর ব্যবস্থাপনা, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা। দুর্যোগের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সম্ভাব্য দুর্যোগের বিভিন্ন বিষয় বা দিক বিবেচনা করা হয়। প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো—কখন দুর্যোগ হতে পারে, দুর্যোগ কোথায় আঘাত হানতে পারে, কী ধরনের দুর্যোগ কী ধরনের আঘাত হানতে পারে, সে আঘাতের প্রচণ্ডতা কী হবে, কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, ফলাফল কী হতে পারে, কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে করণীয় কী, প্রস্তুতির সময়কাল কী, বা কখন প্রস্তুতির প্রয়োজন, কে বা কারা প্রস্তুতি নেবে (ব্যক্তি/সমাজ/সংগঠন), প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচিতে কারা অংশ নেবে, ক্ষতিগ্রস্তদের কী ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন হতে পারে, স্থানীয়ভাবে কী সাহায্য-সহযোগিতা দেয়া যাবে, বাইরের কী সাহায্য-সহযোগিতা

দরকার হতে পারে, সাংগঠনিক কী সহায়তা দেয়া যেতে পারে, সাংগঠনিক তৎপরতায় জনগণ কীভাবে অংশ নিতে পারে প্রভৃতি। দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে করণীয় কাজগুলো নিম্নরূপ :

Disaster Preparedness at Personal Level

ব্যক্তি পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি

দুর্যোগ প্রস্তুতিতে ব্যক্তি পর্যায়ে বিভিন্ন করণীয় কাজ করা দরকার, সেগুলো হলো : দুর্যোগ, দুর্যোগের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে জানা; ঘরবাড়ি মজবুত, নিরাপদ করা; দুর্যোগ ঋতুতে কিছু জরুরি সামগ্রী যেমন—শুকনা খাবার, কাপড়, ঔষধ, ম্যাচ, কেরোসিন, জ্বালানি ইত্যাদি সংগ্রহে রাখা এবং এসব দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহের উৎস জানা; কিছু অর্থ সঞ্চয় করে রাখা; দা-রশি সংগ্রহে রাখা; বাড়ির আশপাশে গাছ লাগানো; ভিন্ন প্রজাতির শস্যের আবাদ রাখা; মানুষ ও গৃহপালিত পশুপাখির জন্য নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করা; সচেতন হওয়া; সংগঠিত হওয়া; আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা;

Disaster Preparedness at Family Level

পারিবারিক পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি

দুর্যোগ প্রস্তুতিতে পারিবারিক পর্যায়ে যেসব কাজ করা দরকার সেগুলো হলো : বাড়িতে নিয়মিত আবহাওয়া বার্তা শোনার জন্য বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে রেডিও সংগ্রহ করা এবং অতিরিক্ত ব্যাটারি ঘরে মজুত রাখা; বাড়িতে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান

চিহ্নিত করে রাখা, যেখানে জরুরি খাদ্য, খাবার পানি, দিয়াশলাই বাস্র, মোমবাতি ইত্যাদি মাটির নিচে পুঁতে রাখা; সাঁতার কাটা এবং গাছে ওঠার কৌশলাদি ভালোভাবে আয়ত্ত করা; প্রয়োজনে মুহূর্তে অতি সহজে ভেজা গাছে ওঠার জন্য দড়ির মই বানিয়ে রাখা; লাইফ জ্যাকেট, গাড়ির পুরোনো টায়ার ও বায়ুভর্তি টিউব, প্লাস্টিকের কনটেইনার ইত্যাদি বাড়িতে সংরক্ষণ করা; ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাতে ঘরের নিরাপদ স্থানগুলো চিহ্নিত করে সে সম্পর্কে সকলকে, বিশেষত শিশুদের জানিয়ে রাখা (যেমন ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে ভারি ও মজবুত টেবিলের নিচে, দুই রুমের মধ্যবর্তী দেয়ালের পাশে, দরজা বা সিঁড়িঘরের বিমের নিচে আশ্রয় নেয়া, জানালা বা কাচের জিনিসপত্র থেকে দূরে থাকা);

Disaster Preparedness at Social Level

সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি

দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম হিসেবে সামাজিক পর্যায়ে কতগুলো কাজ করা হয়ে থাকে। যেমন : আগাম সংবাদ জানা, সতর্ক থাকা ও প্রচার করা; বিপদ বিশ্লেষণ; কমিটি গঠন; উদ্বুদ্ধ করা; প্রশিক্ষণ দেয়া ইত্যাদি।

Disaster Preparedness at Organizational Level

সংগঠন পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি

সংগঠন পর্যায়ে করণীয় কাজগুলো হলো—সুস্থ শারীরিক যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী নির্বাচন;

দুর্যোগ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান; দুর্যোগে কাজ করার মানসিকতা তৈরি; কমিটি তৈরি ও দায়িত্ব বন্টন; অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ; দুর্যোগ সতর্কীকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা; অনুসন্ধান, উদ্ধার ও স্থানান্তর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; জীবনরক্ষা ও কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করা; ওষুধ ও খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা করা; অস্থায়ী আশ্রয়স্থল ও তার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া; পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

Disaster Preparedness at Institutional Level

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রস্তুতি

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে করণীয় কাজগুলো হলো—সংগঠনে দুর্যোগ সেল তৈরি; তহবিল সৃষ্টি (ফান্ড গঠন); পরিকল্পনা প্রণয়ন; কর্মী নিয়োগ; দুর্যোগ কর্মসূচি ও উন্নয়ন কর্মসূচি সমন্বিতকরণ;

এ ছাড়াও তৎপরতামূলকভাবে যে কাজগুলো করতে হয়, তা হলো : স্থানীয় সম্পদের উৎস চিহ্নিত করা; সম্পদশালী ও দাতা মানুষ, দক্ষ ব্যক্তি/স্বেচ্ছাসেবক, স্থানীয় সম্পদ, পানির উৎস, গৃহনির্মাণ-সামগ্রী চিহ্নিত ও প্রস্তুত রাখা; তৎপরতার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও ত্রাণ তৎপরতার প্রস্তুতি; ত্রাণ তৎপরতার সরঞ্জামের উৎস চিহ্নিতকরণ; কিছু দ্রব্য ও সরঞ্জাম সংগ্রহ ও মজুত; সম্ভব হলে সমগ্র কর্মকাণ্ড মাঝে মাঝে মহড়া দেয়া; সমস্ত প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা।

DROUGHT খরা



Drought খরা

খরা একটি মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দীর্ঘকালীন শুষ্ক আবহাওয়া ও অপরিপূর্ণ বৃষ্টিপাতের কারণে খরা অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদনের পরিমাণ বৃষ্টিপাতের চাইতে বেশি হলেই এমনটি ঘটে। জনসংখ্যার চাপে বাছবিচারবিহীন উন্নয়ন প্রক্রিয়া, বৃক্ষনিধন এবং বায়ুদূষণের ফলে বায়ুমণ্ডল ক্রমশ রক্ষ ও শুষ্ক হয়ে উঠছে। এতে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে গেছে, যা খরার মূল কারণ। ব্রিটিশ আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিসরে ধারাবাহিকভাবে বৃষ্টিপাত-শূন্যতাকে খরার মানদণ্ড হিসেবে ধরেন।

সাম্প্রতিককালে একজন স্পরসোর বিজ্ঞানী বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার জন্য দায়ী করেছেন পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের মেরু অঞ্চলে সৃষ্ট এলনিনোকে (See. El-Nion)। উত্তরাঞ্চলীয় জেলাসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মোটামুটি প্রতি দুই বছর পরপর খরা দ্বারা আক্রান্ত হয়। এজন্য আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা উত্তরাঞ্চলে মরু প্রক্রিয়া বিস্তারের আশঙ্কা করছেন। খরাপিড়িত অঞ্চল তপ্ত হয়ে ওঠে এবং কুয়া, খাল, বিল শুকিয়ে যাওয়ায় ব্যবহার্য পানির অভাব ঘটে। নদীপ্রবাহ হ্রাস পায়, ভূগর্ভস্থ জলস্তর নিচে নেমে যায় ও মাটির আর্দ্রতায় ঘাটতি দেখা দেয়, ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে শস্য বিপর্যয় ঘটে এবং গবাদিপশুর খাদ্যসংকট দেখা দেয়। খাবার পানি, চাষাবাদ ও পশুপালনের ক্ষেত্রে সরাসরি বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য খরা একটি বড় সমস্যা।

Causes of Drought খরার কারণসমূহ

খরার জন্য যে কারণগুলো চিহ্নিত করা হয় তা হলো : দীর্ঘদিন ধরে একটানা বৃষ্টি না হওয়া বা অনাবৃষ্টি পরিস্থিতি থাকা, বৈশাখ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত অন্তত একটানা দুই সপ্তাহ বৃষ্টি না হওয়া, আশ্বিন মাসের মধ্যেই মৌসুমি বৃষ্টিপাত অস্বাভাবিকভাবে শেষ হয়ে যাওয়া, পৌষ-মাঘ মাসে খুব সামান্য বৃষ্টিপাত কিংবা বৃষ্টিহীন থাকা, গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ পানির যথেষ্ট উত্তোলনের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি।

যেমন, উজান থেকে পানি প্রত্যাহার, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, পানি সংরক্ষণের অভাব, ওজোন স্তরের ক্ষয়, বৃক্ষনিধন প্রভৃতি।

বায়ুমণ্ডলীয় খরা : কোনো স্থানে/অঞ্চলে চাহিদার চেয়ে যথেষ্ট কম পরিমাণে বৃষ্টিপাত হলে যে খরার সৃষ্টি হয় তাকে বায়ুমণ্ডলীয় খরা বলে।

জলমণ্ডলীয় খরা : বর্ণার প্রবাহ বন্ধ, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিম্নগামী, জলাধার, নদ-নদী ইত্যাদিতে পানি শুকিয়ে গেলে যে খরার সৃষ্টি হয় তাকে জলমণ্ডলীয় খরা বলে।

কৃষি খরা : ঋতুভেদে শস্য জন্মানোর জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতার অভাব, অপরিপূর্ণ বৃষ্টির জন্য এ ধরনের খরা হয়ে থাকে।

দীর্ঘস্থায়ী খরা : সাধারণত মরু অঞ্চলীয় খরাকে দীর্ঘস্থায়ী খরা বলা হয়।

মৌসুমি খরা : যেসব এলাকায় গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় কম বৃষ্টিপাত হয়, ফলে সেচের জন্য কৃষিকাজ ব্যাহত হয়, এ অবস্থাকেই বলা হয়েছে মৌসুমি খরা।

মহাদেশীয় খরা : অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও অসম বৃষ্টিপাতহীনতার জন্য উদ্ভব হয়।

অদৃশ্যমান খরা : যখন উদ্ভিদের জন্য পর্যাপ্ত পানি সরবরাহে জলীয় বাষ্প ব্যর্থ হয়। এ জাতীয় খরা যেকোনো সময় হয়ে থাকে। খরার প্রতিক্রিয়া বহুমুখী। খরা খাদ্য সংকট থেকে শুরু করে সামাজিক পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে তোলে। খরার প্রভাবে সংঘটিত প্রতিক্রিয়ার কিছু হলো : খাদ্য সংকট, পানি সংকট, অসহনীয় পরিবেশ,

কৃষি উৎপাদন ব্যাহত, কৃষিজমির ক্ষতি, পশু খাদ্যের অভাব, সামাজিক অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে শিক্ষা প্রসারের স্বাভাবিক গতি হ্রাস, বেকারত্ব বৃদ্ধি ও কর্ম উদ্দীপনা হ্রাস, কৃষিভিত্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন হ্রাস, পুষ্টিহীনতা, বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি।

এ ছাড়াও অসহ্য গরমে দেখা যায় ভাইরাস জ্বর। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ডায়রিয়া, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয়, ফোকা পড়াহান নানা ধরনের অ্যালার্জিক রোগ। যাদের উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস আছে তাদের মধ্যে বেশি মাত্রায় ‘হিট স্ট্রোকের’ আশঙ্কা দেখা দেয় অথবা অজ্ঞান হয়ে পড়ার ভয় থাকে। এ সময় গাছ, হাঁস-মুরগি ও পশুপাখির ব্যাপক মড়কও দেখা দেয়।

Mitigation Measures প্রশমন পদক্ষেপসমূহ

খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের পক্ষে প্রতিরোধ করা কঠিন। তবে সময়মতো পদক্ষেপ নিলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কমানো সম্ভব। এজন্য দরকার পানির সৃষ্টি ব্যবস্থাপনা তথা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষণ ও উত্তোলন কমানো, মৌসুমি পানি সংরক্ষণ, শিল্প/কারখানায় পানি পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার। বাষ্পীয়করণের গতি মন্থর ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। দেশের খরাপ্রবণ অঞ্চল চিহ্নিত করে সেই অনুসারে ফসলের চাষ করা এবং কৃষকদের সচেতন করা। খরার পূর্বাভাস দেয়া ও জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তা মোকাবিলার পরিকল্পনা নেয়া। জনসাধারণকে পানির

যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে সজাগ করা এবং কৃত্রিম উপায়ে মাটির পানি ধারণক্ষমতা বাড়ানো। প্রয়োজনমতো ফসলের ধরন পরিবর্তন করা। প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল করা। এ ছাড়াও বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাটির নিচে গোখাদ্য সংরক্ষণ করা, যাতে খরার সময় গরু-মহিষকে খাবার দেয়া সম্ভব হয়। খরাগ্রবণ এলাকায় মাটিতে গভীর করে চাষ দেয়া, এতে নিচের ভেজা মাটি ওপরে উঠে শুকনো মাটিতে আর্দ্রতা বাড়তে পারে।

Drought Prone Areas in Bangladesh

বাংলাদেশে খরাগ্রবণ এলাকাসমূহ

খরার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা :

- উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল : বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া ও রাজশাহী এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।
- উত্তর-পূর্বাঞ্চল : বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর ও ঢাকা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।
- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল : বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।
- দক্ষিণ কেন্দ্রীয়াঞ্চল : বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।
- দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল : বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

EARTHQUAKE ভূমিকম্প



Earthquake ভূমিকম্প

ভূ-আলোড়নের ফলে ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো অংশে আকস্মিক কম্পনের সৃষ্টি হলে তাকে Earthquake বা ভূমিকম্প বলে। ভূ-অভ্যন্তরস্থ শিলার স্থিতিস্থাপক ভারসাম্য নষ্ট হলে ভূত্বকের বিচ্যুতির মাধ্যমে নিঃসরিত স্থিতি বিনষ্টকারী শক্তির দ্বারা এই কম্পনের উৎপত্তি হয়। এরূপ কম্পন প্রচণ্ড, মাঝারি বা মৃদু আকারের হতে পারে। পৃথিবীতে গড়ে বছরে প্রায় ছয় হাজার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। অবশ্য এর বেশিরভাগই মৃদু আকারের হয় বিধায় সাধারণভাবে তা অনুভূত হয় না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, একটি মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প থেকে যে শক্তি নির্গত হয় তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমায় যে প্রথম পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল তার প্রায় ১০ হাজার গুণ

বেশি। ভূমিকম্প বিশারদ ও ভূ-বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের বিভিন্ন উৎস বা কারণ নির্ধারণ করেছেন। তার মধ্যে নিম্নোক্তগুলো প্রধান :
ক. টেকটোনিক প্লেটের বিচলন ও পারস্পরিক ক্রিয়াজনিত অকস্মাৎ আন্দোলন বা টেকটোনিক ভূমিকম্প
খ. অগ্ন্যুৎপাত বা আগ্নেয়গিরিজনিত ভূমিকম্প

গ. মানব কর্মকাণ্ডঘটিত ভূমিকম্প
পৃথিবীর বেশিরভাগ ভূমিকম্প ভূখণ্ডীয় আন্দোলন (Plate Tectonic)-এর সাথে জড়িত। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় উর্ধ্বমুখী উত্তপ্ত লাভা ও শিলারশির চাপে নিকটবর্তী স্থানে ভূমিকম্প হয়। আবার অনেক সময় ভূ-অভ্যন্তরে মানুষের ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিস্ফোরণ ঘটানোও ভূমিকম্পের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ভূগর্ভস্থ যে স্থান থেকে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাকে এর কেন্দ্র বলে। ভূকম্পন কেন্দ্র সাধারণত ভূত্বকের ৬ থেকে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করে। কেন্দ্র থেকে লম্বালম্বি ভূত্বকের উপরিস্থ বিন্দুকে উপকেন্দ্র (Epicenter) বলে। ভূমিকম্পের স্পন্দন উৎস থেকে তরঙ্গের ন্যায় চারিদিকে প্রসারিত হয়। Seismograph (সাইসমে-গ্রাফ) বা ভূ-কম্পনলিখন যন্ত্রের সাহায্যে এরূপ তরঙ্গ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ভূমিকম্পের মাত্রা দুভাবে নির্ধারণ করা হয়, যথা :

১. Magnitude তীব্রতা

ভূমিকম্পের তীব্রতা সাধারণত রিখটার স্কেলে মাপা হয় (১-১০)। কোনো কোনো ভূকম্পন বিশারদ ৮ ও ততোধিক স্কেলের ভূমিকম্পকে

অত্যন্ত ভয়াবহ (Great), ৭-৭.৯-কে মেজর (Major) এবং ৬-৬.৯ স্কেলের ভূমিকম্পকে ব্যাপক (Large) বলে অভিহিত করে থাকেন। ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার সময়ই ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয়। উল্লেখ্য যে, রিখটার স্কেলের মাত্রা ১ বৃদ্ধি পেলে ভূকম্পনের শক্তি ৩১.৬-এর অধিক গুণ বেড়ে যায়।

২. Intensity ব্যাপকতা

ভূমিকম্পের ব্যাপকতা সাধারণত সংশোধিত মার্কেলি স্কেলে মাপা হয় ও রোমান সংখ্যায় প্রকাশ করা হয় (I থেকে XII পর্যন্ত)। Intensity ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা নির্দেশ করে এবং ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার পর তা মাপা হয়। প্রচণ্ডতার দিকে লক্ষ্য রেখে ভূমিকম্পের ব্যাপকতাকে Violent বা ভয়াবহ, Severe বা প্রচণ্ড, Moderate বা মাঝারি, Mild বা মৃদু ইত্যাদিতে আখ্যায়িত করা হয়।

Fault চ্যুতি

ভূ-আন্দোলনের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের কোনো লাইন বরাবর একটি শিলাস্তর থেকে পার্শ্ববর্তী শিলাস্তরের স্থানচ্যুতি ঘটলে তাকে চ্যুতি বলে। ভূ-আন্দোলনের দিক অনুযায়ী উলম্ব বা আনুভূমিক দুভাবে চ্যুতি সংঘটিত হতে পারে।

Fault Plane চ্যুতি তল

যে ভিত্তিভূমি বা রেখা হতে চ্যুতি সৃষ্টি হয়, তাকে চ্যুতি তল বলে।

Richter Scale রিখটার স্কেল

এটি ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপক স্কেল বা মাপনী। ১৯৩৫ সালে ভূ-বিজ্ঞানী C. K. F. Richter এই স্কেলের প্রবর্তন করেন। এটি ১২টি এককবিশিষ্ট এবং প্রতিটি এককে নির্দিষ্ট মাত্রার ভূমিকম্প এবং এর ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতার সম্ভাব্য অবস্থা বর্ণনা করা আছে। এই স্কেলে প্রথম এককের মান হলো ১-৩ এবং ১২তম বা সর্বোচ্চ মাত্রার ভূমিকম্পের মান হলো ৮.২ থেকে ১০। রিখটার স্কেলের ১০ হলো প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প বা সর্বোচ্চ তীব্রতাসম্পন্ন ভূমিকম্প।

Focal Depth কেন্দ্রীয় গভীরতা

কেন্দ্রীয় গভীরতা বলতে ভূমিকম্পের উৎসকেন্দ্রের গভীরতাকে বোঝায়।

Epicenter উপকেন্দ্র

ভূ-অভ্যন্তরে ভূকম্পন উৎস কেন্দ্রের লম্বালম্বি উপরে ভূপৃষ্ঠের ছেদ বিন্দুকে উপকেন্দ্র বলে। ভূপৃষ্ঠের এই স্থানে কম্পনের বেগ সর্বাপেক্ষা বেশি অনুভূত হয়।

Seismograph

এটি একটি মাপনী যন্ত্র, যার সাহায্যে ভূকম্পনের তরঙ্গগুলোর গতি ও প্রকৃতি গৃহীত হয়। এভাবে ভূকম্পলেখ সংগৃহীত বিভিন্ন প্রকার তরঙ্গের গতিবিধির পারস্পরিক বিশ্লেষণ করে ভূকম্পনের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়। অত্যাধুনিক সূক্ষ্ম ভূকম্পলেখের মাধ্যমে হাজার মাইল দূরে অনুষ্ঠিত মৃদু ভূকম্পনের স্পন্দনও ধরা পড়ে।

Seismogram সিসমোগ্রাম

সিসমোগ্রাফে ধারণকৃত রেকর্ডকে সিসমোগ্রাম বলা হয়। ভূমিকম্পের অবস্থান ও তীব্রতা নির্ণয়ে এই সিসমোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। সিসমোগ্রাম প্রকৃতপক্ষে সিসমোমিটার নামক সিসমোগ্রাফের একটি চলনশীল অভ্যন্তরীণ অংশের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।

Seismic Wave ভূকম্পন ঢেউ

ভূকম্পন ঢেউ সাধারণত কোনো একটি ভূমিকম্প বা বিস্ফোরণের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এগুলো ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বা ভূ-অভ্যন্তরে বিচরণ করে।

Seismicity

ভূমিকম্পসমূহের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বণ্টনকে সিসমিসিটি বলে।

Seismic Point ভূকম্পন কেন্দ্র

ভূ-অভ্যন্তরে যে উৎস থেকে ভূমিকম্পের সূত্রপাত হয় তাকে ভূকম্পন কেন্দ্র বলে। এই কেন্দ্র হতে কম্পন তরঙ্গাকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে অনুমান করা হচ্ছে যে, ভূমিকম্প কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে নয়, বরং একটি রেখা বরাবরে সূত্রপাত হয়ে থাকে।

Mainshock মূল অভিঘাত

যখন স্বল্প ফোকাল গভীরতাবিশিষ্ট বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প সীমিত সময়ের ও স্থানে মধ্যে ক্রমানুসারে সংঘটিত হয় এবং এগুলোর মাঝে কোনো একটি যদি অন্যান্যগুলোর

তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়, তবে এই ভূমিকম্পটিকে মূল অভিঘাত বলা হয়। মূল ভূমিকম্পের পূর্বে সংঘটিত ভূমিকম্পগুলোকে অনুবর্তী-অভিঘাত নামে অভিহিত করা হয়। তবে, মূল অভিঘাত ছাড়া ক্রমানুসারে বেশ কয়েকটি ভূকম্পন সংঘটিত হলে, একে ভূমিকম্প পুঞ্জ বলা হয়।

Earthquake Hazard ভূকম্পনীয় আপদ

ভূমিকম্পের কারণে যে আনুষঙ্গিক আপদসমূহ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাকে ভূমিকম্পীয় আপদ বলা হয়। এসব আপদ মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। যথা : সুনামি, ভূমিধস, লিকুই-ফ্যাকশন প্রভৃতি।

Plate Tectonic প্লেট টেকটোনিক

ভূতাত্ত্বিক মতবাদ অনুসারে ভূত্বক প্রধানত সাতটি বড় ও কয়েকটি ক্ষুদ্র গতিশীল কঠিন প্লেট দ্বারা গঠিত, যেগুলি নিম্নস্থ ড্রাম্যামাণ উষ্ণ গুরুমণ্ডলীয় পদার্থের ওপর ভাসছে। প্লেটের বিচলন (Movement) ও পারস্পরিক ক্রিয়া ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, পর্বত সৃষ্টি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ভূতাত্ত্বিক ঘটনাবলীর নিয়ন্ত্রক বলে ধারণা করা হয়। তিন ধরনের পারস্পরিক প্লেট সীমানার কথা জানা যায় যথা : সমকেন্দ্রাভিমুখী সীমা (Convergent plate boundary), অপসারী সীমা (Divergent plate boundary) এবং পরিবর্তন চ্যুতি সীমা (Transverse plate boundary)।

সমকেন্দ্রাভিমুখী সীমা- যখন একে অপরের দিকে অগ্রসরমান দুটি প্লেট কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে অবশেষে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন একটি প্লেট

অপরটির নিচে চাপা পড়ে। এই ধরনের প্লেট সংঘর্ষের ফলে পর্বতমালার সৃষ্টি হয় এবং প্লেট প্রান্তিকের আশপাশে আগ্নেয়গিরির কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়।

অপসারী সীমা- এই ক্ষেত্রে দুটি প্লেট একে অপরের থেকে সরে যেতে থাকে। এই ধরনের প্লেট সীমানার ফলে নতুন সমুদ্র তলদেশের এবং সামুদ্রিক আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়।

পরিবর্তন চ্যুতি সীমা- যখন দুটি প্লেট একে অপরকে অতিক্রম করে যায়, তখন তাকে পরিবর্তন চ্যুতি সীমা বলে। তিন ধরনের প্লেট বিচলনেই ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

বঙ্গীয় অববাহিকার অধিকাংশই পড়েছে বাংলাদেশে। যা ভারতীয় প্লেট ও এশীয় প্লেটের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে উৎপত্তি হয়েছে। ক্রিটেসিয়াস যুগের পূর্বে (সাড়ে বারো কোটি বছর পূর্বে) বাংলাদেশের অংশবিশেষসহ (বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চল) ভারতীয় প্লেট, অ্যান্টার্কটিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে গভোয়ানালায়ড নামে একটি বৃহৎ মহাদেশ গড়ে তোলে। বাংলাদেশের অবশিষ্টাংশের তখন অস্তিত্ব ছিল না। অতঃপর গভোয়ানালায়ডের ভাঙ্গনের ফলে ভারতীয় প্লেটের উত্তরমুখী সঞ্চরণ ও সর্বশেষ এশীয় প্লেটের সঙ্গে এর সংঘর্ষের ফলে হিমালয় পর্বতমালা ও বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর সমভূমির সৃষ্টি হয়। ভারতীয় প্লেট ও এশীয় প্লেটের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক সংঘর্ষ ইয়োসিন যুগে (৫ কোটি থেকে সাড়ে ৫ কোটি বছর পূর্বে) হিমালয়ের প্রারম্ভিক উত্থানের সময় প্রথম সংঘটিত হয়। নবীন ইয়োসিন যুগে (সাড়ে তিন কোটি থেকে ৪ কোটি বছর পূর্বে) ভারতীয় প্লেট ও এশীয় প্লেটের মধ্যবর্তী টেথিস সাগরের সর্বশেষ চিহ্ন বিলীন হয়ে যায়। এই সময়েই ভারতীয় প্লেটের অভিসরণ

দিক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষসহ উত্তর থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ওলিগোসিন যুগ থেকে (সোড়ে তিন কোটি বছর পূর্বে) প্লেট সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে এবং বিশাল নদীমালার জলরাশিতে দক্ষিণে আদি বঙ্গীয় অববাহিকা ভরে উঠলে উত্থিত হিমালয়ের অবক্ষেপণ নেমে আসতে শুরু করে। মায়োসিন পরবর্তী সময় থেকে (আড়াই কোটি বছর তৎপরবর্তী) অববাহিকায় দ্রুত অবনমনের সঙ্গে হিমালয় পর্বতমালার দ্রুত উত্থানের ফলে বিপুল অবক্ষেপণ স্তূপের পাশাপাশি বৃহদাকৃতির বদ্বীপ গড়ে ওঠে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ নামের এই সুবৃহৎ বদ্বীপের গঠন প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত রয়েছে। এদিকে ভারতীয় প্লেটের এশীয় প্লেটের নিচে অধোগমন হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলে একটি সন্ধি রেখা অঞ্চল সৃষ্টি করেছে আর পূর্বে ইন্দো-বার্মার পর্বতসারি পূর্বাঞ্চলীয় প্লেট সংঘর্ষের অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। এশীয় প্লেটের সঙ্গে ভারতীয় প্লেটের সংঘর্ষ আজও অব্যাহত আছে। মাঝে মাঝেই প্লেট-সংলগ্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প উপরোক্ত কথাই প্রমাণ করে।

Earthquake Related Disasters

ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগসমূহ

ভূমিকম্পে কেবল ভূমির ঝাঁকুনিই নয়, বরং এর সঙ্গে আরও নানা রকম আনুষঙ্গিক অবস্থা বা ঘটনা জড়িত থাকে। যেমন, ভূকম্পীয় কম্পন, চ্যুতি সৃষ্টি, সুনামি, ভূমিধস ও লিকুইফ্যাকশন ইত্যাদি। ভূ-চৌম্বকত্ব, ভূগর্ভস্থ পানির তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা ইত্যাদিতে তারতম্য বা বৈচিত্র্য ভূ-পদার্থবিদদের নিকট গভীর আগ্রহের বিষয়। ভূমিকম্পজনিত কম্পনকে যদি মুখ্য

ভূকম্পীয় দুর্যোগ বলে গণ্য করা হয়, তবে উল্লিখিত অন্য দুর্যোগগুলোকে আনুষঙ্গিক বা সহপার্শ্বিক দুর্যোগ হিসেবে অভিহিত করা যায়। কেননা উল্লেখিত আনুষঙ্গিক দুর্যোগগুলোর বেশিরভাগই ভূমিকম্পজনিত ভূ-স্পন্দনের ফলাফল। সহপার্শ্বিক দুর্যোগের ফলে গুরুতর এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হতে পারে, এমনকি তা মূল ভূকম্পনজনিত ক্ষয়ক্ষতির সমান বা বেশি হতে পারে।

ভূকম্পীয় ধ্বংসাত্মক শক্তি উৎসকেন্দ্র থেকে চতুষ্পার্শ্বে ভূমির একটি সীমিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, যাকে ফোকাস অঞ্চল বলা হয়। ভূমিকম্প যত বড় হয় ফোকাস অঞ্চলের ব্যাপ্তিও তত বড় হয়।

Seismic Zone

ভূকম্পন বলয়

ভূমিকম্প সংঘটনের ঐতিহাসিক উপাত্তের ভিত্তিতে কোনো অঞ্চলের ভূকম্পন প্রবণতা প্রকাশ হচ্ছে ভূকম্পন বলয়। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে ঐ অঞ্চলে আরও ভূ-কম্পন সংঘটিত হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। একটি অঞ্চলের অতীত ভূকম্পন আচরণ নির্ণয় এবং ভবিষ্যৎ প্রবণতা নির্ণয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সংঘটিত মৃদু ও বৃহৎ উভয় মাত্রার ভূ-কম্পনের সময়গত (Temporal) ও পরিসারিক বন্টনের রীতিবদ্ধ বর্ণনা অত্যাৱশ্যক।

Earthquakeprone Regions

ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাসমূহ

ভূমিকম্প পৃথিবীর সর্বত্র হয় না বরং একটি বলয় জুড়ে হয়ে থাকে। এই বলয়টি দি সারকাম-প্যাসিফিক বেল্ট বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয় ও ভূমধ্যসাগর-হিমালয় ভূকম্পীয় বলয় নামে পরিচিত। বলয়টি দক্ষিণ

আমেরিকার চিলি থেকে আরম্ভ করে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল বরাবর গিয়ে জাপান ও মধ্য এশিয়ার মাঝে বরাবর ভূমধ্যসাগরের অ্যাজোর্স দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। হিমালয়, আল্পস, রকি প্রভৃতি পর্বতের পাদদেশে ও পর্বতের নিম্ন অংশে ভূমিকম্প অধিক অনুভূত হয়। জাপান, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের দুর্বল খাড়াই উপকূলভাগে (Steep Coastal Area) প্রায়শ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ে, আসামের খাসিয়া, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আবার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় এবং আগ্নেয়গিরি বলয়ে নিয়মিত ভূমিকম্প হয়। যেসব পর্বত সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত হয়েছে সেগুলোর ভূভাগ অত্যন্ত দুর্বল। এসব অঞ্চলে, যেমন— হিমালয়ের পূর্বাংশের পাহাড়ি ও পশ্চিমাংশের পাকিস্তানের উত্তর পার্বত্য অঞ্চল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে এবং বঙ্গোপসাগরের তলদেশে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়।

বাংলাদেশে ভূমিকম্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহ

ক. অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা : সিডিএমপি'র সাম্প্রতিক তথ্যানুসন্ধান অনুযায়ী চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ এবং রংপুর জেলার ভূমিকম্পের জন্য অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা।

খ. মধ্যমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা : ঢাকা, টাঙ্গাইল, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা ও রাজশাহী জেলাকে মধ্যমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ. নিম্নমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা : উপকূলীয় জেলাসমূহ

Earthquake Risk in Bangladesh

ভূমিকম্পে বাংলাদেশের ঝুঁকি

বিশেষজ্ঞদের অভিমত বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ভূমিকম্প বলয়ে অবস্থিত। বাংলাদেশে ভূমিকম্প হয়ে থাকে টেকটনিক প্লেটের সংঘর্ষের কারণে। ভূস্তরের ভূমিকম্প-প্রবণ ইউরেশিয়া প্লেট, ইন্ডিয়ান প্লেট ও মায়ানমার সাবপ্লেটের মাঝখানে বাংলাদেশ অবস্থিত। ভূতাত্ত্বিকরা আরো জানাচ্ছেন চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, সিলেট, ত্রিপুরা ও আসাম অত্যন্ত ভয়াবহ ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে আছে, কেননা ইন্ডিয়ান প্লেট ও মায়ানমার সাবপ্লেটে পরস্পরের দিকে প্রতিবছর (১১-১৬) মিলিমিটার অগ্রসর হচ্ছে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে আসাম থেকে শুরু করে ঢাকার পাগলা পর্যন্ত রয়েছে লিনিয়ামেন্ট। (Lineament: A linear topographic feature, such as a line, aligned, or straight stream course, on the surface of a planet or moon. It may be positive (such as a range of mountains) or negative (such as a valley). এই লিনিয়ামেন্ট পূর্ব পশ্চিমে আসাম ডাউকি ডেঞ্জার ফল্টের সাথে সংযুক্ত। এই ডেঞ্জার ফল্ট লাইনে অবস্থান করছে বাংলাদেশের সিলেট জেলা।

Previous Record of Earthquake

ভূমিকম্পের অতীত ইতিহাস

বাংলাদেশে ও তার আশপাশ এলাকায় ঘটে যাওয়া কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্প- ২০০৩: বরকল উপজেলার কলারুড়িয়া

ইউনিয়ন। মাত্রা ছিল ৫.১। রাঙ্গামাটি জেলায় মারাত্মকভাবে অনুভূত হয়। এর ফলে ২ জন মারা যায় এবং ১০০ জন আহত হয়। প্রায় ৫০০ কাঁচা বাড়ি বিধ্বস্ত হয়।

১৯৯৯: মহেশখালী দ্বীপে মারাত্মকভাবে অনুভূত হয়। মাত্রা ছিল ৫.২।

১৯৯৭: চট্টগ্রামে অনুভূত হয়। মাত্রা ছিল ৬.০। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল সামান্য।

১৯৫০: আসাম আর্থকোয়েক। মাত্রা ছিল ৮.৪। তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

১৯৩৪: বিহার-নেপাল আর্থকোয়েক। মাত্রা ছিল ৮.৩। বৃহত্তর রংপুর জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়।

১৯৩০: ধুবরী আর্থকোয়েক। মাত্রা ছিল ৭.১। রংপুর জেলার পূর্বাংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯১৮: শ্রীমঙ্গল আর্থকোয়েক। মাত্রা ছিল ৭.৬। ঢাকাতে সামান্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

১৮৯৭: গ্রেট ইন্ডিয়া আর্থকোয়েক। মাত্রা ছিল ৮.৭। সিলেট জেলায় ইটের দালান বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে প্রায় ৫৪৫ জন নিহত হয় এবং সম্পদের ক্ষতি হয়।

১৮৮৯: সিলেট মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাত্রা ছিল ৭.৫।

১৮৮৫: বেঙ্গল আর্থকোয়েক। মাত্রা ছিল ৭.০।

১৭৪২: চট্টগ্রামের ১৫৫.৪০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। ঢাকায় ৫০০ জন প্রাণ হারায় এবং ২০০ জনের গবাদি পশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৫৪৮: প্রথম ভূমিকম্পের ঘটনা লিপিবদ্ধ

করা হয়। সিলেট এবং চট্টগ্রাম ভয়ানকভাবে প্রকম্পিত হয়।

তথ্যসূত্র: ইনসেপশন রিপোর্ট, এডিপিসি, (ভূমিকম্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণ, অ্যাডভোকেসী ও সচেতনতা বিষয়ক প্রকল্প, সিডিএমপি)

Urban Volunteer for Earthquake Management

সিডিএমপির সহযোগিতায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভূমিকম্প পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করছে।

ইতোমধ্যে এ তিনটি সিটি কর্পোরেশনে ৬০০ স্বেচ্ছাসেবক বাছাই করা হয়েছে। ২৫ জুলাই এ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে খাদ্য ও দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক জানিয়েছেন পরবর্তীতে সারাদেশে পর্যায়ক্রমে ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলা হবে।

EMERGENCY RESPONSE জরুরি সাড়া

Emergency Response জরুরি সাড়া

আপদের চিহ্নিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করতে আমরা সকল প্রচেষ্টা নেওয়ার পরও অনেক সময় দুর্ঘোণ এড়ানো সম্ভব হয় না।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সময়ে তা বিবেচনায় নিয়ে জরুরি অবস্থা মোকাবিলার কার্যকর প্রস্তুতি থাকা এবং দুর্ঘোণে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকর সহায়তা দেয়ার

জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা, জনগোষ্ঠী এবং ব্যবস্থাকে সচল রাখাই হলো দুর্ঘোণে জরুরি সাড়া।

জরুরি সাড়া ব্যবস্থা সক্রিয় রাখার পদক্ষেপসমূহ
পূর্বসতর্কতা
স্থানান্তর করা
অনুসন্ধান ও উদ্ধার করা
চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ
জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম
জরুরি চিকিৎসা সহায়তা
জরুরি পুনর্বাসন

সূত্র: সার্বিক দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ মডিউল নভেম্বর ২০০৬, প্রকাশক: COMP.

Early Warning পূর্বসতর্কতা

পূর্বসতর্কতা হলো যেকোনো দুর্ঘোণ আঘাত হানার পূর্বেই ব্যক্তি, বা জনগণের কাছে বার্তা প্রচার বা তথ্য প্রদান করা। পূর্বসতর্কতায় সাধারণত আপদসমূহ, ঝুঁকি, ঝুঁকির উপাদান, পরিবেশ, বিপদের অস্তিত্ব এবং বিপদ প্রতিরোধ, বিপদ এড়াতে অথবা ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কী করা যায় সে সম্বন্ধে তথ্য প্রচার করা হয়ে থাকে।

পূর্বসতর্কতা দুর্ঘোণ-ঝুঁকি-হ্রাসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা জীবনহানি প্রতিরোধ করে এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনে। একটি সঠিক ও কার্যকরী পূর্বসতর্কতা ব্যবস্থা চারটি ধারাবাহিক ধাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়:

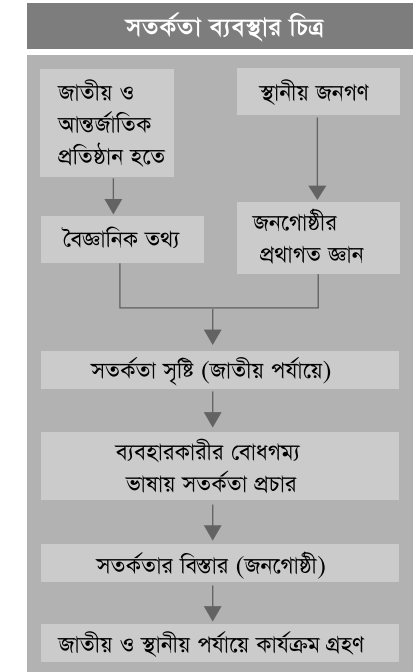
১. **ঝুঁকিসচেতনতা** : জনগোষ্ঠী সম্ভাব্য যে ঝুঁকিগুলো মোকাবিলা করে সে সম্পর্কে ভালো একটি ধারণা থাকা।
২. **পর্যবেক্ষণ ও সতর্কতা ব্যবস্থা** : এসব

ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বসতর্কতার জন্য দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৩. **যোগাযোগ** : সবার জন্য সহজে বোধগম্য সতর্কসংকেত ও প্রস্তুতির তথ্য প্রচার করা।
৪. **সাড়া দান সামর্থ্য** : জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকর সহায়তা প্রদানের সক্ষমতা।

উপরোক্ত ধাপগুলোর কোনো একটি সঠিকমতো সম্পন্ন না করলে পূর্বসতর্কতার পুরো শৃঙ্খলাই ভেঙে যেতে পারে।

পূর্বসতর্কতা যে নির্দেশনা দেয় তা হলো— কী করতে হবে, কেন করতে হবে, কখন করতে হবে, কীভাবে করতে হবে, কাকে করতে হবে, কোথায় করতে হবে।



Evacuation

স্থানান্তর করা

যারা জীবনের ঝুঁকিতে আছে তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়া গুরুত্বপূর্ণ। জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াই হলো স্থানান্তর করা। যখন আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা প্রচার করা হয়, তখন উপকূলীয় ও দ্বীপের জনগণকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তর করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রবল বন্যার সময় জনগণকে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা জরুরি।

Search and Rescure

অনুসন্ধান ও উদ্ধার করা

দুর্যোগে আটকে পড়া ও হারিয়ে যাওয়া মানুষদের অনুসন্ধান ও মুক্ত করা প্রয়োজন। যেমন, ভূমিকম্পের পর অনেক মানুষ ধসে পড়া ভবনের নিচে আটকে পড়ে বা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সময় হারিয়ে যাওয়া জনগণ নিরাপদ আশ্রয়ে আসতে সক্ষম হয় না, তখন তাদেরকে অনুসন্ধান ও উদ্ধার করার প্রয়োজন পড়ে।

Need and Loss Assessment

চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ

জরুরি সাড়ায় নিয়োজিত সংস্থাসমূহ জরুরি অবস্থা নিরূপণ করে থাকে এবং সাড়া কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে তাদের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। একটি জরুরি সাড়া কার্যক্রম পরিচালিত হয় পরিস্থিতি মূল্যায়ন, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, বিকল্প ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা এবং উদ্দেশ্য ও বিকল্পের ওপর ভিত্তি করে সাড়া বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে।

দুর্যোগ মূল্যায়ন একটি চলমান ও আবর্তনমূলক/ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়া হিসেবে

বিবেচিত হয়। পরিস্থিতি, তথ্য-প্রাপ্যতা এবং জরুরি চাহিদা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। দুর্যোগের ধরন, প্রাপ্ত সম্পদ এবং নির্দিষ্ট তথ্যের চাহিদার ওপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই মূল্যায়ন করা হয়। সাধারণত যত দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন হয় তত দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সাড়া প্রদানের ধরন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রাথমিক মূল্যায়ন দ্রুত ও খসড়া হতে পারে কিন্তু সময় এবং উপাত্ত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা চূড়ান্ত করা হয়। কার্যকর উদ্যোগ সব সময় নির্ভর করে দুর্গত এলাকায় কী পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান তার ওপর। এগুলোর অধিকাংশই একটি দুর্যোগের পরবর্তী ফলাফলের বিস্তারিত মূল্যায়নের জন্য। বাইরে থেকে বড় ধরনের সহায়তা পাওয়ার আগে স্থানীয় সম্পদ জানমাল রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে, ভূমিকম্পের অনুসন্ধান ও উদ্ধার এবং জরুরি চিকিৎসা সেবার জন্য সাড়া তাৎপর্যপূর্ণভাবে নির্ভর করে স্থানীয় সম্পদের ওপর।

Emergency Relief Activities

জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম

দুর্যোগে আক্রান্ত জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় দ্রব্য/উপকরণ (খাদ্য, বাসস্থান, পানি, পয়োনিষ্কাশন ইত্যাদি) পৌঁছানো জরুরি ত্রাণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। ত্রাণ সরবরাহ করার জন্য দুর্যোগের ধরন ও বিপদাপন্নতা চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, ত্রাণ বিতরণে গর্ভবতী মহিলাদের অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজনের বিষয়টি লক্ষ রাখা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে শিশু খাদ্যের পর্যাপ্ততার বিষয়টিও। সকল জনগণকে এক জায়গায়

জড়ো করার চেয়ে বৃদ্ধ প্রতিবন্ধী জনগণের মধ্যে অন্যভাবে ত্রাণ বিতরণ করা যায় কি না তা ভেবে দেখা। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাসমূহ নিয়ে একটি প্রকল্প কাজ সম্পন্ন করেছে। এই প্রকল্প ত্রাণসামগ্রীর গুণগত মান ও পরিমাণ বর্ণনা করে পুষ্টি ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে। এই প্রকল্প প্রাপ্ত সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, যা পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন, পুষ্টি, খাদ্য সহায়তা, আশ্রয় ও অবস্থান পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যসেবার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করে। এ মানগুলো পৃথিবীব্যাপী একই রকম। মানের ব্যবহার নির্ভর করে দেশের বিদ্যমান সম্পদের ওপর।

Emergency Medical

Response

জরুরি চিকিৎসা সহায়তা

দুর্যোগ মানুষের মৃত্যু ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও জীবিত জনগণের স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের আপদ ও স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাবের মাঝে একটি সম্পর্ক আছে। বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এগুলো হতে পারে আঘাত, ভোগান্তি ও রোগ, যেমন- জ্বর, ঠাণ্ডা, বিভিন্ন প্রকার চর্ম রোগ, ডায়রিয়া, আঘাতের সংক্রমণ, পোড়া এবং পাকস্থলীর সমস্যা ইত্যাদি। এ ছাড়াও দুর্যোগের পরবর্তী ফলাফল সংক্রামক রোগের প্রসার, পুষ্টিহীনতা, দূষিত পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ধ্বংস, মানসিক বিপর্যস্ততার দিকে পরিচালিত হতে পারে। জরুরি সাড়ার পদক্ষেপ হিসেবে এ সময়ে আক্রান্ত জনগণকে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

Emergency Rehabilitation

জরুরি পুনর্বাসন

দুর্যোগ ঘটার পরে যে কার্যক্রম নেয়া হয় তাকে পুনর্বাসন বলে। এই পর্যায়ে এমন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়, যাতে আক্রান্ত জনগণ পুনরায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। আক্রান্ত জনগণের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করে ভৌত ক্ষয়ক্ষতি ও জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক কাজকর্ম পুনরায় শুরু করতে, অর্থনৈতিক কার্যক্রম ফিরিয়ে আনতে এবং যারা বেঁচে আছেন সেই জনগণের মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা প্রদান করা হয়। দুর্গত জনগণের জীবনযাত্রার মান দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে এখানে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। জরুরি পুনর্বাসনকে বিবেচনা করা যেতে পারে দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের মধ্যবর্তী একটি পর্যায় হিসেবে। এই পর্যায়ে একটি যাচাই তালিকা তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ, যা ভবিষ্যৎ অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য প্রয়োজন। এই যাচাই তালিকা জনগোষ্ঠীর কার্যকর সাড়া ব্যবস্থাপনার জন্য সাহায্য করে।

জরুরি অবস্থায় কার্যকরভাবে সাড়া দেয়ার যাচাই তালিকা :

পূর্বসতর্কতা

- পূর্বসতর্কতা ব্যবস্থা কাজ করছে কি না।
- জনগোষ্ঠীকে পূর্বসতর্কতামূলক তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা প্রস্তুত আছে কি?
- জনগোষ্ঠী পূর্বসতর্কতা বোঝে কি না এবং সে অনুযায়ী সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারছে কি না তা পর্যবেক্ষণের জন্য মরিটরিং ব্যবস্থা থাকা।

স্থানান্তর করা

- বিপদাপন্নতার তালিকা প্রস্তুত রয়েছে কি?
- স্থানান্তরের জায়গা চিহ্নিত আছে ও সেখানে যথাযথ সুবিধা বিদ্যমান কি না।
- জনগোষ্ঠী আশ্রয়কেন্দ্র এবং আশ্রয়কেন্দ্র যাওয়ার পথ সম্পর্কে সচেতন কি না।
- স্থানান্তরের জন্য সকল সরঞ্জাম বিদ্যমান রয়েছে কি?

অনুসন্ধান ও উদ্ধার করা

- অনুসন্ধান ও উদ্ধার করার জন্য প্রশিক্ষিত দল বিদ্যমান রয়েছে কি?
- স্বেচ্ছাসেবক দল সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে কি?
- সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বিদ্যমান কি না।

চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা

- প্রশিক্ষিত দল বিদ্যমান কি না।
- মানচিত্র বিদ্যমান রয়েছে কি?
- প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান হাতে আছে কি?
- সকল ক্ষেত্রের মূল্যায়নের জন্য সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়েছে কি?

জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম

- প্রয়োজনীয় জরুরি মজুদ বিদ্যমান রয়েছে কি?
- প্রয়োজন অনুযায়ী নগদ টাকা পাওয়ার সুবিধা আছে কি না।
- আপদ বিবেচনা করে ত্রাণসামগ্রী বা পারিবারিক প্যাকেজ নির্দিষ্ট করা আছে কি না।

জরুরি চিকিৎসা সেবা

- সকল চিকিৎসা কর্মী প্রস্তুত আছে কি?
- জরুরি পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত এবং সচল রয়েছে কি?
- ওষুধ ও অন্যান্য সরবরাহ প্রস্তুত রয়েছে কি না।
- গ্রাম ডাক্তার, এনজিও ও ধাত্রীদের মধ্যে সমন্বয় রয়েছে কি না।

জরুরি পুনর্বাসন

- সরকার, এনজিও এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় কেমন আছে?
- মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রস্তুত আছে কি?
- সম্ভাব্য সম্পদ পাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং এগুলো পাওয়ার পথ খুঁজে বের করা হয়েছে (প্রাথমিক যোগাযোগ করে রাখা হয়েছে কি না)।

দুর্যোগে জরুরি ব্যবস্থাপনা একটি বড় কাজ। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সময়ে কাজের পরিকল্পনার ওপর জরুরি ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে। জরুরি অবস্থার পর প্রচুর কাজেরও প্রয়োজন হয়, যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। কার্যকর জরুরি ব্যবস্থাপনার জন্য গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা রাখে। যারা গণমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের প্রশিক্ষিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা সঠিক ও কার্যকর তথ্য/প্রতিবেদন সঠিক সময়ে ও কার্যকরভাবে সরবরাহ করতে পারে।

Emergency Situation

জরুরি অবস্থা

এটি এমন এক পরিস্থিতি, যা মোকাবিলায় জরুরি হস্তক্ষেপ বা জরুরি সহায়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। জরুরি অবস্থা ধনীদের

তুলনায় দরিদ্র মানুষকে বেশি প্রভাবিত করে এবং এর ফলে অনেক মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ে। যখন স্থানীয় মোকাবিলা কৌশল ভেঙে পড়ে বা আক্রান্ত মানুষের সামর্থ্যের অভাব দেখা দেয় তখনই জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয়।



Environment পরিবেশ

কোনো একটি জীবের অস্তিত্ব বা বিকাশের ওপর ক্রিয়াশীল সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতা, যেমন- চারপাশের ভৌত অবস্থা, জলবায়ু ও প্রভাব বিস্তারকারী অন্যান্য জীব ও জৈব উপাদানকে Environment (পরিবেশ) বলে। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন পাস হয়েছে। কিন্তু জনবিক্ষোষণ, বনাঞ্চলের অবক্ষয় ও ঘাটতি এবং শিল্প ও পরিবহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবের দরুন দেশের পরিবেশ এক জটিল অবস্থার দিকে যাচ্ছে।

Environmental Degredation পরিবেশ অবনয়ন

মানুষের ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যা প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তি নষ্ট করে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাকে Environmental Degradation বা পরিবেশ অবনয়ন বলে। যেমন- জমি হ্রাস বা পরিত্যক্ত অবস্থা, অগ্নিকাণ্ড, বায়ু ও পানি দূষণ, আবহাওয়ার পরিবর্তন ও ওজোন-স্তর ক্ষয় ইত্যাদি।

Environmental Planning and Management পরিবেশ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

পৃথিবীর অন্যতম বড় দুটি নদী (পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র) বেষ্টিত ভয়াবহ বন্যা ও সাইক্লোনপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থান হওয়ায় বাংলাদেশে এক অনন্য পরিবেশ বিরাজমান। সীমিত সম্পদ এবং জনসংখ্যার চাপ মানুষ ও জমির অনুপাতকে ভীষণ জটিল করে তুলেছে। অতীতে এখানে পরিবেশসম্মত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বিলম্বে হলেও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো পর্যাণ্ড গুরুত্বসহ এখন সামনে এসেছে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় পরিবেশ নীতি (১৯৯২), জাতীয় পরিবেশ অ্যাকশন প্ল্যান (১৯৯২), বননীতি (১৯৯৪), বনায়ন মাস্টার প্ল্যান (১৯৯৩-২০১২) ও পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫) উল্লেখযোগ্য। জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল (National Conservation Strategy) এবং বিশেষত জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা অ্যাকশন প্ল্যান সকলের সহযোগিতায় প্রণীত হয়েছে।

উপরন্তু ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি ও অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নে বিভিন্ন সামাজিক শক্তিসহ সরকারি বিধি ও নিয়ন্ত্রণের ন্যায় বিভিন্ন নীতিগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, যদিও সব ক্ষেত্রে ফলাফল মিলছে, এমন নয়। অন্যান্য বিবেচনা ছাড়াও নীতিমালার লক্ষ্য পরিবেশের উন্নয়ন যেমন শহর সৌন্দর্যকরণ কর্মসূচি, বিনোদন এবং প্রতিবেশ ল্যান্ডস্কেপ, বন্যপ্রাণী ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ।

Environment and Development Planning পরিবেশ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশের ভূমিকা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ বিষয়টি অনুধাবন করে জাতীয় লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে মিল রেখে উন্নয়ন নীতি প্রণয়নের সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত উদ্বেগ বৃদ্ধি প্রকৃত অর্থে জীবনমরণ সমস্যা। একইভাবে মানুষের উন্নয়ন ছাড়া ভৌত পরিবেশের গুণগত মান উন্নয়ন একটি অস্বাভাবিক দাবি। পরিবেশের সংকট সবচেয়ে বেশি অনুভব করে গ্রামের গরিব মানুষ, কেননা তারা পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে না বুঝে সম্পদ আহরণ করে পরিবেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। এতে কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নই ব্যাহত হচ্ছে না, মানুষের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ছে। কেবল স্বাভাবিক পেশাগত দক্ষতার প্রয়োগ না করে দরিদ্র মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে সমন্বিত করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, টেকসই সম্পদ আহরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করাই সর্বোত্তম।

Environmental Crisis পরিবেশগত সংকট

মানুষের অস্তিত্বের জন্য আশঙ্কাজনক বা সংকটজনক পরিবেশ পরিস্থিতি। প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের লুপ্তনশূলক এবং অপরিণামদর্শী ব্যবহার এবং পরিবেশ দূষণের ফলে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

Environmental Impact Assessment (EIA) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ

এটি একটি বিশেষণমূলক পদ্ধতি যা দ্বারা সুবিন্যস্তভাবে কোন প্রকল্প, কার্যক্রম বা নীতির কারণে পরিবেশগত প্রভাব-নির্ণয় করা যায়। স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের স্বার্থে উন্নয়ন কার্যক্রমের EIA করা উচিত।

Environmental Law পরিবেশ আইন

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা লক্ষ্যে গৃহীত ও সূচী আইনি পদক্ষেপকে Environment Law (পরিবেশ আইন) বলে। এই আইনসমূহ স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য বিশ্ব আন্দোলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাগরিক ও সরকারি সংস্থাসমূহের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে। উনিশ শতকের শুরুতে দেশে পরিবেশসংক্রান্ত বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়।

পরিবেশসংক্রান্ত তদারকির জন্য ১৯৮৯ সালে পরিবেশ মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। অতঃপর সরকার পরিবেশসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। জাতীয় পরিবেশ নীতি ১৯৯২ প্রণীত হয়েছে এবং বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ বিধিবদ্ধ করার মাধ্যমে পুরোনো আইন সংশোধন করা

হয়েছে। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে অদ্যাবধি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশ সম্পর্কিত প্রায় ১৮৫টি আইন রয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ-সংক্রান্ত ২০টি আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রটোকলে স্বাক্ষরদাতা। এগুলোর অধিকাংশই বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থন করেছে।



Flood বন্যা/বান/প্লাবন

সাধারণভাবে বন্যা বলতে বোঝায় অস্বাভাবিক পানির প্রবাহ, যা প্লাবনমুক্ত ভূমিকে প্লাবিত করে এবং জান ও মালের ক্ষতি সাধন করে। জলবিজ্ঞানের মতে, “বন্যা হলো এমন একটি আপেক্ষিক উচ্চতা বা প্রবাহ, যা একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা বা

প্রবাহকে অতিক্রম করে।” সিলেটের হাওর এলাকায় বছরে (৪-৫) মাস পানিতে ডুবে থাকে, সেটাকে বন্যা বলা যাবে না।

Flood Season বন্যার সময়কাল

সাধারণত বাংলা মাসের আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত বা মধ্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে বন্যা হয়। বন্যা-পরবর্তী সময়-সাধারণত বাংলা মাসের আশ্বিন-কার্তিক পর্যন্ত বা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত হচ্ছে বন্যা-পরবর্তী সময়। বন্যা পূর্ববর্তী সময়-সাধারণত বাংলা মাসের অগ্রহায়ণ-বৈশাখ পর্যন্ত বা নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত হচ্ছে বন্যা-পূর্ববর্তী সময়।

Monsoon Flood মৌসুমি বন্যা

এই বন্যা ঋতুগত, বর্ষাকালে নদ-নদীর পানি ধীরে ধীরে ওঠানামা করে এবং বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করে জনমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

Flood Risk Management বন্যা-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

বন্যা-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার সৃষ্টি ব্যবস্থাপনা। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে বন্যার ঝুঁকি নিরূপণ, কৌশলগত পরিকল্পনা, ঝুঁকিহ্রাস পদক্ষেপসমূহের উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যাবলি। টেকসইভাবে বন্যা-ঝুঁকি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারগণ সংশ্লিষ্ট থাকেন।

Dry Flood-Proofing

ভবনের দেয়াল, জানালা, দরজা ও অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানসমূহের মাধ্যমে পানি যেন ভবনের ভেতর বা নির্দিষ্ট কোনো স্থানে প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করাকেই Dry Flood-proofing বলে। ভবনের নকশা ও প্রকারভেদের কারণে এই ব্যবস্থা সব অবকাঠামোর জন্য প্রযোজ্য নয়। সাধারণত এই ব্যবস্থা শুধু ইটের বা মজবুত কাঠের তৈরি ভবনসমূহের জন্য প্রযোজ্য।

Wet Flood-Proofing

ভবনের নকশা এমনভাবে তৈরি করা, যাতে করে পানি খুব সহজে ভবনের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু এতে ভবনের কাঠামো বা এর অভ্যন্তরস্থ বস্তুসামগ্রীর ক্ষতির মাত্রা খুব কম হয়। অভ্যন্তরস্থ বস্তুসামগ্রীকে সাধারণত সরিয়ে রাখা হয় বা উঁচু স্থানে রাখা হয়। এই কৌশলকে Wet Flood-Proofing বলে।

Flood Protection

বন্যা প্রতিরক্ষা

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য গৃহীত সুরক্ষা ব্যবস্থাকে Flood Protection বলে।

Flood Control

বন্যা নিয়ন্ত্রণ

বন্যার Physical বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত কৌশলসমূহকে Flood Control বলে।

Flash Flood

আকস্মিক বন্যা

উজানে অতিবৃষ্টির ফলে নদীর পানির উচ্চতা হঠাৎ করে বেড়ে যে বন্যার সৃষ্টি হয় তাকে

Flash Flood বা আকস্মিক বন্যা বলে। সাধারণত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাসে বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়।

জোয়ারসৃষ্ট বন্যা : সংক্ষিপ্ত স্থিতিকাল বিশিষ্ট এই বন্যার উচ্চতা সাধারণত ৩ থেকে ৬ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং ভূভাগের নিষ্কাশনপ্রণালিকে আবদ্ধ করে ফেলে। এ বন্যা সাধারণত পূর্ণিমা বা অমাবস্যার সময় হয়।

বর্ষার বন্যা : অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে এ ধরনের বন্যা হয়।

জলাবদ্ধতার কারণে বন্যা : জলাবদ্ধতার কারণে যখন পানি সরতে পারে না তখন এ ধরনের বন্যা হয়। বন্যার কারণসমূহ দুটি ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত।

ক. প্রকৃতিক ও খ. মানবসৃষ্ট।

ক. প্রকৃতির কারণগুলো হচ্ছে—

১. বাংলাদেশ হিমালয়ে উৎপন্ন নদী অববাহিকার বদ্বীপ বলে এখানে বন্যার প্রাদুর্ভাব বেশি। অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে প্রধান নদ-নদী দিয়ে প্রচুর পানি ভাটির দিকে প্রবাহিত হয়। প্রধান নদ-নদী থেকে গড়িয়ে পানি নিচু এলাকায় জমে দেশের নিম্নাঞ্চলে জলাশয়ের সৃষ্টি করে রেখেছে। দেশের ৬৫% জমিই গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের ৭.৫ মিটার উচ্চতার নিচে। বাংলাদেশের নদীগুলো বছরে ১৫০০ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি বহন করে থাকে। বাংলাদেশের নদীর সংখ্যা-২৫০। বাইরের দেশ থেকে আসা নদীর সংখ্যা-৫৮। বন্যার পানির ৮% বাংলাদেশের বৃষ্টিপাতের ফলে

সৃষ্টি হয়। বন্যার পানির ৯২% বাংলাদেশের উজানের দেশসমূহের।

২. ছোট-বড় ২৩০টি নদী জালের মতো বিস্তারিত হয়ে দেশটিকে বিশাল বদ্বীপে পরিণত করেছে। এ নদীগুলো সমগ্র দেশকে ৪টি অববাহিকায় বিভক্ত করেছে, যেমন : ১. ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা ২. গঙ্গা অববাহিকা ৩. মেঘনা অববাহিকা ৪. দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ি অববাহিকা।

এ সকল নদীর বুকে গড়ে ওঠে অসংখ্য বালুচর, যা পানির প্রবাহকে বাধা দান করে ও উপচিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে।

এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে— ১. নদীর গভীরতা কমে যাওয়া, ২. উজানে বা মূল ভূখণ্ডে অত্যধিক বৃষ্টিপাত, ৩. বন উজাড়, ৪. ভূমিকম্পের ফলে নদীর গতিপথের পরিবর্তন, ৫. হিমালয় অঞ্চলের প্রচুর তুষারপাত এবং তুষার গলিত জলরাশি, ৬. আসাম উপত্যকা ও উত্তর আসামে প্রচুর বৃষ্টিপাত, ৭. স্থানীয় প্রচুর বৃষ্টিপাত, ৮. উজানে ভূমিধসের কারণে প্রবাহিত পলি মাটিতে নদীগর্ভ ও নালাসমূহের তলদেশের উচ্চতা বৃদ্ধি, ৯. নদী, ঝরনা ও পানির উৎসস্থলে অবাধ বৃক্ষনিধন, ১০. নদীগুলোর গতিপথের পরিবর্তন, ১১. নদী বক্ষে জেগে ওঠা চর ও বালুচর।

খ. মানবসৃষ্ট কারণগুলো হচ্ছে—

১. অপরিকল্পিত জনবসতি এবং বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে স্বাভাবিক জল নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা,
২. অপরিকল্পিতভাবে অধিকসংখ্যক গৃহনির্মাণ।

Flood Warning

বন্যার সতর্কসংকেত

আকস্মিক বন্যা ব্যতীত অন্যান্য প্রকারের বন্যাসমূহ কিছু সময় নিয়ে সংগঠিত হয়। আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বন্যার পূর্বাভাস জনগণকে জানানো সম্ভব। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। এভাবে বন্যার পূর্বাভাস দেয়াকে বন্যার সতর্কসংকেত বলে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) প্রতিদিনের নদ-নদীর অবস্থা ও বৃষ্টিপাত মনিটর করে এবং প্রচারমাধ্যমের মাধ্যমে সতর্ক করার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। বন্যার সতর্কসংকেত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ :

১. বর্ষাকাল এলেই আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নিয়মিত রেডিও টেলিভিশনের আবহাওয়া বুলেটিন শুনতে হবে।
২. বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশি হলে অর্থাৎ একনাগাড়ে ৮-১০ দিন ভারি বৃষ্টি হলে বুঝতে হবে খুব শিগগিরই বন্যা হবে, তাই বন্যা মোকাবিলার পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।
৩. বাড়ির কাছাকাছি নদী ও বিলের পানি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে, দেখতে হবে প্রতিদিন কী পরিমাণ পানি বাড়ছে।
৪. একটি লম্বা বাঁশে সেন্টিমিটার অথবা ইঞ্চি-ফুটের চিহ্ন এঁকে বাড়ির কাছাকাছি পুঁতে রাখতে হবে, এতে

বোঝা যাবে, প্রতিদিন কী পরিমাণ পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুত পানি বাড়তে থাকলে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে।

৫. প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত বন্যা-সম্পর্কিত যাবতীয় খবর শুনতে হবে।
৬. প্রতিটি জেলা এমনকি উপজেলা পর্যায়েও সতর্কবার্তা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
৭. প্রতিদিন সকাল ৬টায় ও সন্ধ্যা ৬টায় নদীর পানি ও বৃষ্টিপাত মাপা হয়।

বন্যার পানির বিপৎসীমা বলতে নদীর পানিপ্রবাহের সেই নির্দিষ্ট বিন্দুর উচ্চতাকে বোঝায়, পানিপ্রবাহ সেই বিন্দু অতিক্রম করলে নদীতীরবর্তী অঞ্চল প্রাণিত হয়ে যেতে পারে। বিপৎসীমা স্থানভেদে একই নদীতে বিভিন্ন রকম হতে পারে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতে, বন্যার পানির বিপৎসীমার ৫০ সে.মি. নিচে থাকলে স্বাভাবিক অবস্থা, ৫০ সে.মি. উপরে থাকলে অস্বাভাবিক বন্যা আর ১০০ সে.মি. ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে মারাত্মক বন্যা বলে।

Flood Forecasting and Warning Centre বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র

বন্যার পূর্বাভাস প্রচার করে বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC)। ১৯৭২ সালে এ সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (BWDB) অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে—

১. বন্যার পূর্বাভাস ব্যবস্থায় সঠিক ও যথাযথ সময় ব্যবস্থাপনা উন্নত করা।
২. বন্যার পূর্বাভাস মডেল সমন্বয়যোগ্য

করা।

৩. বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী পর্যায়ে বন্যার তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা।
 ৪. টেকসই পূর্বাভাস-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
 ৫. প্রযুক্তি স্থানান্তর নিশ্চিত করা।
- এর কার্যক্রমগুলো হচ্ছে—
১. মাঠ পর্যায় থেকে নদীর পানি প্রবাহের তথ্য সংগ্রহ করা।
 ২. বন্যার পূর্বাভাসের মডেল কার্যকরী করা।
 ৩. বন্যার সতর্কসংকেত ইস্যু ও প্রচার করা।

Preparedness Activity বন্যার প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে যে কাজগুলো করা হয় তাকে বন্যার প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড বলে। তিন পর্যায়ে এ প্রস্তুতি নেওয়া হয়, যথা : বন্যা-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম, বন্যাকালীন কাজ এবং বন্যা-পরবর্তী পর্যায়ে করণীয়।

Pre-flood Activity বন্যা-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড

বন্যা-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডগুলো হচ্ছে— বন্যার আগে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বাড়ির ভিটা উঁচু করা; বাড়ির চারপাশ দিয়ে কলাগাছ, ঢোলকলমি, ধোঁধা, বাঁশ ইত্যাদি বন্যা মোকাবিলায় সহায়ক গাছ লাগানো; বন্যাকালীন কথা মাথায় রেখে সঞ্চয় করা; বন্যার পানি আসার আগেই আলগা চুলা তৈরি করা ও জ্বালানি সংগ্রহ করে উঁচু জায়গায় সংরক্ষণ করা এবং সেই সঙ্গে শুকনো খাবার— চিড়া, মুড়ি, গুড় ইত্যাদি

সংগ্রহ করে রাখা; বন্যা আসার আগেই বাড়ির স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিউবওয়েল উঁচু স্থানে স্থাপন করা, যাতে বন্যার পানিতে ডুবে না যায়; বাড়ির গোয়ালঘর ও হাঁস-মুরগির ঘর উঁচু করে তৈরি করা, যাতে বন্যার সময় এগুলো নিয়ে বিপদে পড়তে না হয়, কৃষি বীজ সংরক্ষণ করা, গবাদিপশু ও পাখির খাবার সংরক্ষণ করা, বন্যা আসার আগেই গবাদিপশু-পাখিকে প্রতিষেধক টিকা দেয়া; বন্যা আসার আগেই ডায়রিয়া প্রতিরোধে কার্যকর খাবার স্যালাইন কীভাবে বানাতে হয় তা জেনে রাখা; বন্যাকালীন কোনো গর্ভবতীর প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। আগে থেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। প্রয়োজনে বন্যার পানি আসার আগেই তাকে নিরাপদ স্থানে রাখা; ছোট ছেলেমেয়েদের বন্যা আসার আগেই সাঁতার শেখাতে হবে। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে এখন থেকেই বন্যা মোকাবিলায় অভ্যস্ত করে তুলতে হবে; বন্যার পানি আসার আগেই এলাকার আশপাশের উঁচু স্থানগুলো কোথায় তা চিহ্নিত করতে হবে, যাতে অতিরিক্ত বন্যায় সেখানে আশ্রয় নেয়া যায়।

During-flood Activity বন্যাকালীন কর্মকাণ্ড

বন্যাকালীন কর্মকাণ্ডগুলো হচ্ছে—বন্যাকালীন সময়ে নিয়মিত পানি বৃদ্ধির খবর জানার চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিপদের সংবাদ সবাইকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে; নিরাপদ আশ্রয় গমনে নারী, বৃদ্ধ, শিশু ও বিকলাঙ্গদের আগে সুযোগ দিতে হবে; যত কষ্টই হোক না কেন, দূর থেকে

টিউবওয়েলের নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে হবে; স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও কর্মরত এনজিওদের নিজেদের অবস্থান জানাতে হবে; নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

Post-flood Activity বন্যা পরবর্তী কাজ

বন্যার পর যা করতে হবে তা হলো— বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। নোংরা আবর্জনা মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে ব্রিচিং পাউডার ব্যবহার করা; অর্থনৈতিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দ্রুত বর্ধনশীল শাক-সবজির চাষ করা; বন্যার পর সরকার ইউনিয়ন পরিষদ ও কর্মরত এনজিওদের কাছ থেকে পুনর্বাসন-সুবিধা সম্বন্ধে জানা ও তা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

Decisions of the workshops on ‘Mitigation measures to reduce the loss of flood risk in Bangladesh’

‘বাংলাদেশে বন্যার ঝুঁকি এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপায়সমূহ’র ওপর জাতীয় কর্মশালার সিদ্ধান্তসমূহ

‘বাংলাদেশে বন্যার ঝুঁকি এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপায়’-এর ওপর জাতীয় কর্মশালা ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৭-৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালার লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন প্রাণভূমির প্রভাব এবং বন্যার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা থেকে জানা বন্যা, বন্যা ও দুর্যোগ

ব্যবস্থাপনার উদ্যোগসমূহ ও অভিজ্ঞতা মূল্যায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে বন্যা ব্যবস্থাপনার নীতি ও কর্মপরিকল্পনার সিদ্ধান্তসমূহ তৈরি করা। এ কর্মশালা আর্থ-সামাজিক বিস্তৃতি ও মূল্যায়ন করেছে। নীতি নির্ধারক, পানি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ, অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন সহযোগী, বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা, সংবাদমাধ্যম, এনজিও প্রতিনিধি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দসহ প্রায় ৯০০ ব্যক্তি এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার সুপারিশসমূহ:

১. ২০০৪ সালের বন্যা হতে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বন্যা ব্যবস্থাপনার স্থায়ী নির্দেশনাসমূহ পর্যালোচনা ও সংশোধন করা;
২. জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সঠিকভাবে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্ভোগে পরিকল্পনা এবং সাড়া দেওয়া কার্যক্রম সময়মতো অবশ্যই চালিয়ে যাওয়া; এবং
৩. বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্ভোগে কার্যকরভাবে সাড়া দিতে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় হওয়ার আশঙ্কা আছে, এমন সময়ের পূর্বে বিদ্যমান জনসম্পদসহ প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী ও তার সরবরাহ তালিকা প্রস্তুত করা।

এই কর্মশালা শেষ হয় বন্যার ঝুঁকি কমানোর পন্থা হিসেবে ৩২৩টি সুপারিশ গ্রহণের মাধ্যমে। এই ৩২৩টি সুপারিশমালার মধ্যে ৮৭টিই খাদ্য ও দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়া উচিত।

FIRE আগুন

Fire আগুন

আগুন একটি মারাত্মক মানবসৃষ্ট দুর্ভোগ। অসাবধানতাই অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ। অগ্নিকাণ্ডের ফলে সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদ নিমিষেই ধ্বংস হয়ে যায়, জীবন পতিত হয় দুর্বিপাকে। একটুখানি অসতর্কতা আগুনের মতো মারাত্মক বিপদ মানুষ ও সম্পদের বিশাল ক্ষতিসাধন করে। আগুন যেকোনো সময় লেগে যেতে পারে, কিন্তু এর প্রকোপ ফাল্গুন মাস থেকে সমগ্র শুষ্ক মৌসুমেই বেশি দেখা যায়। আগুনের কারণে এ দেশে প্রতিনিয়তই ছোট-বড় অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটে। এ দুর্ঘটনা যখন কোনো ব্যক্তি বা পরিবারকে আক্রান্ত না করে কোনো জন-অধ্যুষিত এলাকা, শিল্প-কলকারখানাতে ঘটে তখনই এর ভয়াবহতা আমাদেরকে নাড়া দেয়। ইদানীংকালে শহরাঞ্চলে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে আগুন, বস্তিতে আগুন ও ব্যবসা-বিপণিতে আগুন সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে। সাধারণত শীত মৌসুমে প্রকৃতি শুষ্ক থাকে বলে সামান্য অগ্নিস্পর্শে অগ্নিকাণ্ড শুরু হয় এবং শুষ্ক মৌসুমে এর ব্যাপকতা বেশি লক্ষ্য করা যায়।

Causes of Fire

অগ্নিকাণ্ডের কারণসমূহ

সাধারণত যে সমস্ত কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকে তা হলো : রান্নার পর আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়ে না দিলে, বাতাসে উড়ে গিয়ে সেই

আগুন বাড়ির বেড়ায় লাগতে পারে; ছাইয়ের আগুন বাতাসে উড়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে; চুলার ওপর খড়ি শুকাতো দিলে খড়িতে আগুন লেগে যেতে পারে, সে আগুন বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতে পারে; সিগারেট, বিড়ি ও হুঁকার আগুন থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে; গ্রামাঞ্চলে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আগুন নেওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে; জ্বলন্ত কুপি, কয়েল ঘরে রেখে ঘুমালেও অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে, ঘুমানোর সময় বিছানার ধারে জ্বলন্ত হারিকেন রাখলে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে; ত্রুটিপূর্ণ বিদ্যুৎ-সংযোগ থেকে আগুন লাগতে পারে; জ্বলন্ত আবর্জনার ঢিবি থেকেও আগুন লাগতে পারে; শিশুদের আগুন নিয়ে খেলা থেকে এবং আতশবাজি থেকেও অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে; গ্যাসের চুলা রান্নার পর বন্ধ না করে চুলার ওপর কাপড় শুকাতো দিলে আগুন লাগার আশঙ্কা থাকে; অপরিষ্কৃত ও অবৈধভাবে গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেয়াও অগ্নিকাণ্ডের কারণ; ভূমিকম্পের কারণে গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইন থেকে আগুন লেগে যেতে পারে; শত্রুতাবশত অনেকে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়।

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS ভৌগোলিক তথ্যব্যবস্থা

Geographic Information Systems (GIS) ভৌগোলিক তথ্যব্যবস্থা

ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থান-সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য গৃহীত প্রযুক্তিকে বলা হয় Geographic Information Systems (GIS) বা ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা। যে

সকল খাতে স্থানিক সম্পর্কিত উপাত্ত, যেমন— জেলা, থানা অথবা কোনো একটি ভূখণ্ডের সীমানার সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য ও বিষয়াদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সে সকল খাতে জিআইএস প্রযুক্তি অত্যন্ত উপযোগী। বিশেষ করে, ভূমি ব্যবহার, আমদানুমারি, নগর পরিকল্পনা, বন, পরিবহন-ব্যবস্থাসহ আরও অনেক ক্ষেত্রে জিআইএস প্রযুক্তি আজকাল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আধুনিক জিআইএস প্রযুক্তির উন্নয়নে কানাডার ভূমিকা অগ্রগণ্য। কানাডার কৃষি পুনর্বাসন ও উন্নয়ন এজেন্সি (Agriculture Rehabilitation and Development Agency) ১৯৬৩ সালে কানাডা জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (সিআইএস) প্রযুক্তির প্রচলন করে। ১৯৯১ সালে ইসপান (Irrigation Support Project for Asia and the Near East) ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ-১৯) প্রকল্পে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ জিআইএস ব্যবহার করে। ইসপান-পরবর্তী সময়ে ইজিআইএস (Environmental and GIS Support Projects for Water Sector Planning) নামে পুনর্গঠিত হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৫০টিরও অধিক প্রতিষ্ঠানে জিআইএস স্থাপনা রয়েছে। শুরুর দিকে অধিকাংশ জিআইএস স্থাপনা ছিল অনুদান সহায়তা হিসেবে লাভ করা এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও সামান্যসংখ্যক স্থানীয় জনশক্তি দ্বারা পরিচালিত। বর্তমানে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের অর্থায়নে জিআইএস ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং স্থানীয় জনশক্তি দ্বারা এ সকল ল্যাব পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে জিআইএস-এর প্রয়োগ

হার্ডওয়্যার স্থাপনে উচ্চ ব্যয় এবং প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞের অভাবে বাংলাদেশে জিআইএস-এর প্রয়োগ অত্যন্ত সীমিত। তবে এ সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশে জিআইএস-এর প্রয়োগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানে জিআইএস আজকাল অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ছে। ইতোমধ্যে বেশকিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন-সিইজেআইএস, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, এসআরডিআই, স্পারসো, পরিবেশ অধিদপ্তর, কেয়ার বাংলাদেশ, সিডিএমপি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে জিআইএস অনুশীলন করা হচ্ছে।

LAND ভূমি



Landslide

ভূমিধস

পৃথিবীর কেন্দ্রমুখী আকর্ষণের কারণে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ভূখণ্ড, শিলা বা উভয়ের

প্রত্যক্ষভাবে নিম্নমুখী অবনমন বা পতনকে Landslide (ভূমিধস) বলে। ভূমিধসের কারণ হিসেবে পানির প্রবেশকে অন্যতম বিবেচনা করা হয়; যা ক্ষীত কাদামাটিকে আরও তরল করে তোলে। ভূমিধস ভূমি অবক্ষয়ের একটি বড় কারণ। বর্ষাকালে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট উভয়বিধ ঢালে ভূমিধস সংঘটিত হয়। এর সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সড়ক প্রতিবন্ধকতা। বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় এটা অহরহ ঘটে থাকে। গোটা দেশের সঙ্গে বান্দরবান শহরকে যুক্তকারী প্রধান সড়কসমূহ প্রায় প্রতিবছর ভূমিধসের মুখোমুখি হচ্ছে, যা শহরটিকে ও সংলগ্ন অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ভবনাদি ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কারণে সৃষ্ট ভূমিধস সাধারণত পার্বত্য জেলা শহরের শহর ও উপশহর কেন্দ্রে সীমিত। বহু ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো, বিশেষ করে খাড়া উঁচু ঢালের ওপর যেগুলো বিদ্যমান সেগুলো, ভূমিধসের কারণে ধসে পড়ে জানমালের ক্ষতি সাধন করে। বিগত বছরগুলোতে খাড়া উঁচু ঢালে জুমচাষ ও অন্যান্য চাষাবাদও ভূমিধস সংঘটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

Causes of Landslide

ভূমিধসের কারণসমূহ

বিভিন্ন কারণে ভূমিধস হতে পারে। যেমন—

- অবৈধভাবে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে মাটি কাটার ফলে পাহাড়ের মাটি আলগা হয়ে যায় ফলে ভূমিধস সংঘটিত হয়।
- পাহাড়ের চূড়ায় ও ঢালে পাহাড় কেটে

বাড়ি ও অন্যান্য ভবন তৈরির ফলে মাটির ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ভূমিধস হয়।

- ভূমিকম্পের কারণে ভূমিধস হয়ে থাকে।
- ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রচণ্ড শক্তির কারণে পাহাড়সমূহের আঞ্চলিকভাবে একদিকে কাত হওয়ার ফলে ভূমিধস হয়।
- উজানভাগের পাহাড়ি নদীর শ্রোতের দ্বারা নদীখাতের ক্ষয় এবং নদী ও তরঙ্গের দ্বারা কর্তনের ফলে ভূমিধস হয়ে থাকে।
- জুমচাষ ভূমিধসের একটি কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

Land Degradation

ভূমি অবনয়ন

মাটির অপসারণের ফলে বিনিময়যোগ্য ক্ষার হ্রাস এবং মাটির স্তর-সিলিকা এটেলের ক্ষয়কে Land Degradation বা ভূমি অবনয়ন বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, অবক্ষয় ও ক্ষয়ীভবনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া দ্বারা ভূপৃষ্ঠ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া এবং সাধারণভাবে ভূমির উচ্চতা হ্রাস ও নিচু হয়ে যাওয়ায় Land Degradation বা ভূমি অবনয়ন বলা হয়।

ভূমি অবনয়ন ভূমি অব্যবস্থাপনার ফলে ঘটে। ভূমি ব্যবহারের সমন্বয়হীনতা এর অন্যতম কারণ। এটি সুস্পষ্টভাবে মানব প্রবর্তিত সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, যার দ্বারা ব্যাপক এলাকা ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Statue and Severity of Land Degradation

ভূমি অবনয়নের পরিস্থিতি ও তীব্রতা

ভূমি অবনয়নের নিম্নোক্ত চারটি মাত্রা চিহ্নিত করা হয়েছে :

১. **মৃদু অবনয়ন** : আমাদের দেশে আদি জৈবিক চাষাবাদ পদ্ধতি এখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এতে ভূমির কৃষি উপযুক্ততা কিছু পরিমাণে হ্রাস পেলেও স্থানীয় চাষাবাদ ব্যবস্থার জন্য তা উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনা রীতিতে পরিবর্তন আনতে পারলে পূর্ণ উৎপাদনক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। এখানে ভূমির মৃদু অবনয়ন খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারে না।
 ২. **মাঝারি অবনয়ন** : ভূমির মাঝারি অবনয়নের ফলে কৃষি উৎপাদন ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পেলেও স্থানীয় আবাদ-ব্যবস্থার জন্য তা একেবারে অনুপযুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে উৎপাদন-ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যাপক উন্নয়নের প্রয়োজন হয়।
 ৩. **তীব্র ভূমি অবনয়ন** : তীব্র ভূমি অবনয়নে ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাপক প্রকৌশলগত কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন হয়।
 ৪. **চরম পর্যায়ে অবনয়ন** : ভূমির চরম পর্যায়ের অবনয়নে ভূমি সংশোধন ও পুনরুদ্ধারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।
- ভূমি অবনয়নের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি নিঃসন্দেহে একটি দেশের জন্য চরম উদ্বেগের কারণ। সামাজিক পরিণতির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কৃষকের আয় কমে যাওয়া।

Causes of Land Degradation ভূমি অবনয়নের কারণসমূহ

বাংলাদেশের ভূমি অবনয়নের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে : ক্ষয়ীভবন, দূষণ (Contamination), দৃঢ়করণ (Compaction), ভ্রান্ত চাষ পদ্ধতির কারণে জৈব পদার্থ হ্রাস, লবণাক্তকরণ এবং জলাবদ্ধতার ফলে ব্যাপক মৃত্তিকা অবনয়ন; প্রধানত ভূমি রূপান্তর ও বন উজাড়ের মাধ্যমে মৃত্তিকা অবনয়ন; চাষাবাদ, নগরায়ণ প্রভৃতি কারণে প্রাকৃতিক দৃশ্যের (Natural Landscape) অবনয়ন।

ভূমি অবনয়নের অন্যান্য কারণসমূহের মধ্যে খরা, জনসংখ্যার চাপ, দারিদ্র্য, সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তির কারণে আরোপিত নিষেধাজ্ঞাসমূহ এবং স্থানীয় কৃষি ও ভূমি ব্যবহার নীতি অন্তর্ভুক্ত। উচ্চ ফলনশীল শস্যের (High Yielding Variety-HYV) নিবিড় চাষাবাদ এবং সেই সঙ্গে জমিতে ভারসাম্যহীন সার প্রয়োগ দেশের কৃষিজমির মারাত্মক অবনয়ন ঘটছে।

Land Use ভূমি ব্যবহার

ভূমির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত মানবীয় কর্মকাণ্ডগুলোকে Land Use (ভূমি ব্যবহার) বলে। ভূমি আচ্ছাদন হচ্ছে ভূমির একটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, অপরদিকে একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষ কর্তৃক ভূমির ব্যবহারের ধরন হচ্ছে ভূমি ব্যবহার। মানুষ তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রাকৃতিক ভূমি আচ্ছাদনকে নিজের ব্যবহারের আওতায় নিয়ে আসে এবং সেই প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক ভূমি আচ্ছাদনের পরিবর্তন সাধিত হয়। ভূপ্রকৃতি

(Physiographic), জলবায়ু এবং প্লাবন-সীমার পরিপ্রেক্ষিতে ভূমির অবস্থান- এই তিনটি নির্ণায়ক দ্বারা বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহারের ধরন নির্ণীত হয়ে থাকে।

Land Use Planning ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

পরিবেশ ও সম্পদের ক্ষতি না করে উপযোগী ভূমি চিহ্নিতকরণ ও পরিকল্পিতভাবে এসব ভূমির বহুবিধ ব্যবহারের জন্য জনগণকে উৎসাহিতকরণ প্রক্রিয়াকে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বলা হয়। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুর্ব্যোগ ঝুঁকি বিবেচনা করা এবং স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

Land Use Changes and Degradation

ভূমি ব্যবহার-ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও অবনয়ন

বিশ্বজুড়ে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে জনপ্রতি নিট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ০.১৫ শতাংশ মাত্র। দেশের ৯০ হেক্টরের সীমিত নিট চাষযোগ্য জমির কৃষি নিবিড়তা হচ্ছে ১৭৪.৬৪ শতাংশ। প্রধানত ক্ষয়ীভবন, পুষ্টি উপাদান নিঃশেষ হওয়া, অসামঞ্জস্য প্রয়োগ, বন উজারকরণ, লবণাক্ততা এবং ক্ষারত্বের কারণে মৃত্তিকা অবনয়ন সংঘটিত হয়।

মৃত্তিকা ও পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর কাজক্ষিত মাত্রার শস্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ নির্ভর করে। এ পর্যন্ত শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রধানত উচ্চ ফলনশীল শস্যের আবাদ, সার প্রয়োগ, সেচ ও কৃষি-রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত

হয়। সারের ব্যবহার বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ব্যতীত বিশ্বের কোনো দেশেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি এবং বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কতিপয় অধিক শিল্পায়িত দেশসমূহে সার ব্যবহারের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে পরিবেশবাদীরা অতি মাত্রায় সার ব্যবহারের বিপক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন।

PARTICIPATORY VULNERABILITY ASSESSMENT অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ



Participatory অংশগ্রহণমূলক

অংশগ্রহণমূলক বিষয়টি হলো একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য বিষয়টির সঙ্গে

জড়িতদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মতামতগুলোকে জানা হয়।

Participatory Vulnerability Assessment (PVA)

অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ

ঝুঁকিহ্রাসের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সম্ভাব্য কোনো একটি আপদের (Hazard) কারণে ঝুঁকিগ্রবণ কোনো একটি এলাকার ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে আপদ মোকাবিলায় তাদের সক্ষমতা এবং বিপদাপন্নতাসমূহকে বিস্তারিতভাবে জানার কৌশলকেই অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ (PVA) বলে। অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে— ঝুঁকিহ্রাস এবং এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে— ঝুঁকি, সক্ষমতা এবং বিপদাপন্নতা সম্পর্কে ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সচেতনতা সৃষ্টি, ঝুঁকিহ্রাসে সক্ষমতা এবং বিপদাপন্নতাসমূহ চিহ্নিত করা, চিহ্নিত বিপদাপন্নতাসমূহ হ্রাসে কার্যক্রম নির্ধারণ করা, কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সম্পদ ও সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহ চিহ্নিত করা, বিপদাপন্নতা হ্রাসে ঝুঁকিগ্রস্ত জনগণ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় সহযোগী সংস্থার ভূমিকা নির্ধারণ, ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে ঝুঁকিহ্রাসে সক্রিয় করা। অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে— ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক, পরিবেশগত, আর্থ-সামাজিক, জীবন ও জীবিকা, ভৌত অবকাঠামোগত, দুর্ব্যোগ মোকাবিলায় দক্ষ জনগোষ্ঠী, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবাগত অবস্থা ও জনগণের অধিকার, নারী, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদা নিরূপণ।

Areas of PVA

অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রসমূহ

অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে—

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক

গ্রামের চারপাশে কী আছে, জমির ধরন, জমির উর্বরতা, জমির স্থায়িত্ব, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি।

পরিবেশগত

প্রাকৃতিক বিষয়াদি যেমন : বন-জঙ্গল, খাল-বিল, হাওর, জলাশয়, পুকুর, নদী, সাগর, পাহাড় ইত্যাদির কারণে পরিবেশের ওপর কোনো প্রভাব পড়ছে কি না, মানুষের আচরণগত কারণে পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন কি না, বিদ্যমান পরিবেশ মানুষের জন্য ঝুঁকি কি না ইত্যাদি নির্ণয় করা।

আর্থ-সামাজিক

মানুষের সবল ও দুর্বল দিক, মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক সম্প্রীতি, দুর্যোগ মোকাবিলায় মানসিকতা ও চর্চা, নেতৃত্ব, সালিসি ব্যবস্থা, শিক্ষার হার ইত্যাদি বিবেচনা করা।

জীবন ও জীবিকা

কোন মাসে কোন ফসল হয়, কোন মাসে মানুষ কোন পেশার সঙ্গে জড়িত, কোন মাসে আয় বেশি হয়, কোন মাসে আয় কম হয়, কোন সময় মানুষের জীবিকার ওপর সমস্যা সৃষ্টি হয়, কোন মাসে পেশার ওপর ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি চিহ্নিত করা।

ভৌত অবকাঠামোগত

বাঁধ, কিল্লা, নৌকা, হাট-বাজার, ইউনিয়ন

পরিষদ, খেলার মাঠ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমিতি, ক্লিনিক, রাস্তাঘাট, লঞ্চ, স্টিমার, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অবস্থান বিবেচনা করা।

দুর্যোগ মোকাবিলায় দক্ষ জনগোষ্ঠী

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী, স্বাস্থ্যকর্মী, সিপিপি কর্মী, মাঝি, মেকানিক, শিক্ষক/শিক্ষিকা, ধর্মীয় নেতা, গ্রাম্য ডাক্তার, পশু চিকিৎসক, উন্নয়নকর্মী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মীকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করা।

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবাগত অবস্থা ও জনগণের অধিকার

সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, পশু বিভাগ, পানি ও পয়োনিষ্কাশন, টেলিভিশন, নিরাপত্তা, এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মহিলা উন্নয়ন পরিষদ, মৎস্য বিভাগ, যুব উন্নয়ন, শিক্ষা বিভাগ, কৃষি বিভাগ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সেবা নিশ্চিত করা।

নারী, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক

সামাজিক অবস্থা, স্বাস্থ্যগত অবস্থা, শিক্ষাগত অবস্থা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, মজুদ, পানি ও পয়োনিষ্কাশন, বৃক্ষ রোপণ, নিরাপদ স্থানে গমন, বিপদ সংকেত মেনে চলা, সচেতনতা বার্তা প্রচার ইত্যাদি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নারী, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদা বিবেচনা করা।

PVA Tools

অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ উপকরণসমূহ

অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণে যেসব পদ্ধতিসমূহ বা উপকরণসমূহ ব্যবহার করা হয় তাকে অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ উপকরণ বা PVA Tools বলে।

Focus Group Discussion (FGD)

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দলীয় আলোচনা

কোনো একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য উক্ত বিষয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে দলীয় আলোচনা (Focus Group Discussion) করাকে ফোকাস দলে আলোচনা বলে। যেমন—আপদজনিত কারণে ঝুঁকিগ্রস্ত একই পেশার মানুষ, দুর্যোগের কারণে একই মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, একই অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজনে একই লিঙ্গের মানুষ।

Livelihood Matrix Tool

লাইভলিহুড ম্যাট্রিক্স টুল

লাইভলিহুড ম্যাট্রিক্স টুল এমন একটি অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, যার সাহায্যে নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবিকা এবং ঝুঁকি ও দুর্যোগের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক উদ্ঘাটন করা যায় এবং এর মধ্য দিয়ে ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার নিরাপত্তাও বিশ্লেষণ করা যায়। এই টুলটি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ধরন ও উৎস, কর্মদক্ষতা এবং জীবিকায়নের সুযোগসমূহে মানুষের প্রবেশের সুযোগ ও ভূমির মালিকানা, কাজের সুযোগের স্থান (নিজ এলাকায় অথবা বাইরে) চিহ্নিত করে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কর্মদক্ষতা ও জীবিকায়নের সুযোগসমূহে মানুষের প্রবেশগম্যতা কীভাবে ঝুঁকি হ্রাস করে তাও নিরূপণ করে। ম্যাট্রিক্সটি মানুষের ঝুঁকিবিহীন জীবনযাত্রার

ধরন নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

Institutional Mapping Tool

একটি এলাকায় বিদ্যমান বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সেবা ঐ এলাকার মানুষের ঝুঁকি অনেকাংশেই হ্রাস করে। যে কারণে মানুষের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা নিয়ন্ত্রক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি বিচ্ছিন্ন চরে যদি একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকে এবং বন্যার সময়ও তা কার্যকরভাবে চালু থাকে, তাহলে বন্যার সময় মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা ততটা তীব্র হবে না বলে ধারণা করা যায়। পক্ষান্তরে এর বিপরীত অবস্থা হলে মানুষ যদি বন্যার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বন্যাকে মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, তাহলেও শুধু স্বাস্থ্য সমস্যা এ বিচ্ছিন্ন চরের মানুষের কাছে নতুন বিপদ অথবা দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্মীদের ঝুঁকিকবলিত এলাকায় সেবাদানরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের মনোভাব যাচাই করা খুবই প্রয়োজন। এই জানার প্রক্রিয়া বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের একটি অন্যতম প্রধান টুল হিসেবে বিবেচিত হয়। অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণে ইনস্টিটিউশনাল ম্যাপিং টুল এমন একটি টুল, যার সাহায্যে ঝুঁকিকবলিত এলাকায় সেবাদানরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা দানের প্রকৃতি, ব্যাপকতা এবং সেবাদানরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে

মানুষের সম্পর্ক ও সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের মনোভাব জানা সম্ভব হয়। অনেকেই প্রাথমিকভাবে মনে করেন যে, এই টুল ও ভেন ডায়াগ্রামের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ দুটির মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে, ভেন ডায়াগ্রাম মূলত অবস্থানগত দূরত্ব, ইনস্টিটিউশন কর্তৃক জনগণকে সেবা প্রদান এবং ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক যাচাই করে। আর ইনস্টিটিউশনাল ম্যাপিং টুল যা করে তা হচ্ছে: জনগণের প্রতি ইনস্টিটিউশন সে সম্পর্কে জনগণের প্রতি কোনোরূপ দায়বদ্ধতা বোধ করে কি না তা যাচাই করে; জনগণের প্রতি ইনস্টিটিউশনের সাড়া প্রদানের ব্যাপকতা যাচাই করে। ইনস্টিটিউশনের ক্ষমতাকাঠামোতে জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা যাচাই করে; ইনস্টিটিউশন ও জনগণের মধ্যে তথ্যপ্রবাহের প্রকৃতি যাচাই করে।

সুতরাং ইনস্টিটিউশনাল ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে যা প্রদর্শন করা সম্ভব তা হচ্ছে— জনগণের প্রতি সেবা-প্রতিষ্ঠানসমূহের সাড়া প্রদানের মাত্রা, জনগণের প্রতি ইনস্টিটিউশনের যে দায়িত্ব রয়েছে জনগণ সে সম্পর্কে কতটুকু অবহিত তা যাচাই, জনগণের প্রতি ইনস্টিটিউশনের যে কর্তৃত্বের ক্ষমতা তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যাচাই করা।

Risk and Resource Map ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র

দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠী নিয়মিতভাবে আপদের সম্মুখীন হওয়ার ফলে বাস্তবসম্মত কারণেই তাদের আপদসংক্রান্ত ঝুঁকি সম্পর্কে তারা সচেতন। পাশাপাশি সম্ভাব্য আপদের কারণে এলাকা বা পরিবারের কোন ধরনের সম্পদের ক্ষতির

সম্ভাবনা আছে এবং স্থানীয় কোন সম্পদগুলো ঝুঁকিহাসে সহায়তা করে সে বিষয়েও আক্রান্ত জনগোষ্ঠী পরিষ্কার ধারণা রাখে। আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এলাকার আপদজনিত ঝুঁকি ও সম্পদের অবস্থা মানচিত্রে রূপদানকেই ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র বলে।

Seasonal Calender ঋতুভিত্তিক পঞ্জিকা

বছরের বিভিন্ন সময়ে বা ঋতুতে কোনো এলাকার কৃষিব্যবস্থা (ফসল রোপণ, কর্তন, ফসলে পোকার আক্রমণ, ফসলে দুর্যোগের আক্রমণ), রোগ-শোক, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, যোগাযোগ ইত্যাদি প্রদর্শনের জন্য খুবই কার্যোপযোগী। ঋতুভিত্তিক পঞ্জিকা তৈরির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়জনিত কারণে বিপদাপন্নতার মূল কারণ এবং এর সম্ভাব্য ফলাফল অনুসন্ধান। যদি কৃষিব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে ঋতুভিত্তিক পঞ্জিকা তৈরি করা হয়, তাহলে উক্ত পঞ্জিকায় ফসল রোপণ-কর্তন এবং ফসলে দুর্যোগের আক্রমণ বা প্রভাব নির্দিষ্ট চিহ্ন দ্বারা প্রদর্শন করা হয়। উক্ত ঋতুভিত্তিক পঞ্জিকাসংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষিব্যবস্থায় শুধু দুর্যোগের আক্রমণ বা প্রভাবই নির্দেশ করে না, একই সঙ্গে কৃষিব্যবস্থায় দুর্যোগের আক্রমণ বা প্রভাব কীভাবে জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা বাড়িয়ে তোলে তাও ব্যাখ্যা করে।

Social Mapping সামাজিক মানচিত্রায়ণ

অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণে ‘সামাজিক মানচিত্রায়ণ’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও

কার্যকর এক টুল বলে বিবেচিত। সামাজিক মানচিত্রায়ণ মূলত মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত এক অংশগ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষা (পিআরও) পদ্ধতির কার্যকর ও জনপ্রিয় একটি টুল। সামাজিক মানচিত্রায়ণ এমনই এক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে নিজ নিজ এলাকার ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি পরিবেশগত অবস্থা ও অবস্থান দৃশ্যমান করা যায়। এ কারণেই বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণে সামাজিক মানচিত্রায়ণ বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে গ্রামের আত্মীয় জনগণ একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে গ্রামের ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অবস্থা ও অবস্থান বিশ্লেষণ করে তা অঙ্কনের মাধ্যমে দৃশ্যমান করে তোলে। ফলে এই প্রক্রিয়ায় ঐ গ্রামের অত্যন্ত বাস্তবসম্মত বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

Transect Walk পরিভ্রমণ

প্রতিনিয়ত আমরা পরিভ্রমণ করি। এ সমস্ত পরিভ্রমণের কখনো উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু আমরা যখন অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের কৌশল হিসেবে পরিভ্রমণকে চিন্তা করব সেক্ষেত্রে এই পরিভ্রমণের অবশ্যই একটি উদ্দেশ্য থাকতে হবে। তাই একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো একটি স্থানে ভ্রমণ করাকে সমাজবিজ্ঞানীগণ পরিভ্রমণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরিভ্রমণ প্রক্রিয়াকে আরও সমৃদ্ধ করে পরিভ্রমণকারীর সুদূরপ্রসারী পর্যবেক্ষণ এবং তিনি যা পর্যবেক্ষণ করেছেন তা বিশ্লেষণের ক্ষমতা। স্বাদ, গন্ধ, মানুষের আচরণ ও

পরিভ্রমণ প্রক্রিয়াকে সফল করতে নানাভাবে সহায়তা করে।

Time and Seasonal Calender সময় ও ঋতু পঞ্জিকা

উন্নয়নের ক্ষেত্রে সময় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান অতীত হয়ে যায় এবং ভবিষ্যৎ বর্তমানে পরিণত হয়। প্রয়োজনের তাগিদে ও নিজেকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় খাপ খাওয়ানোর জন্য সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষ নিজের ও পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করে। তাই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানার জন্য বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

অনুরূপভাবে ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফসলে উৎপাদন, শ্রম চাহিদা, পেশা, আয়-ব্যয়, রোগ ইত্যাদির পরিবর্তন হয়। বর্ষাতে যা প্রয়োজন, শীতে তার প্রয়োজন নেই। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুর প্রভাবকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

POLLUTION দূষণ

Environmental Pollution পরিবেশ দূষণ

সাধারণত জীবনধারণের জন্য উপযোগী উপকরণ পরিবেষ্টিত পরিমণ্ডলকে পরিবেশ বলে। পরিবেশের উপাদান হলো বায়ু, পানি, মাটি, আলো, শব্দ প্রভৃতি। এসব মাটি, পানি, বায়ু তথ্য পরিবেশের কোনো উপাদান যখন এমন কোনো ভৌত, রাসায়নিক, জৈবিক বা তেজস্ক্রিয় পরিবর্তন ঘটে, যা

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাৎক্ষণিক বা পরবর্তী সময়ে জীবজগতের ওপর নেতিবাচক বা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে তখন ঐ অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলে।

Reasons of Environmental Pollution

পরিবেশ দূষণের কারণসমূহ

পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে হলে সকলের সর্বিক প্রচেষ্টা ও সচেতন থাকা দরকার। কারণ পরিবেশের নির্দিষ্ট কোনো সীমানা নেই। তাই সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা দরকার। নিম্নে পরিবেশ দূষণের কারণগুলো তুলে ধরা হলো:

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি : পরিবেশ দূষণের জন্য জনসংখ্যা অনেকাংশে দায়ী। অতিরিক্ত জনসংখ্যা পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার এবং সেগুলো নষ্ট করা, যা পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
২. দারিদ্র্য (Poverty) : দারিদ্র্য পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। দারিদ্র্য একটি জাতির জন্য অভিপ্ৰাণস্বরূপ। দারিদ্র্যপীড়িত জাতির কাছে কোনো ধরনের সুষ্ঠু কিছু আশা করা যায় না। জীবনধারণের লক্ষ্যে মানুষ বন কেটে উজাড় করে ফেলছে। তাছাড়া কৃষিকাজের জন্য বন কেটে ফেলছে, যা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
৩. শিক্ষার অভাব (Illiteracy) : বলা হয় “Education is the panacea for all development”। অথচ

আমাদের দেশের একটা বড় অংশ এখনো শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। আর শিক্ষার অভাবে তাদের মধ্যে সচেতনতার অভাব লক্ষণীয়। পরিবেশ দূষণ কী, এর ক্ষতিকর দিক কী ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ অজ্ঞ রয়েছে। তাই শিক্ষার অভাবে পরিবেশের সুস্থতা বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছে না।

৪. নারী সচেতনতার অভাব (Lack of Women Consciousness) : আমাদের দেশে পরিবেশ রক্ষায় নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কথা। কারণ তারা অধিকাংশ সময়ই গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত থাকে, যা পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। অথচ আমাদের দেশের নারীদের পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা খুবই কম। তারা জানে না যে, অতিরিক্ত জ্বালানি থেকে কার্বনডাই অক্সাইড (CO₂) নির্গত হয়ে পরিবেশ দূষিত হয়ে থাকে। তাছাড়া ময়লা আবর্জনার শ্রেণীবিভাগ ও ময়লা ফেলার ব্যাপারেও তারা সজাগ নয়। ফলে পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হচ্ছে।
৫. অপরিকল্পিত নগরায়ণ (Unplanned Urbanization) : আধুনিকায়নের নতুন সংযোজন হচ্ছে নগরায়ণ। আর নগরায়ণের ফলে জীবনযাত্রার মান যেমন উন্নত হচ্ছে তেমনি অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে পরিবেশের ওপর চাপ বাড়ছে। শিল্পের বর্জ্য, ধোঁয়া, গাড়ির শব্দ প্রভৃতি পরিবেশ দূষণে সহায়তা করছে।
৬. শিল্পায়ন (Industrialization) : পরিবেশ দূষণের আরেকটি অন্যতম

প্রধান উপাদান হচ্ছে শিল্পায়ন। সাধারণত সকল বড় বড় শিল্প-কারখানা কোনো না কোনো নদীর তীরবর্তী স্থানে গড়ে ওঠে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো ঐ শিল্প-কারখানার সকল বর্জ্য এসব নদীর মাধ্যমে অপসারিত হয়। মূলত প্রতিনিয়ত সকল শিল্পকারখানার বর্জ্য নদীর পানিতে ফেলার ফলে খুব সহজেই পানি দূষিত হচ্ছে। সার, কীটনাশকদ্রব্য প্রভৃতি ব্যবহার করে কৃষির উপাদান বৃদ্ধি করা হচ্ছে। যার ফলে মাটি, বায়ু, পানিসহ সমগ্র পরিবেশের উপাদানগুলো ক্রমশ দূষিত হচ্ছে।

৭. বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে চাষাবাদ: বাংলাদেশের ৮৫% লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু জনসংখ্যার চাহিদা পূরণার্থে স্বল্প জমিতে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার না করার ফলে চাষাবাদ করা হচ্ছে। ফলে পানি, বায়ু, মাটিসহ সমগ্র পরিবেশের উপাদানগুলো ক্রমশ দূষিত হচ্ছে।
৮. প্রাকৃতিক বিপর্যয় (Natural Disaster) : প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাংলাদেশের নিত্যদিনের সঙ্গী। বড়, বন্যা, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, আর্সেনিক সমস্যা প্রভৃতি আমাদের সাধারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। মাত্রাতিরিক্ত এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হচ্ছে, জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয় পরিবেশ দূষণের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

৯. পরিকল্পনাহীন আবাসন (Unplanned housing) :

আমাদের দেশে নগর পরিকল্পনার জন্য রাজউক (রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) আছে। তাছাড়া সিটি করপোরেশনও এগুলোর ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত। কিন্তু তাদের যথাযথ পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না। ফলে আকাশচুম্বী অট্টালিকা গড়ে উঠছে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত উপায়ে, যা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত হুমকিস্বরূপ। এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞগণ ভূমিকম্পের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন।

১০. পয়ঃনিষ্কাশনের অভাব (Lack of Drainage) : আমাদের দেশে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা তেমন ভালো নয়, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। এখানে অপরিকল্পিত বাড়ি নির্মাণ করার কারণে এ ব্যবস্থার অবনতি ঘটেছে। ফলে ময়লা, আবর্জনা, নর্দমা ড্রেনে জমা হয়ে পরিবেশ দূষিত করছে।
১১. নদী ব্যবস্থাপনা (River Management) : নদীমাতৃক দেশ হওয়া সত্ত্বেও যথার্থ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অভাবে আমাদের নদীগুলো নাব্যতা হারিয়ে ফেলছে। ময়লা আবর্জনা নদীতে জমা পড়ছে। এসব ময়লা আবর্জনা নদীর পানিকে দূষিত করছে, যা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বুড়িগঙ্গা নদীর অবস্থাদৃষ্টে এটা স্পষ্ট হওয়া যায়।
১২. বন উজাড়করণ (Deforestation) : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে গাছপালার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

যেকোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট ভূমির ২৫% বন থাকা আবশ্যিক। গাছপালার এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও যদি অবিবেচকভাবে বন উজাড়করণ করা হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। বস্তুত বন উজাড়করণের মাধ্যমে গাছপালার সংখ্যা কমে গেলে বৃষ্টিপাত কমে যায়। ফলে খরা এমনকি মরুভূমিরও সৃষ্টি হতে পারে।

১৩. প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় (Depletion of Natural Resources) : প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় পরিবেশ দূষণের একটা অন্যতম কারণ। এ প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় পরিবেশ দূষণের একটা অন্যতম কারণ। এ প্রাকৃতিক সম্পদ তথা তেল, গ্যাস, কয়লা, তামা প্রভৃতি পদার্থ অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। যেমন—বাংলাদেশের সুনামগঞ্জের টেংরাটিলা। টেংরাটিলায় কর্তৃপক্ষের অসতর্কতার কারণে গ্যাসক্ষেত্রে আগুন লেগে যাওয়ায় আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি মারাত্মকভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও ঘটেছে।

Air Pollution

বায়ুদূষণ

প্রাকৃতিকভাবে বা মানুষের সৃষ্ট কর্মকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর ও বিষাক্ত পদার্থের দ্বারা বায়ুমণ্ডলের দূষণকে বায়ুদূষণ বা Air Pollution বলা হয়। বায়ুদূষণ যুক্ত কোনো একটি এলাকায় বায়ুতে অবমুক্ত ক্ষতিকর পদার্থসমূহের পরিমাণ অন্যান্য স্থানের

তুলনায় অধিকতর হওয়ায় সহজেই দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ সনাক্ত করা যায়।

Source and Causes of Airpollution

বায়ুদূষণের উৎস ও কারণসমূহ

বায়ুদূষণের প্রধান উৎসসমূহ হচ্ছে গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়া, বিদ্যুৎ ও তাপ উৎপাদনকারী যন্ত্র থেকে উৎপন্ন ধোঁয়া, শিল্পকারখানা ও কঠিন বর্জ্য পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া। বায়ুদূষণের আরও একটি কারণ অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের উর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে ক্রমবর্ধমান ফাটল সৃষ্টি হওয়া। মানবজাতি, উদ্ভিদজাতি, পশুপাখি এবং জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থার ওপর এসিড বৃষ্টি সংঘটনের মাধ্যমেও বায়ুদূষণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

সাম্প্রতিককালে বিশ্বের অন্যতম স্থানের মতো এশিয়াতেও পরিবেশগত ইস্যুগুলির মধ্যে বায়ুদূষণ অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে। আমরা জানি, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক এলাকাগুলোতে বায়ুদূষণের এই সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। যদিও চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া এবং রাজশাহী অঞ্চলের নগর এলাকাগুলোতে বায়ুদূষণের স্বাস্থ্যগত প্রতিক্রিয়া ঢাকার তুলনায় কম। আশ্বস্ত হওয়ার মতো ব্যাপার এই যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় বায়ুদূষণে এখনো তেমন কোনো সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। কেননা এ সকল এলাকায় যন্ত্রচালিত গাড়ির সংখ্যা যেমন কম, তেমনি শিল্প-কারখানার সংখ্যাও অল্প। তবে ইটের ভাটা এবং রান্নার চুল্লি থেকে শহরতলি ও গ্রামীণ এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে বায়ুদূষণ ঘটছে। গ্রামাঞ্চলে

কাঠ, কয়লা এবং বিভিন্ন ধরনের জৈববস্তু জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব:

১. বায়ুদূষণের ফলে সর্বাধিক ক্ষতির শিকার হয় শিশুরা। বায়ুতে অতিরিক্ত সিসার উপস্থিতি শিশুদের মানসিক বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে।
২. ধূলিকণা থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণ হাঁপানিসহ শ্বাসযন্ত্রের অন্যান্য রোগ সৃষ্টি করে।
৩. দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট অটোরিকশাসমূহ থেকে নির্গত ধোঁয়ায় গ্রহণযোগ্য সীমার চেয়ে ৪ থেকে ৭ গুণ বেশি ভিওসি পাওয়া গেছে, যা ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী।
৪. সালফার-ডাই-অক্সাইডের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবে গাছের পাতার কোষগুলো ধীরে ধীরে মেরে ফেলে। যা উদ্ভিদের মড়ক লাগায়।
৫. ওজোন গ্যাস একটি পরিচিত উদ্ভিদ বিষ যা ফাইটোটক্সিন নামে পরিচিত। এই ওজোন গ্যাস অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ভিদে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম। ওজোন গ্যাসে স্পর্শে পাতার উপরিতলে সাদা বা বাদামি অতি সরু ডোরা দাগের সৃষ্টি করে।
৬. উদ্ভিদের ওপর গ্যাসীয় হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের খারাপ প্রভাব সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত এবং পাতা ও কাণ্ডে ক্ষতের সৃষ্টি করে।
৭. বায়ুতে ওজোন গ্যাসের সংক্রমণে কুকুর, বিড়াল ও খরগোশের ফুসফুসীয় কলার পরিবর্তন, স্ফীতি এবং রক্তক্ষরণ ঘটে। ফলে এসব প্রাণী রোগে ভোগে এবং অবশেষে মারা যায়।
৮. আর্সেনিক একটি বিষাক্ত যৌগ বা

কয়লা এবং ধাতব আকরিকে অশুদ্ধি হিসেবে উপস্থিত থাকে। এর প্রভাবে প্রাণীদেহে নানারকম রোগ দেখা যায়।

Air Pollution Controlling Measures

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ

Legal Measures

আইনসম্মত উপায়

- নতুন শিল্পায়ন ও নগরায়ণের পূর্বে উপযুক্ত স্থান ও পরিমণ্ডল নির্ধারণ করা এবং এক্ষেত্রে সরকারের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অনুমোদন বাধ্যতামূলক হওয়া।
- সকল শিল্পের আধুনিকীকরণ এবং উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন অটোমোবাইল ইঞ্জিনের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।
- সচল ও স্থির উৎস থেকে বায়ুতে নিক্ষেপ্ত দূষকের স্থানবিশেষ ‘অনুমোদনযোগ্য সীমা’ বা নিক্ষেপ মান’ নির্ধারণ করা। আর এ ক্ষেত্রে অবশ্যই নিক্ষেপ মানের বেশি নিক্ষেপকারীকে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধের আওতায় আনা।
- শিল্পজাত ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থ এবং নিয়ন্ত্রণ সজ্জা নিক্ষেপিত জৈব বা অজৈব বিষাক্ত পদার্থের উপযুক্ত প্রক্রিয়াকরণ।
- প্রত্যেক শিল্প-কারখানায় এবং অটোমোবাইল ইঞ্জিনে দূষণ নিয়ন্ত্রণসজ্জার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।

Technological Means

প্রযুক্তিগত উপায়

বস্তুত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি প্রযুক্তিগত উপায় অবলম্বন করা হয়।

যথা-

১. **নিয়ন্ত্রণসজ্জার ব্যবহার :** ফিল্টার (Filters), সাইক্লোন (Cyclones), ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটর (Electrostatic Precipitator), স্ক্রাবার (Scrubber) ইত্যাদির ব্যবহার।
২. **পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ :** বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণসজ্জার পরিবর্তন, ক্রিয়াপ্রণালির পরিবর্তন।

Personal Means

ব্যক্তিগত উপায়

১. সকল শক্তির উৎসের সংরক্ষণের দ্বারা বায়ুদূষণ হ্রাস করা সম্ভব। আর এ ক্ষেত্রে পুনরাবর্তন কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং চাহিদা হ্রাস সংরক্ষণ কৌশলের অন্যতম উপায়।
২. সাধারণত কোনো অপ্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন এবং ব্যবহার শক্তি সম্পদের সংরক্ষণ হ্রাস করে, ফলে দূষণের বৃদ্ধি ঘটে। এজন্য অপ্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন এবং ব্যবহার বন্ধ করে বায়ুদূষণ হ্রাস করা যায়।
৩. অপচয় হ্রাস করার মাধ্যমে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

Water Pollution

পানিদূষণ

সাধারণত জীবের ওপর মন্দপ্রভাব সৃষ্টিকারী পানির যেকোনো ভৌত বা রাসায়নিক পরিবর্তনকে পানিদূষণ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, ভৌত, রাসায়নিক ও জীবাণুঘটিত মিশ্রণের ফলে নিরাপদ ও হিতকর ব্যবহারের ক্ষেত্রে পানি অনুপযোগী বা অপেক্ষাকৃত

অনুপযোগী হয়ে পড়ে। জীবাণু সংক্রমণজনিত দূষণ এবং পানির স্বাভাবিক গুণাগুণ বিনষ্টকারী উপাদানের সংমিশ্রণজনিত দূষণকে সম্মিলিতভাবে পানির দূষণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ পানি দূষণের ফলে পানির প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পানি দূষণের লক্ষণ সুস্পষ্ট। যেমন- পানীয় জলের তিক্ত স্বাদ, জলাশয়, নদী ও সমুদ্রতীর থেকে আসা দুর্গন্ধ, জলাশয়ে জলজ আগাছার অবাধ বৃদ্ধি ভূপৃষ্ঠের ওপরের জলাশয়ে জলচর প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া, পানির ওপর ভাসমান তৈল ও তৈলাক্ত পদার্থ, সমুদ্র দূষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পানিদূষণের কারণ

১. **নর্দমার ময়লা-আবর্জনা :** পানিদূষণের প্রধান উৎস হলো নর্দমার আবর্জনা। একসময় ছিল যখন সমস্ত নর্দমার আবর্জনা সরাসরি নদী বা সাগরে নিক্ষেপন করা হতো। যার ফলে নদী ও সাগরের পানি দূষিত হতো এবং সেসব এলাকায় জলজ প্রাণীর বেঁচে থাকার ভারসাম্য অবস্থা নষ্ট হয়ে যেত।
২. **শিল্প-কারখানার বর্জ্য :** শিল্প-কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য পানির সঙ্গে মিশে পানিকে দূষিত করে। শিল্পজাত জৈব আবর্জনার অধিকাংশ নির্গত হয় খাদ্য, চিনি মণ্ড, কাগজ ও চামড়া কারখানা থেকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় সকল শিল্প-কারখানা কোনো না কোনো নদী বা সাগরের তীরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া উন্নত বিশ্বে শিল্প-কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য সমুদ্রের পানিতে নিক্ষেপন করা হচ্ছে।

৩. **রাসায়নিক সার :** বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। সেজন্য এ দেশের কৃষকেরা কৃষিজমিতে অধিক ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে ও মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে। আর এ রাসায়নিক সার বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে কৃষিজমি থেকে নদী-নালা এমনকি সাগরের পানিকেও দূষিত করে।

৪. **কীটনাশক :** কৃষিজমিতে আগাছানাশক ও নানান জাতীয় পোকামাকড় ধ্বংসের উদ্দেশ্যে বহু ধরনের কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। এ কীটনাশক পদার্থ পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে।

৫. **অজৈব রাসায়নিক পদার্থ :** প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রকার অজৈব রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। এসব অজৈব রাসায়নিক পদার্থ হলো খনি ও কল-কারখানার আবর্জনা, সিসা, পারদ, দস্তা, তামা, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, মলিবডেনাম ইত্যাদি। এসব অজৈব রাসায়নিক পদার্থ পানিতে মিশে পানির ক্ষারত্ব বাড়িয়ে দেয় এবং পানিকে দূষিত করে।

৬. **ডিটারজেন্ট :** পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকারী উপাদান তথা ডিটারজেন্ট বা সাবান পানিকে দূষিত করে। বস্ত্রত বাড়িঘর ও শিল্পকারখানার ব্যবহৃত বিভিন্ন ডিটারজেন্ট পানিতে ফেনা তৈরির মাধ্যমে একে ব্যবহারের অনুপযোগী বা দূষিত করে দেয়।

৭. **তেল নিঃসরণ :** তেল নিঃসরণের মাধ্যমে পানি দূষিত হয়। বিশেষ করে, তেলবাহী জাহাজ যখন সমুদ্রে ডুবে যায়

তখন এ দূষণ ঘটে থাকে।

৮. **পলি ও তলানি :** মানুষের প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ নিধন করা হচ্ছে। এ সকল বৃক্ষনিধনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়, নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। তাছাড়া বৃক্ষনিধনের কারণে সেখানকার মাটি গিয়ে নদীতে পড়ে পলি ও তলানি সৃষ্টি করে এবং তা পানিকে দূষিত করে।

৯. **তেজস্ক্রিয় পদার্থ :** তেজস্ক্রিয় পদার্থও পানিকে দূষিত করে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিভিন্ন কারণে পানির সঙ্গে মিশে। বিশেষ করে, তেজস্ক্রিয় ধাতুর খনি থেকে, শোধন কেন্দ্র থেকে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে, পারমাণবিক চুল্লি থেকে নির্গত হয়। এগুলো পানির সঙ্গে মিশে পানিকে দূষিত করে।

১০. **উষ্ণ পানি :** বিভিন্ন কারণে পানি উষ্ণ বা গরম হয়। সাধারণত বিদ্যুৎকেন্দ্র, পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র, ইস্পাত কারখানা, তেল শোধনাগার ইত্যাদি যন্ত্রপাতিতে ঠাণ্ডা রাখার জন্য পানি ব্যবহার করা হয়। এ সময় পানি অত্যধিক গরম বা দূষিত হয়।

১১. **ভূগর্ভস্থ পানিদূষণ :** ভূগর্ভস্থ পানি ভূপৃষ্ঠের দূষণ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়। অসংখ্য প্রাকৃতিক ও মানুষের বিভিন্ন ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড ভূগর্ভস্থ পানিদূষণ ঘটাবে। উল্লেখযোগ্য- সংখ্যক পদার্থগত রাসায়নিক ও প্রাক রাসায়নিক প্রক্রিয়া ভূগর্ভস্থ পানির ধর্মসমূহ পরিবর্তিত করেছে, হয় নতুন উপাদান সংযুক্তির মাধ্যমে অথবা বর্তমান কেন্দ্রীভবনের মাত্রা বৃদ্ধির

মাধ্যমে। বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণের বিষয়টি আবিষ্কারের পূর্বে ভূ-গর্ভস্থ পানি নিরাপদ হিসাবে বিবেচিত হতো, কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীতে আর্সেনিককে পানিদূষণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পানিদূষণের প্রভাব

পরিবেশ দূষণের অন্যতম নিয়ামক হলো পানিদূষণ। পানিদূষণের প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক। নিম্নে পানিদূষণের প্রভাবসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **মানুষের ওপর প্রভাব :** মানুষের ওপর পানিদূষণের প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক। পানিদূষণের কারণে বিভিন্ন রোগব্যাদি সৃষ্টি হয়। এসব রোগব্যাদির মধ্যে রয়েছে টাইফয়েড, আমাশয়, পোলিও, হেপাটাইটিস, স্কাবিস ইত্যাদি। এছাড়াও পানিদূষণের কারণে নানারকম চর্মরোগ হয়।
২. **মাছ ও জলজ প্রাণীর ওপর প্রভাব :** পানিদূষণ মাছ ও জলজ প্রাণীর ওপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। পানিদূষণের ফলে পানিতে অক্সিজেন কমে যায়। ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মারা যায়।
৩. **উদ্ভিদ ও গাছপালার ওপর প্রভাব :** পানিদূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব উদ্ভিদ ও গাছপালার ওপরও কম নয়। পানি দূষিত হলে সে পানিতে উদ্ভিদ জন্মে না, এমনকি পানিদূষণের ফলে উদ্ভিদ ও গাছপালা মারা যায়।
৪. **কৃষির ওপর প্রভাব :** পানিদূষণের ফলে কৃষির ওপরও নেতিবাচক প্রভাব

পড়ে। পানিদূষণের কারণে কৃষিতে ফলন কম হয় এবং ফসলও নষ্ট হয়। কৃষির ওপর পানিদূষণের প্রভাব বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ

‘বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন।’ সুতরাং এ পানি দূষিত হলে তা মানবজাতির অস্তিত্বে হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, পানিদূষণ রোধ করা অত্যন্ত জরুরি। বিভিন্ন উপায়ে পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যেমন— নদী বা সাগরে পতিত হওয়ার পূর্বে পয়োনিকশিত পানি থেকে বিভিন্ন জীবাণু ও দূষণ শোষণের জন্য সেপটিক ট্যাঙ্ক, জারজ ট্যাঙ্ক, ফিল্টার বেড, বর্জ্য পানি শোধন কেন্দ্র এবং পৌর আবর্জনা শোধন কেন্দ্র নির্মাণ করা, গৃহস্থালী ও পৌর আবর্জনা ফেলা এবং অপসারণের জন্য উন্নত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা; প্রচারমাধ্যমগুলোতে পানিদূষণের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাও; কুলিং টাওয়ার এবং স্প্রেড পন্ড নির্মাণের মাধ্যমে তাপজনিত দূষণ রোধ এবং একই পানি যাতে বারবার ব্যবহার করা যায় তার ব্যবস্থা করা; দূষণ-সম্পর্কিত আইনের সঠিক ও কঠোর প্রয়োগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সংশোধন করা; যত দূর সম্ভব শিল্প-কারখানাগুলো নদীর তীরবর্তী এলাকা থেকে দূরে স্থাপন করা।

পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

পানিদূষণ একটি অন্যতম পরিবেশগত সমস্যা। পানিদূষণ মানব-অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ। এজন্য এটির ব্যাপকতা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। শব্দদূষণ, বায়ুদূষণের মতো পানিদূষণকেও আইনগত, প্রযুক্তিগত এবং ব্যক্তিগত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ

করা যায়। নিম্নে পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণের আইনগত উপায়

বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন ব্যবস্থা রয়েছে। সাধারণত পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন বলতে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে পৌরসংস্থা নিঃসৃত আবর্জনা নিয়ন্ত্রণ এবং শিল্প সংস্থা থেকে নদীতে নিঃসৃত আবর্জনার পরিমাণ হ্রাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বোঝায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভূগর্ভের পানি সংরক্ষণ এবং গুণগত মান নির্দিষ্টকরণের জন্য ১৯৮৬ সালে ‘পানীয় জল আইন’ নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। তাছাড়া বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতও ১৯৭৭ সালে ‘পানিদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ’ আইন নামে একটি কার্যকরী আইন প্রণয়ন করে। পাশাপাশি বাংলাদেশেও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। বস্তুত এসব দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনের দ্বারাও সঠিক ও সার্বিকভাবে পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি। বর্তমানে প্রতিটি দেশের ভূগর্ভের পানি সংরক্ষণের জন্য অ্যাকুইফার ম্যাপিং আবশ্যিক এবং এ অ্যাকুইফার অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের শিল্পায়ন নিষিদ্ধ করা উচিত।

সাধারণত আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টের প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বহির্ভাগ পৃষ্ঠের এবং ভূগর্ভের পানি গুণগত মান বৃদ্ধি করা যায়। এ ক্ষেত্রে পৌর সংস্থা, হাসপাতাল, স্কুল ও শিল্প সংস্থা থেকে নিঃসৃত দূষক যেমন— মানুষের মলমূত্র, কাগজ, সাবান, ডিটারজেন্ট, ক্ষুদ্র বস্তুখণ্ড, জীবাণু প্রভৃতি নির্গম পথ বা পয়ঃপ্রণালির মাধ্যমে সরকারি

নদী বা সমুদ্রে না ফেলে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টে প্রক্রিয়াকরণ করা হয় বা আবর্জনামুক্ত করা হয়। বস্তুত তিনটি পর্যায়ক্রমিক ধাপে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টের আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

ক. প্রথম পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণ : এ পর্যায়ে আবর্জনায়ুক্ত পানিতে পর্যায়ক্রমে ঝাঁঝারি ও পর্দার মধ্য দিয়ে অগ্রসর করানো হয়। ফলে আবর্জনা বা বস্তু প্রথম পর্যায়েই পৃথক হয়। বালি, কাদা ও অন্যান্য শক্ত বস্তু গ্রিট কক্ষে এবং শক্ত জৈব বস্তু বা স্লাজ সেটলিং ট্যাঙ্কে থিতুয়ে পড়ে।

খ. দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণ : প্রক্রিয়াকরণের এই পর্যায়ে জৈবিক উপায়ে জৈব বস্তুকে বিশ্লেষিত করা হয়। প্রথম পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণ সৃষ্ট স্লাজকে একটি বড় ট্যাঙ্কে পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে ট্যাঙ্কে অবস্থিত বায়বীয় ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য বিশ্লেষক জীবের দ্বারা স্লাজ বিশ্লেষিত হয়। বস্তুত অধিকাংশ পৌর সংস্থা এবং শিল্প সংস্থা নিঃসৃত আবর্জনার দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণের পর প্রাপ্ত জীয়ে অংশকে একটি বৃহৎ ট্যাঙ্কে ক্লোরিনেশন করা হয়। ফলে প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া এবং প্রটোজোয়া মারা যায়। এ ক্লোরিনেশনের পর জলীয় অংশকে নির্গম নলের সাহায্যে নদী বা সমুদ্রে নির্গত করানো হয়।

গ. তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণ : দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণের পরও নিঃসৃত জলে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ উপস্থিত থাকতে পারে। এ রাসায়নিক পদার্থের অপসারণের জন্য দ্বিতীয় পর্যায় প্রক্রিয়াকৃত জলীয়

অংশকে তৃতীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ করে পানিকে নদী বা সমুদ্রে ফেলা হয়। যদিও তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণ ক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুবই ব্যয়সাপেক্ষ, তথাপি বিশেষ কয়েকটি প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণ স্বীকৃত এবং সমাদৃত হয়েছে। যেমন দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণের পর নিঃসৃত পানিকে নদী বা সমুদ্রে ফেলার পূর্বে পুকুরে ধরে রাখা হয়। এক্ষেত্রে পুকুরে জন্মানো শৈবাল ও কচুরিপানা পুকুরের পানি থেকে নাইট্রোজেন এবং ফসফেট সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে।

ব্যক্তিগত উপায়ে পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ

আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং প্রযুক্তিগত উপায় ছাড়াও ব্যক্তিগত সদচ্ছার দ্বারাও পানিদূষণ হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নিম্নে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হলো :

- ক. জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ বা পরিবারের সদস্যসংখ্যা এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থের ব্যবহার হ্রাস করে পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ কমানো যায়।
- খ. পানিদূষণ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার হ্রাস করার মাধ্যমেও পানি দূষণ করা যায়।
- গ. কম্পোস্টিং টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে পানির দূষণ রোধ সম্ভব।
- ঘ. রাসায়নিক সার, পেস্টিসাইড, ডিটারজেন্ট এবং অন্যান্য রাসায়নিকের বিধিনিষেধের মাধ্যমেও দূষণ রোধ ব্যক্তিগত স্তরে সম্ভব। তা ছাড়া এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কম ফসফেটযুক্ত বা ফসফেটবিহীন ডিটারজেন্ট বস্ত্র

ধৌতকরণের কাজে ব্যবহার করা উচিত। কারণ এর ফলে পানিতে দূষণের মাত্রা কম হয়।

Sound Pollution

শব্দদূষণ

পরিবেশ শ্রুতিসীমা বা সহন ক্ষমতা বহির্ভূত অপেক্ষাকৃত উচ্চ তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতাসম্পন্ন সুরবর্জিত শব্দের উপস্থিতিতে জীব পরিবেশ তথা মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর যে অসংশোধনযোগ্য ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয় সেই পরিবেশসংক্রান্ত ঘটনাকে শব্দদূষণ বলে। বাস, লরি এবং ট্রেনের হর্নের শব্দ, বিমান ওড়ার শব্দ, মেঘগর্জন কিংবা বজ্রপাতের শব্দ, মাইকের শব্দ ইত্যাদি সুরবর্জিত শব্দই শব্দদূষণের অন্যতম প্রধান কারণ।

শব্দদূষণের উৎসসমূহ

একক কোনো উৎস বা কারণকে কেন্দ্র করে শব্দদূষণের সৃষ্টি হয় না। এর পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। তবে অনুমান করা হয় শব্দদূষণ সৃষ্টির জন্য মনুষ্যসৃষ্ট কারণই বেশি দায়ী। নিম্নে সংক্ষেপে শব্দদূষণের উৎসসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. **প্রাকৃতিক উৎস** : প্রাকৃতিকভাবেও শব্দদূষণ সৃষ্টি হয়। শব্দদূষণের প্রাকৃতিক শব্দদূষণ সৃষ্টি হয়। শব্দদূষণের প্রাকৃতিক উৎসের মধ্যে রয়েছে বজ্রপাতের ফলে শব্দদূষণ, মেঘের গর্জন ইত্যাদি।
২. **মনুষ্যসৃষ্ট উৎস** : মানুষও শব্দদূষণের জন্য কম দায়ী নয়। বস্ত্ত গাড়ির হর্ন, ট্রেনের হুইসেল, মানুষের উচ্চ স্বরে কথা বলার শব্দ, মাইকের শব্দ, বিমান

উড্ডয়নের শব্দ, আতশবাজির শব্দ, কারখানার মেশিন চলার শব্দ প্রভৃতি মানুষসৃষ্ট শব্দের কারণে শব্দদূষণের সৃষ্টি হয়।

Causes of Sound Pollution

শব্দদূষণের কারণ

বিভিন্ন কারণে শব্দদূষণের সৃষ্টি হচ্ছে। শব্দদূষণ যেমন প্রাকৃতিকভাবে হয় তেমনি মানবসৃষ্ট কারণেও হয়ে থাকে। তাই একক কোনো কারণকে শব্দদূষণের জন্য দায়ী করা ঠিক হবে না। বরং শব্দদূষণের জন্য একাধিক কারণ দায়ী। নিম্নে শব্দদূষণের প্রধান প্রধান কারণগুলো আলোচনা করা হলো :

১. **পরিবহণ** : পরিবহণ শব্দদূষণের প্রধান কারণ। শহর অঞ্চলের রাস্তাঘাটে বিভিন্ন ধরনের বাস, ট্রাক, লরি, মোটরসাইকেল চলাচল করে। এসব যানবাহনের ইঞ্জিনের শব্দে শব্দদূষণ ঘটে। এ ছাড়াও নদী ও সমুদ্রপথে জাহাজ বা নৌযান চলাচল করে। শহরের রাস্তাঘাটে, ট্রাফিক মোড়ে, হাসপাতাল-সংলগ্ন রাস্তা, শিক্ষাঙ্গন এলাকায় বেশি শব্দদূষণ হয়। তবে শহরের তুলনায় গ্রামে শব্দদূষণের হার কম। শহরের রাস্তাঘাটে যানবাহনের হর্নও শব্দদূষণ সৃষ্টি করে থাকে।
২. **শিল্পায়ন প্রক্রিয়া** : বর্তমান যুগ শিল্পায়নের যুগ। শিল্পায়নের যুগে ব্যাপক হারে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব শিল্প-কারখানার যান্ত্রিক শব্দও শব্দদূষণের জন্য দায়ী। শিল্প-কারখানার শব্দ শিল্পশ্রমিক ও আশপাশের জনবসতির ওপর প্রভাব

বিস্তার করে। যান্ত্রিক শব্দদূষণ একটানা বেশিক্ষণ চলতে থাকে বলে তা বেশি ক্ষতিকর।

৩. **যান্ত্রিক ক্রিয়া** : যান্ত্রিক ক্রিয়াও শব্দদূষণের জন্য কম দায়ী নয়। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ ও সামাজিক উৎসবে জেনারেটর ব্যবহার করা হয়। এ জেনারেটর হতে উচ্চমাত্রার শব্দ সৃষ্টি হয়। ফলে শব্দদূষণের হার বেড়ে যায়। বাদ্যযন্ত্রও এক ধরনের শব্দদূষণ সৃষ্টি করে।
৪. **আকাশ পরিবহণ** : আধুনিক যুগে আকাশ পরিবহণের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এসব আকাশ পরিবহণও শব্দদূষণের জন্য দায়ী। আকাশে বিমান, জেট বিমান, কনকর্ড বিমান চলাচল করে। এসব বিমান উচ্চ মাত্রার শব্দ সৃষ্টি করে। ফলে শব্দদূষণ সৃষ্টি হয়।
৫. **কথোপকথন** : মানুষ যখন উচ্চ স্বরে কথা বলে তখনো শব্দদূষণের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে, একসঙ্গে যখন অনেক লোক কথা বলে তখন শব্দদূষণের সৃষ্টি হয়। হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কেটগুলোতে এ ধরনের শব্দদূষণ পাওয়া যায়। পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি শব্দদূষণের সৃষ্টি করে। হাট-বাজারে কথোপকথনের মাধ্যমে শব্দদূষণের সৃষ্টি হয়।
৬. **সামাজিক কারণ** : শব্দদূষণের সামাজিক কারণও রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উৎসব, যেমন- বিয়ে, পূজা, খেলাধুলার সময় অনেক লোক জমায়েত হয়। একসঙ্গে অনেক

লোক কথা বললে শব্দদূষণ হয়। এসব অনুষ্ঠানে মাইক বাজানো হয়। মাইক বাজালে শব্দদূষণের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও মিছিল-মিটিংয়ের মাধ্যমেও শব্দদূষণ হতে পারে।

Sea Pollution

সমুদ্রদূষণ

পানিদূষণের অন্যতম স্বরূপ ও প্রকৃতি হচ্ছে সমুদ্রদূষণ। সাধারণত নদী ও সমুদ্রে অনেক ধরনের যান চলাচল করে। এসব নৌযানে ব্যবহৃত জ্বালানি নদী বা সমুদ্রে পড়লে খুব সহজেই পানি দূষিত হয়। যেসব কারণে সমুদ্র দূষিত হয় সেসব কারণ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. নৌযানের তেল নিঃসরণ : বিভিন্ন নদী ও সমুদ্রে যেসব নৌযান চলাচল করে তাদের জ্বালানি হিসেবে পেট্রোল, ডিজেল, পিচ্ছিলকারক তেল, গ্রিজ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। প্রোপেলার, ইঞ্জিন, টারবাইন প্রভৃতির আধার, পাইপলাইন, অয়েল মিল, বিয়ারিং প্রভৃতি থেকে তেল নিঃসরণের মাধ্যমে নদী বা সমুদ্রের পানিতে পড়ে পানি দূষিত করে। এক জরিপে দেখা গেছে, সমুদ্রদূষণের শতকরা ৫০ ভাগ জ্বালানি ও পিচ্ছিলকারক তেল দ্বারা সংঘটিত হয়। বাংলাদেশে বুড়িগঙ্গা নদী ও চট্টগ্রাম বন্দর উপকূলবর্তী এলাকার পানি এ কারণে দূষিত হচ্ছে।
২. ট্যাঙ্কারের তেল নিঃসরণ : বিশ্বের অধিকাংশ দেশের প্রয়োজনীয় তেল আমদানি করতে হয় আরব তথা মধ্যপ্রাচ্যের দেশ থেকে। আর এসব

তেলের অধিকাংশ নদীপথ জাহাজের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়। এমতাবস্থায়, এসব তেলবাহী জাহাজ বিভিন্ন দুর্ঘটনা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস তথা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনের কবলে পড়লে খুব সহজেই জাহাজে রক্ষিত তেল সমুদ্রে পতিত হবে। ফলে এ তেল দ্বারা সমুদ্রদূষণ ঘটবে।

৩. ব্যালাস্ট পানি : লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ প্রভৃতির পাটাতনের নিচে পানির মধ্যে জ্বালানি তেল ও মবিল ধোয়া পানি জমা হয়। পরবর্তী সময়ে নৌযানসমূহ বন্দর ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে এ পাটাতনের নিচের পানি নিষ্কাশন করে। এ নিষ্কাশিত পানিকে ব্যালাস্ট পানি বলে। বিশ্বের অনেক জাহাজ কারখানায় এ ব্যালাস্ট পানি সমুদ্রে ফেলার অনুমতি নেই। কিন্তু বাংলাদেশে অলিখিতভাবে হলেও এ পানি সমুদ্রে ফেলার অনুমতি আছে। ফলে ব্যালাস্ট পানি দ্বারা সমুদ্রদূষণ ঘটে।
৪. বিলোজ পানি : সাধারণত বিলোজ বলতে জাহাজের প্রশস্ত ইঞ্জিন কক্ষকে বোঝায়। অধিকাংশ সময় এ বিলোজ কক্ষের মেঝেতে জ্বালানি, মবিল, গ্রিজ পানির সঙ্গে মিশে জমা হয়। এ পানি অধিক জমে গেলে তা সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয়। ফলে এ বিলোজ পানি দ্বারা খুব সহজেই সমুদ্রের পানি দূষিত হয়। এসব বিলোজ পানি নদী বা সাগরে ফেলে না দিলে জ্বালানি, মবিল ও গ্রিজের যোগান বৃদ্ধি পেত; পানিদূষণ রোধ হতো এবং অধিক হারে জলজ প্রাণীর জীবননাশ হতো না।

৫. জাহাজে জমাকৃত বর্জ্য : লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজের ডেক, গুদাম প্রভৃতিতে বিভিন্ন জিনিসপত্র ওঠানো হয়। যেমন- শাকসবজি, খাদ্যশস্য, সিমেন্ট, সার ইত্যাদি। এসব দ্রব্যের ছেঁড়া বস্তা, উচ্ছিষ্ট খাবার, বাসি ও পচা খাবার, পচা ফলমূল প্রভৃতি একসঙ্গে জমা হলে তা নদী বা সমুদ্রে ফেলা হয়। এগুলোর মধ্যে জলজ প্রাণী কিছু খেয়ে ফেলেও পচা দ্রব্য, টয়লেট থেকে পতিত মলমূত্র ইত্যাদি দ্বারা পানি দূষিত হয়। তবে জাহাজে জমাকৃত এসব বর্জ্য সমুদ্রে না ফেলে তা মাটিতে গর্তের মধ্যে নিষ্কাশন করলে সমুদ্রদূষণের সৃষ্টি হতো না।

৬. রাসায়নিক পদার্থ অপসারণ : চামড়া, সার, সিমেন্ট, কাগজের কল প্রভৃতি থেকে যে তরল বর্জ্য নিঃসৃত হয়, তা অনেক সময় নদী, জলাশয় অথবা সাগরে অপসারণ করা হয়। এ ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা নদী বা সাগরের পানি দূষিত হয় এবং বহু জলজ প্রাণী মারা যায়। তবে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা হতে নির্গত এ বর্জ্য পদার্থ যদি বিশোধন করে ছাড়া হয়, তাহলে নদী কিংবা সমুদ্রের পানি দূষিত হতো না।

৭. জাহাজের ভাঙা যন্ত্রাংশ : সাধারণত বৈরী আবহাওয়ায় নদী বা সমুদ্রে লঞ্চ, স্টিমার ও জাহাজ নিমজ্জিত হলে তা ওঠাতে গেলে এটির যন্ত্রাংশ ভেঙে যায়। আবার পুরাতন জাহাজ ভেঙে বা কেটে অন্যান্য ছোট নৌযান প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু ডুবন্ত বা ভাঙা জাহাজের

অনেক জিনিসই পরিত্যক্ত থেকে যায়। পুরাতন জাহাজের যন্ত্রাংশ পানিতে ভাসতে থাকলে তার সঙ্গে তেল পদার্থ ভাসতে দেখা যায়। বস্তুত এভাবেও পানি দূষিত হয়।

Industrial Pollution

শিল্পদূষণ

কারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত দ্রব্য বা বিষাক্ত বর্জ্য থেকে পরিবেশের অবক্ষয় ঘটে। বাংলাদেশে শিল্পখাত থেকে অর্জিত জিডিপি ২০ শতাংশের মধ্যে কারখানা শিল্পের অংশ ১১%। প্রধানত তৈরি পোশাক, বস্ত্র, চামড়া ও অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পপণ্য উৎপাদক খাতসমূহে এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শক্তিশালী শিল্পখাতের বিকাশ কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির নিরিখে লাভজনক হলেও এগুলোর কারণে পরিবেশের অবক্ষয় ঘটে থাকে।

Persistent Organic Pollutants (POPs)

দীর্ঘস্থায়ী জৈব রাসায়নিক দূষক

দীর্ঘস্থায়ী জৈব রাসায়নিক দূষক (Persistent Organic Pollutants) বা পপস (POPs) হলো এক শ্রেণীর বিষাক্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থ, যা পরিবেশে দীর্ঘকাল অবস্থান করে মানুষ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম। ২০০১ সালে স্টকহোমে পৃথিবীর ১৫১টি দেশ একত্রে মিলিত হয়ে ১২টি ক্ষতিকর দীর্ঘস্থায়ী জৈব দূষক (পপস) চিহ্নিত করে এবং পরিবেশ থেকে অপসারণ বা হ্রাস ঘটানোর জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এগুলোই 'ডার্ট

ডজন' হিসেবে অবহিত। নিচে এই 'ডার্টি ডজন'-এর নাম ক্যাটাগরি অনুসারে উল্লেখ করা হলো-

ক. অর্গানোক্লোরিন বালাইনাশক: অলড্রিন (Aldrin) ডায়েলড্রিন (Dieldrin) ক্লোরডেন (Chlordane), এনড্রিন (Endrin), হেপ্টাক্লোর (Heptachlor) ডিডিটি (DDT), মাইরেক্স (Mirex), টক্সাফেন (Toxaphene), হেক্সাক্লোরোবেনজিন

খ. শিল্পজাত রাসায়নিক পদার্থ: পলিক্লোরিনেটেড বাই-ফিনাইল বা পিসিবি
গ. অসম্পূর্ণ দহন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অনিচ্ছাকৃত উপজাত পদার্থ : ডাইঅক্সিন, ফিউবান

এসব রাসায়নিক দূষক মানুষের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমেই কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি হয় ও পরিবেশে প্রবেশ করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এগুলো একবার পরিবেশে প্রবেশ করলে তা খুব সহজে বিনষ্ট না হয়ে দীর্ঘসময় অবস্থান করে। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো এগুলো কেবল একটি নির্দিষ্ট স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। যেহেতু এসব রাসায়নিক পদার্থ পানিতে গলে না বা মাটি, তলানি বা সেডিমেন্ট বাতাস ও বায়োটাতে সহজে ভাঙে না, সেহেতু এগুলো পরিবেশে পরিবাহিত হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত (বায়ু, পানি বা ভ্রমণকারী প্রাণীর মাধ্যমে) চলে যায় এবং উৎস স্থল থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে জমা থাকে। মূলত এ কারণেই বিশ্বের যেসব স্থানে আদৌ পপস উৎপাদন করা হয়নি বা কখনও করাও হয়নি সেসব স্থানেও পপস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মোট কথা পৃথিবীর মানুষ বসতিপূর্ণ প্রায় সব

মহাদেশেই পপস বিরাজমান।

Soil Pollution মাটিদূষণ

মাটি হচ্ছে ভূত্বকের উপরিভাগের একটি পাতলা আবরণ। মাটির বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে কৃষিব্যবস্থা। বাংলাদেশের মাটি স্তরে স্তরে গঠিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো অবলম্বিত বৈশিষ্ট্যের। প্রতিবছর বন্যার ফলে মাটিতে নতুন নতুন স্তর সঞ্চিত হতে থাকে, আবার পুরনো স্তরগুলোর বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তন বা রূপান্তর আসে। ব্যবস্থাপনার অভাবে ইদানীং বাংলাদেশে মাটিদূষণ একটি গুরুতর বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। মাটির উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস ছাড়াও মাটিদূষণের আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে ভূমিক্ষয় যা মাটির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায় এবং বন্ধনকে দুর্বল করে। উপরন্তু, গাছ, মাটির উপরের ঘাস ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ আবরণ (যা মাটিকে নির্দিষ্ট জায়গায় ধরে রাখে) সেগুলো অপসারিত বা ধ্বংস হলে মাটি ক্ষয়ের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টির পানিতে মাটি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে।

Radiation Pollution তেজস্ক্রিয়তা দূষণ

এটি হচ্ছে মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এক ধরনের অদৃশ্য দূষণ। ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয়তার অধিকাংশই বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ, বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক সামগ্রী থেকে বিকিরিত হয়।

স্বল্পমাত্রার তেজস্ক্রিয়তা মানবদেহের ওপর কতটা প্রভাব ফেলে তা এখনো জানা যায়নি। তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা REM একক পরিমাপ করা হয় :

- ১ রেম = ১০,০০০ জনের মধ্যে ১ জনের সম্ভাব্য ক্যান্সারজনিত মৃত্যু;
- শূন্য থেকে ২০০ রেম = ক্যান্সারের ঝুঁকি অধিক;
- ৩০০ থেকে ৫০০ রেম = তেজস্ক্রিয়তাজনিত রোগে মৃত্যু।

বিশ্ব জুড়ে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য অপসারণের সমস্যা জনসমাজে গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। তেজস্ক্রিয় বর্জ্য গভীর সমুদ্রে নিষ্ক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে, যা সমুদ্রের চারপাশে বসবাসরতদের জন্য একটি বড় আতঙ্কের বিষয়। বিশেষ করে, বঙ্গোপসাগরে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিষ্ক্ষেপের ঘটনায় দক্ষিণ এশিয়াসহ ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের উদ্বেগ বেড়েছে। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ফলে সৃষ্ট দূষণ বিশ্বব্যাপী মানুষের আতঙ্ক ও উদ্বেগের কারণে পরিণত হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে মানবজাতিও প্রাণিজগতের নিরাপত্তার স্বার্থে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

HSU-Hartridge Smoke Unit এইচএসইউ

মোটরযান থেকে নির্গত পরিবেশ দূষণকারী ধোঁয়া পরিমাপের একক। পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশের জন্য কালো ধোঁয়া নির্গমনের গ্রহণযোগ্য সীমা নির্ধারণ করেছে ৬৫ এইচএসইউ। এর অধিক মাত্রায় ধোঁয়া নির্গত হলে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

RAINFALL বৃষ্টিপাত

Rainfall বৃষ্টিপাত

বৃষ্টিপাত নির্ভর করে ঋতু এবং মহাকাশগত অবস্থার ওপর। বাংলাদেশে শীত মৌসুম (নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) খুবই শুষ্ক। এ সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাৎসরিক সর্বমোট বৃষ্টিপাতের ৪ শতাংশের নিচে থাকে।

বাংলাদেশে বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাতের ১০-২৫% হয় বর্ষাপূর্ব উষ্ণ মৌসুমে (মার্চ-মে), যা এ সময়ে সৃষ্ট বজ্রপাত অথবা বায়ুকোণ থেকে আগত কালবৈশাখীর অনুষ্ণ হিসেবে ঘটে থাকে। এ মৌসুমে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেশের পশ্চিম-কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ২০০ মিমি এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ৮০০ মিমি। মেঘালয় পর্বতের প্রভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ হয়ে থাকে বর্ষা মৌসুমে (জুন থেকে অক্টোবর)। দেশের পূর্বাঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ৭০% ঘটে এ মৌসুমে, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৮০% এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ৮৫%। বর্ষা মৌসুমে দেশের পশ্চিম-কেন্দ্রীয় অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০০ মিমি, কিন্তু দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে তা ২০০০ মিমির ওপরে। এ মৌসুমে অধিক বৃষ্টিপাতের মূল কারণ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট দুর্বল নিম্নচাপসমূহ এবং সমুদ্র থেকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড অভিমুখী আর্দ্র মৌসুমি বায়ু। বর্ষা মৌসুমেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অধিক মাত্রায় বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে মেঘালয় পর্বতের

প্রভাব রয়েছে। সাধারণত মধ্য অক্টোবরের পর অর্দ্ধ মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ স্তিমিত হয়ে গেলে দ্রুত বৃষ্টিপাত হ্রাস পেতে থাকে।

বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের তারতম্য রয়েছে। পশ্চিম-কেন্দ্রীয় অঞ্চলে এর পরিমাণ ১৫০০ মিমি, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ৩০০০ মিমি। সুরমা উপত্যকা এবং পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের হার অতি উচ্চ। সিলেটে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪১৮০ মিমি, মেঘালয় মালভূমির পাদদেশ সংলগ্ন সুনামগঞ্জে এর পরিমাণ ৫৩৩০ মিমি এবং লালাখাল (জৈন্তিয়াপুর উপজেলা) নামক স্থানে ৬৪০০ মিমি। বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে এই লালাখালে। মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলা থেকে সরাসরি উত্তর দিকে মাত্র ১৬ কিমি দূরে অবস্থিত। চেরাপুঞ্জিতে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিস্ময়কর রকমের বেশি— ১০৮২০ মিমি।

Artificial Rainfall কৃত্রিম বৃষ্টিপাত

বায়ুতে বরফাকর্ষী কণার অভাব হলে মেঘ হতে বৃষ্টিপাত হয় না। কৃত্রিম বরফাকর্ষী কণা ছড়িয়ে দিয়ে বৃষ্টিপাত ঘটানো সম্ভব। সিলভার আয়োডাইড বরফাকর্ষী কণার মতো কাজ করে। বিমান হতে বা কামানের সাহায্যে বায়ুতে সিলভার আয়োডাইড ছড়িয়ে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানো যেতে পারে।

Conventional Rainfall পরিচলন বৃষ্টিপাত

বায়ু উত্তপ্ত হলে প্রসারিত ও হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায়। এতে করে বায়ুর তাপ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় এবং অতিরিক্ত

জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এরূপ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত বৃষ্টিপাতকে পরিচলন বৃষ্টি বলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বছর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে প্রচুর উত্তাপের কারণে প্রায় প্রতিদিনই এরূপ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

Hailstorm শিলাবৃষ্টি

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বজ্রঝড়ের সময় বায়ু অত্যধিক উর্ধ্ব উত্থিত হয় এবং সেখানে ঝড়োপুঞ্জ মেঘে জলকণা বরফে পরিণত হয়। ফলে ঝড়ের সময় বৃষ্টিপাতের সঙ্গে অনেক সময় ছোট-বড় আকারের বরফখণ্ডও পতিত হয়। এ ধরনের বৃষ্টিপাতকে শিলাবৃষ্টি বলে। আমাদের দেশে কালবৈশাখীর সময় প্রায়শই এ ধরনের বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

অতিবৃষ্টি

স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হলে তাকে অতিবৃষ্টি বলে। প্রতিবছর আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাসে কখনো কখনো অতিবৃষ্টি হয়। অতিবৃষ্টির ফলে পাহাড়ি ঢল হয়। পাহাড়ি ঢলে সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রতিবছর বন্যা দেখা দেয়। অতিবৃষ্টি হলে যে ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে তা হলো পাহাড়ি ঢলে অকালবন্যা দেখা দিতে পারে; আগাম ফসল পানিতে ডুবে পচে নষ্ট হতে পারে; আমন ধানের বীজতলা নষ্ট হতে পারে; বীজতলা করার জন্য নির্বাচিত জমি পানিতে তলিয়ে গিয়ে বীজতলা তৈরিতে বিলম্ব হতে পারে; ধান চাষের মৌসুম পিছিয়ে যেতে পারে।

অনাবৃষ্টি

বাংলাদেশের আবহাওয়ার প্রকৃতি অনুযায়ী গ্রীষ্মকালে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) গড়ে ৫০

সেন্টিমিটার ও বর্ষাকালে (আষাঢ়-কার্তিক) গড়ে ১৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। আবহাওয়ার অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো পরিবর্তন ঘটলে এর ব্যতিক্রম ঘটবে। বৃষ্টির মৌসুমে প্রত্যাশিত মাত্রার চেয়ে কম বৃষ্টিপাতকে অনাবৃষ্টি বলে। অনাবৃষ্টির ফলে সময়মতো ব্রি ও বোরো ধানের বীজ করা যায় না; গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি ও কৃষি আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়; গ্রীষ্মকালীন ফল, ধান, পাট প্রভৃতির ফলন কমে যায়।

RIVER নদী

River নদী

নদী যে অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করে তাকে নদীর উৎস এবং যে স্থানে সমুদ্রে বাহুদে মিলিত হয় সেই স্থানকে মোহনা বলে। নদীর চলার পথে কখনো কখনো ছোট ছোট অন্যান্য নদী বা জলধারা এসে মিলিত হয়— এগুলো উপনদী নামে পরিচিত। একটি নদী এবং এর উপনদীসমূহ একত্রে একটি নদী প্রণালি বা নদী ব্যবস্থা (River System) গঠন করে। ভূপৃষ্ঠ কখনো পুরোপুরি সমতল নয়। নদী গঠনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত আয়তন ও গতিবেগসম্পন্ন একাধিক প্রবাহের মিলিত ধারা যা অন্তস্থ ভূমি ও শিলাকে ক্ষয় করে খাতের সৃষ্টি করে এগিয়ে যেতে পারে। নদীর একটি উৎস আধার (Source Reservoir) থাকে, যা নদীকে নিয়মিত প্রবাহ যোগান দেয়। যেমন— গঙ্গা নদীর উৎস গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের উৎস মানস সরোবর।

Tributary উপনদী

বিভিন্ন উৎস হতে উৎপন্ন ছোট ছোট নদী যখন কোনো বড় নদীতে পতিত হয়, তখন সেসব ছোট নদীগুলোকে বড় নদীগুলোর উপনদী বলে। যেমন— তিস্তা, যমুনা নদীর উপনদী।

Superimposed River আরোপিত নদী

পর্যাক্রমিকভাবে নতুন ও পুরাতন শিলা রয়েছে— এমন ভূমিরূপ দিয়ে কোনো নদী প্রবাহিত হওয়ার ফলে প্রথম পর্যায়ে নতুন শিলা অপসারিত হয়। পরবর্তী সময়ে নদীটি পুরাতন শিলাস্তরও ক্ষয় করে খাত সৃষ্টি করে এবং সেই খাতে অগ্রসর হয়। প্রথম নতুন শিলার ওপর দিয়ে, পরবর্তী সময়ে পুরাতন শিলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদীকে আরোপিত বা উপরিস্থাপিত নদী বলে।

Confluence নদীসঙ্গম

দুই বা ততোধিক নদীর মিলনস্থানকে নদীসঙ্গম বলে। যেমন, পদ্মা ও যমুনা গোয়ালন্দের নিকটে মিলিত হয়ে নদীসঙ্গমের সৃষ্টি করেছে।

Wadi পাথুরে নদী খাত

মরু অঞ্চলের শুষ্ক নদী খাত। প্রবল বৃষ্টিপাতের পর এতে পানিপ্রবাহ দেখা যায়। তারপর শুকিয়ে যায়। প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন বালুকারাশি দ্রুত অপসারিত হলে এসব নদী বেশ গভীর হয়ে উঠতে পারে। অনেক সময় উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বরফ গলে

গিয়েও এরূপ সাময়িক নদী খাতের সৃষ্টি হতে পারে। সাহারা ও আরবীয় মরু অঞ্চলেই এসব নদী খাত বেশি পরিলক্ষিত হয় এবং স্থানীয়ভাবে এগুলো ওয়াডি নামে পরিচিত। আমেরিকা ও স্পেনে Arroyo এবং ভারতে Nullah নামে পরিচিত।

River Terrace

নদী সোপান

সমভূমি প্রবাহে মধ্য গতিতে ক্ষয়ের ফলে নদীর উপত্যকায় সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে পর্যায়িত ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়, একে নদী সোপান বলে।

Levee

বন্যা প্রতিরোধী বাঁধ

নদীর দুই তীরে বা এক পার্শ্বে যে উঁচু ভূমি দেখা যায় তাকে নদীপাড় বলে। এগুলো দেখতে অনেকটা বাঁধের মতো। নদীর দু'কূল প্লাবিত হলে বাহিত পলি, কাঁকর সঞ্চিত হয়ে এরূপ প্রাকৃতিক বাঁধের সৃষ্টি হয়। এসব বাঁধের পশ্চাৎ দিকে প্রায়শই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। একে স্থানীয়ভাবে জলা বা হাওর বলে। প্রাকৃতিক বাঁধে অনেক ক্ষেত্রে গ্রামীণ বসতি, এমনকি শহর পর্যন্ত গড়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের যশোর জেলার প্রাকৃতিক বাঁধে সারিবদ্ধ গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়।

Rapids

নদীপ্রপাত

পার্বত্য অঞ্চলে পাশাপাশি কোমল ও কঠিন শিলা থাকলে কোমল শিলা দ্রুত ক্ষয় হয়ে যায় এবং কঠিন শিলা ধাপে ধাপে সিঁড়ির ন্যায় অবস্থান করে। এ অবস্থায় নদীপ্রবাহ

প্রবল খরস্রোতে পরিণত হয় এবং লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে আসে। এই দৃশ্যকে নদীপ্রপাত বলে।

River Bank

নদীতট

নদী উপত্যকার উভয় পাড়কে নদীতট বলে।

River Basin

নদী অববাহিকা

সাধারণভাবে কোনো হ্রদ বা জলাশয়ের জলে পরিপূর্ণ স্থান সেই হ্রদ বা জলাশয়ের অববাহিকা বলা যায়। কিন্তু নদী অববাহিকা কিছুটা বিস্তৃত অর্থবোধক। কোনো মূল নদী এবং এর বিভিন্ন শাখা ও উপনদীর মাধ্যমে যে অঞ্চলের জলরাশি নিষ্কাশিত হয়, ওই অঞ্চলকে সংশ্লিষ্ট নদীর অববাহিকা বলে। যেমন, পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ সিন্ধু নদের অববাহিকা।

River Bed

নদীগর্ভ বা নদীতল

নদী উপত্যকার তলদেশকে নদীগর্ভ বলে।

River Capture

নদী গ্রাস

কাছাকাছি প্রবাহিত দুটি নদীর একটি দুর্বল ও অপর শক্তিশালী হয়ে এবং শক্তিশালী নদীটি যদি কালক্রমে দুর্বলটির অববাহিকার কিছু অংশ আপন অববাহিকার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, তবে তাকে নদী গ্রাস বলে। এর ফলে দুর্বল নদীটি পূর্বের পথে প্রবাহিত না হয়ে প্রবল নদীর মধ্যে দিয়ে বাহিত হয় এবং কালক্রমে মূলস্রোতধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়াকে নদীর শিরোচ্ছেদন বলে এবং বিচ্ছিন্ন নদীটিকে শিরোচ্ছেদিত নদী বলে।

Rills

ক্ষুদ্র নালা

বৃষ্টি, বরফ গলা পানি বা অন্য কোনো জলধারা ভূমির ঢাল অনুযায়ী নিম্নমুখী হওয়ার সময় প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাতের সৃষ্টি হয়। এগুলোকে ক্ষুদ্র নালা বলে। নদীর উৎস অঞ্চলে এরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র নালা দেখা যায়।

Sandy Land

চর

নদীর শেষ প্রবাহে সাধারণত বালুর চর সৃষ্টি হয়। এ সময় নদীর প্রবাহ একবারে ক্ষীণ হয়ে আসে এবং পলি-বহনক্ষমতা প্রায় হারিয়ে ফেলে। ফলে নদীর তলদেশে পলি সঞ্চিত হতে শুরু করে এবং কালক্রমে নদীর বুকেই চরের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের যমুনা নদীতে প্রায়শই এরূপ চরের সৃষ্টি হয়। তবে বর্ষাকালে স্রোতের বেগ বৃষ্টি পলে এসব চর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

Cusec

কিউসেক

কোনো নদীর একটি নির্দিষ্ট স্থানে কী পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয় তা পরিমাপ করার জন্য পরিমাপের একক হিসেবে কিউসেক ব্যবহার করা হয়। প্রতি সেকেন্ডে কত ঘনফুট পানি প্রবাহিত হচ্ছে তা বোঝাতে কিউসেক পরিমাণ ব্যবহার করা হয়।

Course

নদীর গতিপথ

নদী যে পথে অগ্রসর হয় তাকে নদীর গতিপথ বলে।

Cut-off

ছিন্নবাঁক

সমভূমিতে নদী সর্পিলা গতিতে তথা ঐক্যেবঁকে প্রবাহিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষয়কার্যের ফলে সর্পিলা নদীর দুই বাঁক ক্রমান্বয়ে কাছাকাছি এসে পুরাতন পথ পরিত্যাগ করে নতুন গতিপথে সোজা প্রবাহিত হয় এবং পরিত্যক্ত নদী পথের দুই প্রান্ত তখন তলানি জমে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে ছিন্ন বাঁকের সৃষ্টি হয়।

Cataract

খাড়া জলপ্রপাত

পার্বত্য প্রবাহে নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের সমষ্টিকে খরস্রোত বলে। নদীপ্রবাহ-পথে পাশাপাশি কঠিন ও কোমল শিলার অবস্থান থাকলে কোমল শিলা ক্ষয় হয়ে যায়, কিন্তু কঠিন শিলা অক্ষত থাকে। ফলে সেখানে ধাপে ধাপে সিঁড়ির ন্যায় ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। এক-একটি ধাপ ক্ষুদ্রাকৃতির জলপ্রপাতের মতো। এরূপ পরপর জলপ্রপাতের সৃষ্টি হলে প্রবল খরস্রোতের সৃষ্টি হয়। নীল নদেও পার্বত্য প্রবাহে এরূপ খরস্রোত দেখা যায়।

ঝিল

ঝিল হলো নদীর পরিত্যক্ত পথ। আঞ্চলিক ভাষায় একে ঝিল নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণত ঝিলকে অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ হিসেবে নির্দেশ করা যায়। এটি দুটি উপায়ে সৃষ্টি হতে পারে : ১. যখন কোনো নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে পুরাতন গতিপথ পরিত্যাগ করে এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে পলিসঞ্চিত হয়ে পুরাতন গতিপথের মুখ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে কালক্রমে

এটি মূল নদী হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়। ২. নদী যখন বাঁকা পথ পরিবর্তন করে সরল পথে প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করে সে ক্ষেত্রে কাছাকাছি বাঁক দুটোর সরলপথ দুটি ক্ষয়কার্যের দরুন সংযুক্ত হয়ে যায় এবং নদী পুরাতন পথ পরিত্যাগ করে নতুন সরল পথে প্রবাহিত হয়।

নদীর মধ্য ও নিম্নগতিতে ক্ষয় ও সঞ্চয়ক্রিয়ার ফলে অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি হয়। ঝিলগুলো বেশিরভাগ দেখা যায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকায়। এগুলো বর্ষা মৌসুমে গভীরভাবে প্লাবিত হয় এবং সমৃদ্ধ মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। শুরু মৌসুমে ঝিলগুলো কৃষি ও গবাদিপশুর চারণক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত উচ্চভূমি বরাবর এলাকা পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে জনবসতি দেখা যায় যা সাময়িকভাবে বন্যা প্রভাবমুক্ত। অব্যবহৃত উচ্চভূমির নিকটবর্তী ধীরগতিসম্পন্ন প্লাবন এলাকা কৃষি কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রায় শুরু ভূমির কিছু অংশ বোরো চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়।

Wetland

জলাভূমি

স্থলভাগে বা উপকূলীয় এলাকার জল-বিস্তৃত ভূমিকে জলাভূমি বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, জলাভূমির হলো জলা, প্লাবনভূমি, ডোবা এবং অগভীর। রামসার (Ramsar) কনভেনশন-১৯৭১ অনুযায়ী জলাভূমির সংজ্ঞা হচ্ছে— প্রাকৃতিক অথবা মানবসৃষ্ট, স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্থির বা প্রবাহমান পানিরাশি বিশিষ্ট স্বাদু, লবণাক্ত অথবা মিশ্র পানিবিশিষ্ট জলা, ডোবা, পিটভূমি অথবা পানিসমৃদ্ধ এলাকা এবং সেই সঙ্গে এমন গভীরতাবিশিষ্ট

সামুদ্রিক এলাকা, যা নিম্ন জোয়ারের সময় ৬ মিটারের বেশি গভীরতা অতিক্রম করে না। জলাভূমির এই সংজ্ঞাটি বিস্তৃত পরিসরে স্বাদু পানি, উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক পরিবেশকে একত্রে উপস্থাপন করে। আবার প্লাবন বা বন্যার স্থায়িত্ব ও গভীরতার ওপর ভিত্তি করে সমগ্র দেশকে ছয়টি বৃহৎ ভূমি ধরনের বিভক্ত করা হয়েছে : উঁচুভূমি, মধ্যম উঁচুভূমি, মধ্যম নিম্নভূমি, নিম্নভূমি, অতি নিম্নভূমি এবং তলদেশীয় ভূমি। এই ভূমি শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে জলমগ্ন পর্যন্ত এলাকাসমূহকে জলাভূমি বলে বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীর ৬ শতাংশের বেশি এলাকা হচ্ছে জলাভূমি। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন শ্রেণীর জলাভূমি শনাক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে ৩০টি শ্রেণী প্রাকৃতিক এবং ৯টি মানবসৃষ্ট।

লোনাপানির জলাভূমি

লোনাপানির জলাভূমিগুলোকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা;

১. সামুদ্রিক জলাভূমি : নিম্ন জোয়ারভাটার সময় স্থায়ী অগভীর পানিরাশি হলো সামুদ্রিক জলাভূমি। উদাহরণস্বরূপ : উপসাগর প্রবাল-প্রাচীর, সেন্টমার্টিন প্রবাল প্রাচীর।

মোহনাজ জলাভূমি : পরিমিত উদ্ভিজ্জবিশিষ্ট আন্তঃজোয়ার-ভাটা সৃষ্ট কাদা, বালু অথবা লবণাক্ত সমতল হলো মোহনাজ জলাভূমি। যেমন- আন্তঃজোয়ার-ভাটা সৃষ্ট বনাচ্ছাদিত জলাভূমিসমূহ, স্রোতজ জলাভূমি।

লবণাক্ত হ্রদীয় জলাভূমি : এই প্রকার জলাভূমি হচ্ছে স্বাদু-লবণাক্ত থেকে লবণাক্ত হ্রদসমূহ যা সংকীর্ণ পথে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত।

২. স্বাদু পানির জলাভূমি : তিন প্রকার স্বাদু পানির জলাভূমি রয়েছে। যথা :

ক. নদীজ জলাভূমি : এই জলাভূমির মধ্যে

অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে স্থায়ী নদ-নদী ও স্রোতস্থানীসমূহ এবং কতিপয় চরাভূমি ও এর অন্তর্ভুক্ত অস্থায়ী মৌসুমি নদ-নদী স্রোতস্থানীসমূহ।

খ. বিল জলাভূমি : এ ধরনের বেশিরভাগ জলাভূমিই প্রধান বদ্বীপ অঞ্চলের রাজশাহী, পাবনা, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেট জেলায় অবস্থিত।

গ. প্যালাস্ত্রাইন জলাভূমি : উল্লেখ্যরত উদ্ভিজ্জবিশিষ্ট স্থায়ী স্বাদুপানির জলমগ্ন ভূমিসমূহ, জনভূমিসমূহ হলো এই প্রকার জলাভূমির অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নভূমির হিজল বন।

৩. মানবসৃষ্ট জলাভূমি : এই প্রকার জলাভূমিসমূহ হচ্ছে মৎস্য চাষের পুকুরসমূহ, সেচকৃত জমি ও সেব খালসমূহ, লবণ চাষের ক্ষেত্রসমূহ, জলবাঁধ, যেমন- কাণ্ডাই লেক।

ভূসংস্থানের নিম্নতর প্রান্তে অবস্থিত জলাভূমিগুলো বর্ষা ঋতুতে অগভীর থেকে গভীর প্লাবন ও বন্য দ্বারা প্লাবিত হয়। জলাভূমির জলজ-ভূরূপতাত্ত্বিক (Hydro-geomorphological) বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুধাবন করার জন্য একটি আদর্শ হাওরকে উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চত (Elevation) ও জলতত্ত্ব (Hydrology)-এর ওপর ভিত্তি করে একটি হাওরকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়, যথা : পর্বত পাদদেশীয় অংশ, প্লাবনভূমি ও গভীরভাবে প্লাবিত এলাকা। তিনটি অংশের মধ্যে পর্বত পাদদেশীয় অংশ সবচেয়ে উঁচু এবং পরিবৃদ্ধি অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত, যেখানে অধিকতর মোটা পলিসমূহ নদী দ্বারা বাহিত হয়ে পাড় বরাবর সঞ্চিত হয়। নদীপাড়ের নিম্নঢাল বরাবর

যেখানে পলি সঞ্চয়ন ন্যূনতম এবং ক্রমানুসারে বিন্যস্ত হয় সেখানে পশ্চাৎ-জলাভূমি গঠিত হয়। এই পশ্চাৎ-জলাভূমি পানি ও পলি সঞ্চয়নের আধারের ভূমিকা পালন করে। বন্যার চূড়ান্ত পর্যায়ে, নদ-নদীর পানি তীর উপচে প্রবাহিত হয় এবং পশ্চাৎ-জলাভূমিকে প্লাবিত করে। এভাবে ভাটি এলাকায় বন্যার উচ্চতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। আবার পশ্চাৎ-জলাভূমি থেকে বন্যার পানি নদী দ্বারা নিষ্কাশিত হওয়ার মাধ্যমে তা ভাটি এলাকার প্রবাহকে ত্বরান্বিত করে।

ভূসংস্থানের মধ্যভাগে অবস্থিত পরিমিত ঢালবিশিষ্ট প্লাবনভূমি সূক্ষ্মতর পলি লাভ করে এবং পলির পরিমাণও হয় নিম্নতর মাত্রার। প্রতি বর্ষা মৌসুমে এই খণ্ডে অবস্থিত পশ্চাৎ-জলাভূমিসমূহ প্লাবিত ও নিষ্কাশিত হয় এবং ভাটি এলাকায় বন্যার তীব্রতা হ্রাসে সহায়তা করে। জলাভূমির গভীরতম ও তৃতীয় অংশ হচ্ছে বিল। বর্ষায় বিল ও প্লাবনভূমিসমূহ ব্যাপকভাবে বন্যা দ্বারা প্লাবিত হয় এবং একক জলাধারে রূপ নেয়। সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনা অববাহিকা এবং যশোর, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার হাওর-বাঁওড়গুলো এ ধরনের জলাভূমির উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বাংলাদেশের জলাভূমি মৃত্তিকাকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়— জৈব মাটি ও খনিজ মাটি। জৈব মাটি প্রায় ৭৪,০০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং বাংলাদেশের সমস্ত নিচু অববাহিকাগুলোতে এটি রয়েছে। এর মধ্যে গোপালগঞ্জ-খুলনা অববাহিকা জৈব মাটির বিস্তৃতিতে শীর্ষে রয়েছে। অন্যদিকে, জলাভূমি পরিবেশ গঠিত খনিজ মাটি বাংলাদেশে সর্বাধিক বিস্তৃত। বাংলাদেশের বেশিরভাগ খনিজ জলাভূমি মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের উপস্থিতি খুবই কম এবং

অর্ধেকেরও বেশি মাটিতে মাত্র এক থেকে দুই শতাংশ জৈব পদার্থ বিদ্যমান থাকে।

জলাভূমিসমূহ মাছ, পাখি ও অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদকে খাবারের যোগান দেয় ও প্রজনন-অনুকূল ক্ষেত্র যোগায়। জলাভূমিসমূহ প্রতিবেশ ব্যবস্থা হিসেবে অত্যন্ত উৎপাদনক্ষম। জলাভূমি থেকে কাঠ, পিট মস, ধান ও বহু ধরনের ফল পাওয়া যায়। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলসমূহ জলাভূমি হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা থেকে ছাদ তৈরির উপকরণ, কাপড় তৈরির উপকরণ, পশুর খাবার, চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার ট্যানিন ও চিনি পাওয়া যায়। বন্যার জল নিয়ন্ত্রণের জন্যও জলাভূমির ভূমিকা আছে।

RISK ঝুঁকি

Risk ঝুঁকি

প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কোনো আপদের কারণে জানমালের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাই হলো ঝুঁকি। ঝুঁকির সঙ্গে জড়িত আছে তিনটি বিষয়, তা হলো আপদ, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা। আবার ঝুঁকির মাত্রা নির্ভর করে ব্যক্তির বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার ওপর। আপদের ফলাফলকে মানুষ যদি তার সক্ষমতার সাহায্যে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তাহলে তার কাছে বিষয়টি আর ঝুঁকি থাকবে না।

একই দেশে একই মাত্রার আপদে বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার নিরিখে ধনী ও

দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যে ঝুঁকির তারতম্য হতে পারে। যেমন— কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপে একই সাইক্লোনে একজন দরিদ্র ও একজন ধনী ব্যক্তির মধ্যে ঝুঁকির মাত্রা দুই রকম হবে। বিষয়টি একটি সমীকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে :

ঝুঁকি = আপদ x বিপদাপন্নতা/সক্ষমতা।

এ ক্ষেত্রে সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতার মান বসাতে হবে। ধরি, এগুলোর মান ১ থেকে ৫ পর্যন্ত। এখানে ১-এর মান সবচেয়ে কম এবং ৫ হলো সর্বোচ্চ। দরিদ্র ফুলবিবি— যাঁর ঘরবাড়ি খুবই জীর্ণ এবং দুর্বল অবকাঠামো, সঞ্চয় নাই, অক্ষরজ্ঞানহীন এবং সামাজিক অবস্থা নিম্ন— তাঁর বিপদাপন্নতা ৫ হলে ধনী রহিম মোল্লার বিপদাপন্নতা ১ হবে। কেননা তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো, ঘরবাড়ি, মজবুত, তিনি শিক্ষিত ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন। আবার সেই অনুযায়ী ফুলবিবির সক্ষমতা ১ এবং রহিম মোল্লার সক্ষমতা ৫। উভয় ক্ষেত্রেই আপদকে ৫ হিসাবে ধরা হচ্ছে (কেননা সকল ক্ষেত্রেই দুর্ঘটনার মাত্রা একই হয়)।

সুতরাং রহিম মোল্লার ঝুঁকি = $৫ \times ১/৫ = ১$

ফুলবিবির ঝুঁকি = $৫ \times ৫/১ = ২৫$

অর্থাৎ আপদের মাত্রার ওপর নয় বরং বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার মাত্রার ওপরই মানুষের ঝুঁকি নির্ভর করে।

ঝুঁকি নিরূপণ হচ্ছে এমন এক পদ্ধতি, যার দ্বারা সম্ভাব্য আপদের আশঙ্কা, প্রকৃতি ও বিস্তার নিরূপণ করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে বিপদাপন্নতার বর্তমান প্রকৃতিও নিরূপণ করা যায়, যা সম্ভাব্য আপদের আশঙ্কা সম্পর্কে ধারণা দেয়। যেমন— বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন, সম্পদ,

পরিবেশের ওপর সম্ভাব্য আপদ কতটুকু প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম ইত্যাদি ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে জানা যায়।

Risk at Different Sectors বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঝুঁকিসমূহ

দুর্ঘটনার ঝুঁকিসমূহকে ৩টি ক্ষেত্রে ভাগ করা যায় :

১. **Infrastructural Sector (অবকাঠামোগত ক্ষেত্র) :** অবকাঠামোগত ক্ষেত্র বলতে বোঝায় ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, সড়ক, সেতু, কালভার্ট, রেলপথ ইত্যাদি। আবার জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা যেমন— বিদ্যুৎকেন্দ্র, খাদ্যগুদাম, বিমানবন্দর, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি। এ ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে অবকাঠামোগত/ ভৌত সুবিধাদি যেমন— পানি সরবরাহ স্থাপনা, পাম্প স্টেশন, সুইস গেট, বন্যা প্রতিরক্ষা বাঁধ ইত্যাদি।

২. **Risk in Social Sector (সামাজিক খাতে ঝুঁকিসমূহ) :** সামাজিক পর্যায়ে ঝুঁকির ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে— বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ যেমন— মহিলা, শিশু, প্রতিবেদী ইত্যাদি। জীবনধারণের উপায় ও উপকরণসমূহ যেমন— কর্মসংস্থানের উপায়, পেশা, আয়ের বিভিন্ন উৎস ও উপায়সমূহ। এ ছাড়াও বসবাসের পরিবেশ, ঝুঁকি ও দরিদ্রের সম্পর্কসংক্রান্ত, দৃষ্টিভঙ্গি, দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী ও সেবাপ্রার্থী উদ্যোগসমূহ ইত্যাদি।

৩. **Economic Sector (অর্থনৈতিক খাতে) :** অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ঝুঁকিসমূহকে ২ ভাগে ভাগ করা যায় :

ক. পরিমাণযোগ্য/দৃশ্যমান ক্ষতি

খ. পরোক্ষ ক্ষতি/ যে ক্ষতি প্রত্যক্ষভাবে পরিমাণ করা যায় না

পরিমাণযোগ্য/দৃশ্যমান ক্ষতিসমূহকে অর্থনৈতিকভাবে পরিমাণ করা যায়। এ ধরনের ক্ষতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যক্ষ ক্ষতির মধ্যে উল্লেখ করা যায় : সরকারি ভবনের ক্ষতি/ ধ্বংস-প্রাপ্তি, বসতিভিটার ক্ষতি, সম্পদহানি, পশু-পাখি/গরু-ছাগলের ক্ষতি, ফসলহানি, মৎস্য সম্পদহানি, বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি।

পরোক্ষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে দিনমজুরের মজুরি না পাওয়া, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি, জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসনে ব্যয়, উৎপাদন উপকরণের ক্ষতি, সংস্কার ও প্রতিস্থাপন ব্যয় ইত্যাদি।

যে সকল ক্ষতি প্রত্যক্ষভাবে/ সুস্পষ্টভাবে পরিমাণ করা যায় না, এর মধ্যে রয়েছে : অসুস্থতা, স্বাস্থ্যহানি, পুষ্টিহীনতা, ক্ষুদ্রাঙ্গীতা, মূল্যবৃদ্ধি, হতাশা, মনস্তাত্ত্বিক নৈরাশ্য ইত্যাদি।

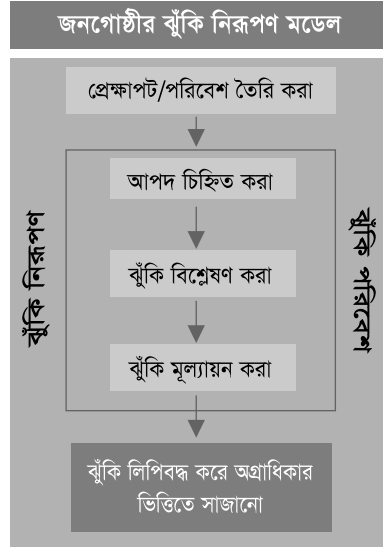
Risk Assessment Model ঝুঁকি নিরূপণ মডেল

বাংলাদেশে কিছু বৈজ্ঞানিক মডেল আছে যা ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে পারে। যেমন—

- কৃষি বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের মডেল
- টেকসই পরিবার চর্চা ভূমি
- উপকূলীয় বলয় বন্যা মডেল

ঝুঁকির পরিবেশ নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণ করার উপাদানসমূহ

- কারিগরি ও প্রথাগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা।



- জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু বৈচিত্র্যের প্রভাবসমূহ জানা।
- জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ মডেলের ওপর ভিত্তি করে জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি মূল্যায়ন করা।
- বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির উপাদানসমূহ লিপিবদ্ধ করা।
- সকল আপদ, ঝুঁকি খাতকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা।

Risk Environment Management

ঝুঁকির পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

ঝুঁকির পরিবেশ ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যা ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা করার মাধ্যমে শুরু হয়। এর মাধ্যমে ঝুঁকি এড়ানো, ঝুঁকি দূর করা, ঝুঁকির ভয়াবহতা হ্রাস এবং ঝুঁকি স্থানান্তর করতে সক্ষমতা গড়ে তোলা যায়।

Elements of Risk

Environment Management

ঝুঁকির পরিবেশ ব্যবস্থাপনা করার উপাদানসমূহ

- ঝুঁকি হ্রাস উপায়গুলোর মধ্যে ভারসাম্যতা অর্জন করা,
- সাধারণ আপদ হতে সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিভিত্তিক কর্মসূচির দিকে অগ্রসর হওয়া,
- অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সেবা প্রদান টেকসই করা,
- পূর্বসতর্কতাসহ জরুরি ভিত্তিতে সাড়া দেয়ার প্রক্রিয়া ও প্রস্তুতি জোরালো করতে কারিগরি ও প্রথাগত বিশ্লেষণ জোরালো করা।

ঝুঁকির পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপরোক্ত উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করলে এভাবে বলা যায় :

- ঝুঁকি কমিয়ে আনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি স্থানান্তরের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসের পন্থাগুলোর মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করা,
- সাধারণ আপদ থেকে সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি ভিত্তিক কর্মসূচির দিকে অগ্রসর হওয়া,
- যৌথ অংশীদারিত্ব ও সমন্বয়ের মাধ্যমে টেকসই সেবা প্রদান নিশ্চিত করা,
- কার্যকর প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- কারিগরি ও প্রথাগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা
- গণমাধ্যমের সাথে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা
- ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের কার্যকর পদ্ধতি নির্ধারণ করা
- অনুসন্ধান এবং উদ্ধারের নিয়োজিত সংস্থাসমূহের দায়িত্বে সক্ষমতা গড়ে তোলা।

নং	কর্মকাণ্ড/কার্যক্রম	বাস্তবায়ন কৌশল	দায়দায়িত্ব			সময় সীমা
			জনগোষ্ঠী	সহযোগী সংস্থা	অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (সরকারি/এনজিও)	
০১						
০২						
০৩						

Risk Reduction Model

ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনার মডেল

ঝুঁকি লিপিবদ্ধ করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাজানো

ঝুঁকি হ্রাসের পরিকল্পনা
(ঝুঁকি হ্রাস লিপিবদ্ধসহ)

ঝুঁকি এড়ানো

ঝুঁকি দূর করা

ঝুঁকি হ্রাস করা

ঝুঁকি স্থানান্তর করা

অবশিষ্ট ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা করা

ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনায় কিছু পন্থা রয়েছে।
পন্থাগুলো হলো :

Risk Reduction Plan

ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা

ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা হলো দুর্ঘটনের ঝুঁকি কমিয়ে আনবার জন্য একটি প্রস্তাবিত কৌশলপত্র, যার মধ্যে ঝুঁকি হ্রাসের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও কর্মসূচি থাকে। একটি ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরির সময় অবশ্যই নিচের বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখতে হবে-

- ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনায় অবশ্যই বিদ্যমান বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতাগুলি চিহ্নিত করতে হবে।
- ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরির সময় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অগ্রাধিকারকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সময় আপদ সংঘটিত হওয়ার হার, জীবন ও জীবিকার ওপর এর প্রভাব বিবেচনায় আনতে হবে।
- ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবভিত্তিক, বাস্তবায়নযোগ্য এবং সময়ভিত্তিক হতে হবে।
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়দায়িত্ব ও কৌশল সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

- ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর মূল্যায়নের সুযোগ রেখে তৈরি করতে হবে।

Risk Avoidance ঝুঁকি এড়ানো

ঝুঁকি এড়ানো হলো এমন কিছু না করা, যা ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। যা অর্জন হতে পারত তাও হারানোর আশঙ্কা হচ্ছে ঝুঁকি গ্রহণ। আর ঝুঁকি এড়ানো হচ্ছে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে ঝুঁকি না নেয়া। আমরা অনেকে ভাগ্যের ওপর নিজেদের ছেড়ে দেই। কিন্তু যতক্ষণ আমাদের করণীয় আছে ততক্ষণ হাল ছেড়ে না দিয়ে দুর্ঘোষণা মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।

Risk Removal ঝুঁকি দূর করা

ঝুঁকি দূর করা বলতে বোঝায় দুর্ঘোষণা ক্ষতির আশঙ্কাকে প্রতিহত করা। অর্থাৎ এমনভাবে

নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করা, যেখানে কোনো দুর্ঘোষণা আর ক্ষতি বয়ে আনতে পারবে না বা দুর্ঘোষণাজনিত ক্ষতি হ্রাস করবে। এটা অনেকটাই অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত।

Risk Reduction ঝুঁকি হ্রাস করা

ঝুঁকির পরিবেশ সম্পর্কে জানা ও তার ব্যবস্থাপনা করাই হলো ঝুঁকি হ্রাস। অর্থাৎ নিজেদের এমনভাবে প্রস্তুত করা, যেন যেকোনো দুর্ঘোষণা ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেক কমে আসে।

ISDR কর্তৃক প্রকাশিত বইতে (Living with risk: a global review of disaster reduction initiatives) নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ডকে ঝুঁকি হ্রাসের আওতায় বিবেচনা করা হয়েছে—

- সম্ভাব্য ঝুঁকির ব্যাপারে ব্যাপক গণসচেতনতা এবং আপদ, ঝুঁকি, সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ।

- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং তথ্যপ্রবাহ বাড়ানোর মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ সাধন।
- কাঠামোগত ফ্রেমওয়ার্ক— যার মাধ্যমে নীতি, পলিসি, সাংগঠনিক ফ্রেমওয়ার্ক এবং এ বিষয়ে সরকারের দায়বদ্ধতা।
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সংরক্ষণ, সহযোগিতা ও নেটওয়ার্কিং বাড়ানো।
- আগাম সতর্কতা সংকেত ব্যবস্থা প্রবর্তন, যার মধ্যে সংকেত প্রচার ও প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড এবং কমিউনিটির সাড়া প্রদানের সক্ষমতা বাড়ানো বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Risk Transfer ঝুঁকি স্থানান্তর

ঝুঁকি স্থানান্তর বলতে বোঝায় সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে ঝুঁকির দিক পরিবর্তন করে দেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ এখানে সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ঝুঁকির মাত্রাকে হ্রাস করে ফেলাকে বোঝায়। যেমন: Micro-insurance

Risk Management ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

যে সকল ঝুঁকি এড়ানো যায় না Reseduc Risk বা অবশিষ্ট ঝুঁকি কমানো যায় না বা পরিবর্তন করা যায় না তাদের অবশিষ্ট ঝুঁকি বলে। এটি ওই সকল ঝুঁকিকে যুক্ত করে যা খুব বড় বা আকস্মিক এবং যা কমানো যায় না। যুদ্ধ হলো এর একটি উদাহরণ, যেখানে অধিকাংশ সম্পদ রক্ষা করা যায় না আবার ঝুঁকি কমানোও যায় না। ফলে যুদ্ধের ঝুঁকি অবশিষ্ট থেকেই যায়।

RIVER BANK EROSION নদীভাঙন



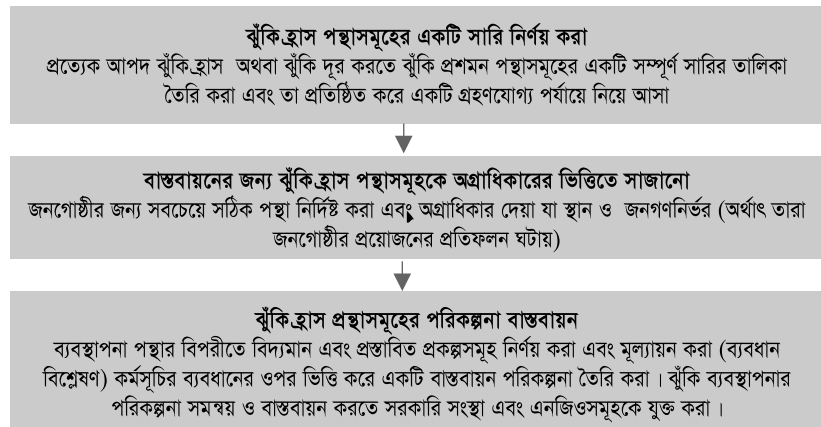
River Bank Erosion নদীভাঙন

বাংলাদেশে নদীভাঙন অন্যতম একটি প্রাকৃতিক দুর্ঘোষণা। নদীভাঙনের শিকার হয়ে প্রতিবছর হাজার হাজার একর আবাদি জমি, বসতিভিটা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। প্রতিবছর হাজার হাজার পরিবার জমিজমা ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। জীবন-জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে সেই নদীভাঙা মানুষদের।

নদীর গতিপথ পরিবর্তন, মাটির দুর্বল গঠন, নদী ভরাট, নদীর মাঝে চর সৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, বড় ধরনের বন্যার অত্যধিক পানির চাপ ও আঘাত, অতিবৃষ্টি, অপরিকল্পিত নদী শাসন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি নদীভাঙনকে ত্বরান্বিত করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের প্রায় ৯৪টি উপজেলায় নদীভাঙনের ঘটনা ঘটছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এর সঙ্গে আরও

Steps of Risk Reduction Planing-ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনার ধাপসমূহ



৫৬টি উপজেলার সন্ধান পেয়েছেন যেখানে নদীভাঙনের ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে প্রায় ১০০টি উপজেলায় নদীভাঙন ও বন্যার মতো দুর্যোগ প্রায় নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ৩৫টি উপজেলা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

ভাঙনের তীব্রতার ক্ষেত্রে নদী থেকে নদীতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কারণ এই ভাঙন নির্ভর করে কী ধরনের মাটি দিয়ে নদীতীর গঠিত, পানির পৃষ্ঠদেশের ভিন্নতা, তীরবর্তী প্রবাহের তীব্রতা ইত্যাদির ওপর। উদাহরণস্বরূপ, পলি ও মিহি বালুতে গঠিত আলগা বাঁধাই, সাম্প্রতিক মজুতকৃত তীরের পদার্থসমূহ ভাঙনের পক্ষে খুবই সংবেদনশীল। বন্যার পানির দ্রুত অপসারণ এই ধরনের পদার্থে তীর ভাঙনের হার ত্বরান্বিত করে।

বিভিন্নভাবে নদীতীর ভাঙন হতে পারে, যেমন :

ক. অকস্মাত ভাঙন। খ. বর্ষাকালীন ভাঙন। গ. বন্যাকালীন ভাঙন। ঘ. ধীর গতির ভাঙন। ঙ. পাড়ের মাটির তলা ভেঙে গিয়ে মাটি বসে বা দাবা চাপে ভাঙন।

নদীভাঙনের আর্থ-সামাজিক প্রভাব মারাত্মক। উল্লেখ্য, অধিকাংশ নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন একে প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে ধরে নেয়। আবার অনেকে আল্লাহর গজব বলে এই দুর্যোগকে মেনে নিয়ে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিবর্তে দোয়া-মানত ইত্যাদির শরণাপন্ন হয়। জাতীয় দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে নদীভাঙন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নদীভাঙনের কারণে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং বিপদাপন্ন লোকের সংখ্যা আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীভাঙনের

ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লোকের জমি, বসতভিটা, ফসল, গবাদি সম্পদ, গাছপালা, গৃহসামগ্রী সবকিছুই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। নিঃশ্ব, রিক্ত, সর্বস্বান্ত মানুষ ভূমিহীনের কাতারে शामिल হয়ে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে নদীভাঙনের শিকার হয়। এর ফলে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক পঞ্চাশ কোটি ডলার। প্রায় ৩ লক্ষ গৃহহীন পরিবার উন্মুক্ত আকাশের নিচে, পথের পাশে, বাঁধ, ফুটপাথ ও সরকারের খাস জমিতে এসে আশ্রয় নেয়। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই এই নদীভাঙনের শিকার হয়। নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ভাঙনের ফলে গ্রামীণ কৃষিকাজ দারুণভাবে ব্যাহত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা সম্পদ হারিয়ে জমানো সঞ্চয় ভেঙে জীবন নির্বাহ করে এবং প্রায়শই ঋণে জড়িয়ে পড়ে। গবেষকদের মতে, ভাঙনের ফলে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া ভূমির পরিমাণ নদীর তলদেশ থেকে জেগে ওঠা নতুন ভূমির পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি।

নদীভাঙনের সবচেয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে স্থানচ্যুতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই তাৎক্ষণিক স্থানবদল কাছাকাছি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকলেও দূর-দূরান্তে দেশান্তরী হওয়ার ঘটনাও খুব ব্যতিক্রমী নয়। ভাঙনপ্রবণ অঞ্চলে অধিকাংশ পরিবারই জীবদ্দশায় অন্তত একবার স্থানচ্যুতির শিকার হয়েছে। ঢাকার বস্তিগুলোর ওপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, এই সব ছিন্নমূল পরিবারের অধিকাংশই এসেছে ফরিদপুর (৩৪%), বরিশাল (২৫.৬%), কুমিল্লা (২৪.৩%) ও ঢাকা (১৪.৩%) থেকে। আরও নিবিড় অনুসন্ধান দেখা যায় যে, এসব বস্তিবাসীর অধিকাংশই আবার পদ্মা, গঙ্গা, মেঘনা নদীর ও এদের

সম্মিলিত মোহনার আশপাশে অবস্থিত কয়েকটি থানা নিয়ে গঠিত সীমিত এলাকা থেকে এসেছে। নদীভাঙনের ফলে স্থানচ্যুতির ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরো পরিবারই পথে বসে। এক হিসেবে দেখা যায়, ওই এলাকার একটি পরিবার জীবদ্দশায় গড়ে ২.৩৩ বার ভাঙনের কবলে পড়ে। এদের মধ্যে অনেকে ৪-৫ বা ততোধিকবার এই দুর্যোগের শিকার হয়েছে। পরিবেশ-দুর্যোগের কারণে শরণার্থীতে রূপান্তরিত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ দিনমজুর বা রিকশাওয়ালায় পরিণত হয়। কাজের সুযোগের অভাবে এইসব উদ্বাস্তর একটা বৃহত্তর অংশই বেকার থেকে যায়। এ ছাড়া এসব পরিবারের অধিকাংশই প্রধান উপার্জনকারী মহিলা। নদীভাঙনে আশ্রয়হীনা এই মহিলা পরিচালিত যেসব পরিবার বিভিন্ন বাঁধের ওপর অস্থায়ী নিবাস গড়ে তুলেছে, তারাই সবচেয়ে বঞ্চিত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

Causes of River Bank Erosion

নদীভাঙনের কারণ

অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো নদীভাঙনের কারণও দুটি ক্ষেত্রে থেকে উৎসারিত— ক. প্রাকৃতিক, খ. মানবসৃষ্ট

ক. প্রাকৃতিক কারণসমূহ : নদীভাঙনের প্রাকৃতিক কারণসমূহ হচ্ছে— নদীর গতিপথ পরিবর্তন হলে সৃষ্ট বাঁকে নদী ভাঙে, পলি পড়ে নদী ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে পাড়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে নদী ভাঙে, নদীর আকারও নদীভাঙনের একটি কারণ, কেননা বড় নদী বেশি ভাঙে, অতিবৃষ্টি হয়ে নদীপাড়ে ফাটল ধরে তারপর ঢেউয়ের আঘাতে নদীরপাড় ভেঙে যায়, নদীতে চর সৃষ্টি হলে

নদীর স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্ত হয়ে ভাঙন সৃষ্টি হয়, জোয়ার-ভাটার কারণে খরস্রোতা হয়ে নদী ভাঙে, বন্যার অতিরিক্ত পানিপ্রবাহের কারণে নদী ভাঙে, নদী অনেক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়লে, মধ্যস্থিত চরসমূহের পাড় ভাঙে।

Human Induced Causes for River Bank Erosion

মানবসৃষ্ট কারণসমূহ

নদীভাঙনের মানবসৃষ্ট কারণসমূহ হচ্ছে— বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করে গতিরোধ করা হলে, অপরিষ্কৃত নির্মাণকাজ পানি নিষ্কাশনে বাধার সৃষ্টি করে, এজন্যও ভাঙন দেখা দেয়, গাছ ও বনাঞ্চল নিধনের ফলে, শহর রক্ষা বাঁধ দিলে এ পাড় না ভেঙে ও পাড় ভাঙে, অযৌক্তিক ড্রেজিং ও ড্রেজিং না করার ফলে, ফেরি ও জাহাজের অতিরিক্ত গতিও নদীভাঙনের জন্য দায়ী, সুইস গেট নির্মাণ করে সঠিক পরিচালনা না করলে নদী ভাঙে, চরের গাছ ও কাশবন ধ্বংসের ফলে নদী ভাঙে।

উপরোক্ত কারণগুলো বিশ্লেষণ করে একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন— “নদীকে বিরক্ত করো না, তাহলে নদীও তোমাকে বিরক্ত করবে না। নদীর সাথে সহ-অবস্থানই শ্রেয়।”

Preparedness Activities to Cope with River Bank Erosion

সম্ভাব্য নদীভাঙন মোকাবিলায় প্রস্তুতিসমূহ

- পার্শ্ববর্তী নদীর পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির দিকে বিশেষ নজর দেয়া
- স্বেচ্ছাসেবক দলের মাধ্যমে রাতে ও

- দিনে পালাক্রমে নদীভাঙনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা
- নদীর পাড়ে বসতবাড়ি তৈরি করলে সহজে সরানো যায়, এরকম বাড়ি তৈরি করা
- নদীর পাড়ে ফলজ, বনজ ও মাটির ক্ষয়রোধকারী গাছ লাগানো
- অপরিবর্তিত নির্মাণকাজ না করা অর্থাৎ পানিপ্রবাহে বাধা প্রদান না করা
- পরিবর্তিতভাবে নদী ড্রেজিং করা
- নদীর কিনারে ফেরি জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নদীভাঙা জমি জেগে উঠলে জমির মূল মালিক অথবা তার উত্তরসূরিদের বন্দোবস্ত প্রদান করা
- নদীভাঙা মানুষের অধিকার সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়নে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বলিষ্ঠ উদ্যোগ প্রয়োজন এবং সেই উদ্যোগে দলমত-নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর নাগরিকের সহযোগিতা প্রদান করা
- খাস জমি বরাদ্দের ব্যাপারে নদী ভাঙা মানুষদের অগ্রাধিকার প্রদান করা
- নদীভাঙা এলাকায় অপরিবর্তিত নির্মাণ কাজ বন্ধ করা, যেমন- বাঁধ, রাস্তা, গ্রোয়েন, বোল্ডার ইত্যাদি
- পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে আরও বিজ্ঞানমুখী করা
- নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে সরকারের আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া
- স্বল্প খরচ সম্পন্ন গ্রহনির্মাণের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

SEASON ঋতু

Season ঋতু

ঋতু হচ্ছে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভূপৃষ্ঠের কোনো একটি স্থানের জলবায়ুর ধরন। মহাকাশে সূর্যের অবস্থান সাপেক্ষে পৃথিবীর অক্ষের অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে ঋতু পরিবর্তন সংঘটিত হয়। নাতিশীতোষ্ণ অক্ষাংশসমূহে চারটি ঋতু সনাক্ত করা যায় : বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীত। ক্রান্তীয় অঞ্চলসমূহের রয়েছে দুটি ঋতু : শুষ্ক ও আর্দ্র। ভারত মহাসাগরের আশপাশে অবস্থিত মৌসুমি এলাকাসমূহে তিনটি ঋতু : শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা।

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এ দেশে ঋতুর আবির্ভাব ঘটে এবং সেগুলি পর্যাক্রমে আবর্তিত হয়। ঋতুগুলির তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ একটি থেকে অপরটিতে পৃথক। ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। যদিও বাংলাদেশের জলবায়ু প্রধানত উপক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতির তথা উষ্ণ ও আর্দ্র, তথাপি প্রচলিত বাংলা বর্ষপঞ্জিতে বছরকে ছয়টি ঋতুতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা : গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। প্রতি দুই মাস অন্তর ঋতু বদল হয়। উল্লেখ্য যে, সব সময় নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ঋতু পরিবর্তন সীমাবদ্ধ থাকে না, কখনো কখনো কোনো কোনো ঋতুর শুরু ও শেষ কিংবা ব্যাপ্তিতে পরিবর্তন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে সুস্পষ্ট তিনটি ঋতু

বিদ্যমান : মার্চ মাস থেকে মে মাস (ফাল্গুন-চৈত্র থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) পর্যন্ত বিরাজমান প্রাক মৌসুমি গ্রীষ্মকাল, জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় থেকে আশ্বিন-কার্তিক) পর্যন্ত বিরাজমান মৌসুমি বায়ুসৃষ্ট বর্ষাকাল এবং মধ্য-অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগ (কার্তিক-অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ-ফাল্গুন) পর্যন্ত বিরাজমান শুষ্ক শীতকাল। বাস্তবিকভাবে, মার্চ মাসকে বসন্তকাল এবং মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর পর্যন্ত সময়কালকে হেমন্তকাল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

Summer গ্রীষ্মকাল

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল মাসের মধ্যভাগ থেকে জুন মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত) এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মের দিনগুলো উষ্ণ ও শুষ্ক। তবে সাধারণত মার্চের মাঝামাঝি থেকেই গরম পড়তে শুরু করে। গ্রীষ্মের দাবদাহে নদীনালা, খালবিলসহ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে যায়। এই ঋতুতে দিন বড় আর রাত ছোট হয়। এ সময় পশ্চিমা মৌসুমি বায়ু দেশের ওপর দিয়ে বইতে শুরু করে। আবার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শীতল ও শুষ্ক বায়ুও প্রবাহিত হয়। মহাসাগর থেকে আগত বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে শীতল ও শুষ্ক বায়ু মুখোমুখি পরস্পরের সংস্পর্শে এলে তা প্রবল ঝড়ের রূপ ধারণ করে। ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের এই দুটি বায়ুপুঞ্জসৃষ্ট ঝড়কে কালবৈশাখী নামে আখ্যায়িত করা হয় যার ধ্বংসাত্মক রূপ এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের কাছে অতি পরিচিত।

Rainy Season বর্ষাকাল

বাংলা বর্ষের দ্বিতীয় ঋতু এবং এর স্থিতি আষাঢ় ও শ্রাবণ (জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত) এই দুই মাস। শরৎ ও হেমন্ত ঋতু দুটি বর্ষা ঋতুর সামান্য পরিবর্তিত চেহারা মাত্র। বর্ষাকালে আবহাওয়া সর্বদা উষ্ণ থাকে। এ সময় দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প বহন করে আনে, যার প্রভাবে বর্ষার আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের ৮০ ভাগেরও অধিক বর্ষাকালেই হয়ে থাকে। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের দরুন অধিকাংশ প্রাচীনভূমিই বর্ষাকালে প্রাবিত হয়ে পড়ে। স্থানীয় উচ্চতাভেদে বন্যার গভীরতা ও স্থায়িত্বকাল দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- সিলেট, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ ও পাবনা জেলার বিল, ঝিল ও হাওড়াসমূহ বছরে ছয় মাসেরও অধিককাল ধরে প্রাবিত থাকে। এ সময় গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের জন্য নৌকা হয়ে ওঠে প্রধান মাধ্যম।

Autumn শরৎকাল

বর্ষার অবসানে তৃতীয় ঋতু শরৎ এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে আবির্ভূত হয়। ভাদ্র ও আশ্বিন (আগস্ট মাসের মধ্যভাগ থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত) মিলে শরৎকাল। এ সময় নীল আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়, তবে তখনো মাটিতে থাকে বর্ষার সরসতা। ভাদ্র (সেপ্টেম্বর) মাসে তাপমাত্রা আবার বৃদ্ধি পায়, আর্দ্রতাও

সর্বোচ্চে পৌছে। শরতে ভোরবেলায় ঘাসের উগায় শিশির জমে। শরতের শেষে রোদের তেজ আস্তে আস্তে কমতে থাকে। শরৎকালে বনে-উপবনে শিউলি, গোলাপ, বকুল, মল্লিকা, কামিনী, মাধবী প্রভৃতি সুন্দর ও সুগন্ধি ফুল ফোটে। বিলে-বিলে ফোটে শাপলা আর নদীর ধারে কাশফুল। এ সময় তালগাছে তাল পাকে। হিন্দুদের দুর্গাপূজাও এ সময় অনুষ্ঠিত হয়।

Late Autumn হেমন্তকাল

বাংলা বর্ষের চতুর্থ ঋতু। বাংলা বর্ষপঞ্জিতে এর ব্যাপ্তিকাল কার্তিক ও অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য ডিসেম্বর) মাস জুড়ে। মূলত হেমন্তকাল হচ্ছে শরৎ ও শীতকালের মধ্যবর্তী একটি পরিবর্তনশীল পর্যায়। দিনের শেষে তাপমাত্রার ব্যাপক পতনের ফলে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই বিকেলে হিম পড়তে শুরু করে আর ঘাসের ওপর জমে শিশির; কুয়াশাও দেখা যায় প্রায়ই। সাধারণভাবে সর্দি, কাশি, জ্বর প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। হেমন্ত কালে মাঠে মাঠে থাকে সোনালি ধান। এ সময় চাষিরা ধান কেটে ঘরে তোলে এবং ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব শুরু হয়।

Winter শীতকাল

ষড়ঋতের পঞ্চমতম এবং উষ্ণতম গ্রীষ্মের বিপরীতে বছরের শীতলতম অংশ। বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুসারে পৌষ ও মাঘ (মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি) এই দুই মাস শীতকাল হলেও বাস্তবে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতের ঠাণ্ডা অনুভূত হয়।

এ সময় সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থান করে বলে বাংলাদেশের সূর্যের রশ্মি তির্যকভাবে পতিত হয় এবং তাপমাত্রার পরিমাণ থাকে কম। জানুয়ারি মাসে গড় তাপমাত্রা দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে ১১° সে থেকে করে উপকূলীয় অঞ্চলে ২০°-২১° সে পর্যন্ত বজায় থাকে। দেশের দক্ষিণাংশের তুলনায় উত্তরাংশে শীতের তীব্রতা বেশি থাকে। প্রবল শৈত্যপ্রবাহে দেশের উত্তরাঞ্চলে অনেক সময় প্রাণহানিও ঘটে থাকে। শীতকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে উচ্চচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এই উচ্চচাপ কেন্দ্র থেকে পূর্বমুখী শীতল বায়ুর একটি প্রবাহ গতিশীল হয় এবং বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

শীতকাল প্রধানত শুষ্ক। বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের মাত্র ৪ শতাংশ এই ঋতুতে সংঘটিত হয়ে থাকে। গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পশ্চিম ও দক্ষিণে ২ সেমি.-এর কম থেকে উত্তর-পূর্বে ৪ সেমি.-এর সামান্য কিছু বেশি হয়ে থাকে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত জলীয়বাস্পপূর্ণ বায়ুর প্রভাবে শীতকালে কিছুটা বৃষ্টিপাত হয়। এই বায়ু ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে মোটামুটিভাবে গঙ্গা অববাহিকা অনুসরণ করে প্রবাহিত হয়। শীতের রাত্রি হয় দীর্ঘ।

Spring বসন্তকাল

বাংলা বর্ষপঞ্জির সর্বশেষ ঋতু। শীতের পরই বসন্তকালের শুরু। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস (ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগ থেকে এপ্রিলের মধ্যভাগ পর্যন্ত) নিয়ে বসন্তকাল হলেও শুধু

মার্চ মাসেই ঋতুটির সংক্ষিপ্ত অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এই ঋতুতে বায়ু নানা দিক থেকে প্রবাহিত হয়, কোনো নির্দিষ্ট দিকে স্থির থাকে না। এ সময়টি নাতিশীতোষ্ণ। মার্চ মাসে সারা দেশে গড় তাপমাত্রা ২২° থেকে ২৫° সে-এর মধ্যে ওঠান-নামা করে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকে মাত্র ৫০ থেকে ৭০ ভাগ। এ ঋতুতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই সুন্দর।

TORNADO টর্নেডো

Tornado টর্নেডো

টর্নেডো এমন এক ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যার কোনো পূর্বাভাস নেই, সতর্কতা নেই, আচমকা আঘাত হেনে মুহূর্তে সবকিছু লুণ্ঠন করে দেয়। জানমালের ব্যাপক ক্ষতি করে। এক কথায় বলা যায়, টর্নেডো হচ্ছে এক ধরনের প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়। সমুদ্রে নিম্নচাপের ফলে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় এবং টর্নেডোর উৎপত্তি হয় স্থলভাগে। অত্যধিক গরম ও তীব্র রোদের কারণে কোনো স্থানের বাতাস হালকা হয়ে ওপরে উঠে গেলে ওই স্থানের ফাঁকা জায়গা পূরণের জন্য তীব্র বেগে চারদিক থেকে বাতাস প্রবেশ করে। চারদিক থেকে আসা তীব্র ঘূর্ণি বাতাসের প্রবাহকে টর্নেডো বলে। টর্নেডো ঘূর্ণি বাতাসের সঙ্গে বজ্র মেঘসহ হাতির ঠুঁড়ির আকারে ঘুরতে ঘুরতে ভূমিতে আঘাত হানে। বাংলাদেশে সাধারণত চৈত্র মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে টর্নেডো হয়ে থাকে। কখনো কখনো অস্বাভাবিকভাবে

শীত দ্রুত শেষ হয়ে গেলে ফাল্গুন মাসের শেষ দিকে টর্নেডো হয়। টর্নেডো সৃষ্টি হতে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের মতো অত সময় লাগে না। টর্নেডো সৃষ্টি হতে খুব কম সময় লাগে। টর্নেডোর স্থায়িত্বকাল খুবই স্বল্প সময়ের হয়ে থাকে। এই স্বল্পসময়েই ব্যাপক ক্ষতি বয়ে আনে।

Causes of Tornado টর্নেডোর কারণ

কোনো এলাকার তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে, বায়ু উত্তপ্ত হয়ে উপরে উঠে যায় এবং উক্ত এলাকা বায়ুশূন্য হয়ে পড়ে, তখন শূন্য এলাকা পূরণ করতে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বায়ু প্রচণ্ড বেগে আসতে শুরু করে। ছুটন্ত এই বায়ু তখন ফাঁকা এলাকায় ঢুকে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে, এই ঘূর্ণায়মান বাতাসটিকে ঠুঁড়ির মতো দেখায়। যতই ভেতরের দিকে এই ঘূর্ণি বাতাস অগ্রসর হয় ততই এর কেন্দ্রে শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রচণ্ড গতির সঞ্চারণ করে। এই ঠুঁড়ির মাঝখানটি থাকে ফাঁকা এবং এই ফাঁকা অংশ দিয়ে বায়ু উত্তোলন ক্ষমতা বেড়ে যায়। উপরের দিকে ধাবমান এই বায়ুর অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয় বজ্রপাত ও বৃষ্টি। অতি অল্প সময়ে প্রচণ্ড বেগের এই বায়ু বাড়িঘর, গাছপালা ও সকল বস্তু সম্পদ ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়।

Duration of Tornado টর্নেডোর স্থায়িত্ব

প্রতিটি টর্নেডো স্বল্পকালীন সময়ের জন্য হয়ে থাকে। টর্নেডো কয়েক সেকেন্ড থেকে ১ ঘণ্টার বেশি সময় পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

তবে অধিকাংশ টর্নেডো ১০-২০ মিনিট স্থায়ী হয় এবং অতিক্রান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার মতো হতে পারে। যদিও আকারে এটি ক্ষুদ্র, কিন্তু যখন আঘাত হানে তখন ওই অঞ্চল সম্পূর্ণই ধ্বংস করে দেয়।

Sound of Tornado

টর্নেডোর শব্দ

টর্নেডোর আভাস পাওয়া যায় এর শব্দ শুনে। তবে টর্নেডোর এই শব্দ নির্ভর করে টর্নেডোটা কী আঘাত করছে এবং তার আকৃতি, তীব্রতা, দূরত্ব ইত্যাদির ওপর। তবে সাধারণত টর্নেডো অনবরত গুড়গুড় আওয়াজ করে যা শুনলে মনে হয় যেন নিকটেই ট্রেন যাচ্ছে। লোকালয়ে আঘাত করা টর্নেডো একসঙ্গে নানা ধরনের শব্দ করে।

Effects of Tornado

টর্নেডোর প্রভাব

এই বিধ্বংসী ঝড়ে জানমালের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। যেমন : মানুষের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে ফেলে এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন উপড়িয়ে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ব্যাঘাত ঘটায়, গাছপালা ভেঙে ফেলে ও ক্ষেতের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে, লঞ্চ, স্টিমার ও সড়ক যানবাহনকেও দুর্ঘটনায় পতিত হয়, টিউবওয়েল উপড়ে ফেলে পানি সংকট সৃষ্টি করে, স্যানিটারি ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, রাস্তার ওপর গাছ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন লাইন ভেঙে পড়ে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীর্ণ কুটিরগুলো মুহূর্তে

উড়িয়ে নিয়ে তাদের জীবনে বাড়তি দুর্দশা টেনে আনে, অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

Preparedness

প্রস্তুতি

টর্নেডোর পূর্বে কিছু প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। যেমন : বাড়িঘর শক্ত কাঠামোর ওপর নির্মাণ করা, বসতঘর ও গোয়ালঘরের চালা খুঁটির সঙ্গে শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে রাখা, ভারি জিনিসপত্র, কাঠের টুকরা, খোলা টিন, চাষের যন্ত্রপাতি, লোহা ইত্যাদি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে না রাখা, ঝড়ের গতি-প্রকৃতির ওপর নজর রাখা, আকাশে হাতির গুঁড়ের মতো মেঘ দেখলেই আশপাশের সবাইকে সতর্ক করে দেয়া, সম্ভব হলে সবাইকে নিয়ে দ্রুত কাছাকাছি পাকা দালানে ওঠা, ঘরের বাইরে বা উঠানে ছোট্টাছুটি না করা। মনে রাখতে হবে, টিন খুলে এসে, গাছের ডাল ভেঙে যে কেউ আহত হতে পারে।

Nor-wester

কালবৈশাখী

গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কালবৈশাখী। সাধারণত এই কালবৈশাখী এপ্রিল-মে মাসে উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে। কোনো এলাকার ভূপৃষ্ঠ অত্যধিক তাপমাত্রা অথবা অন্য কোনো কারণে উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বায়ুমণ্ডল যথেষ্ট অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে এবং এই ঝড়ের জন্ম হয়। উত্তপ্ত, হালকা ও অস্থির বায়ু উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠতে থাকে এবং সমতাপীয় সম্প্রসারণ (Adiabatic Expansion) প্রক্রিয়ার বায়ুর স্তর সম্পৃক্ত

বিন্দুতে (Saturation Point) না পৌঁছানো পর্যন্ত শীতল হতে থাকে এবং কিউমুলাস মেঘ সৃষ্টি হয়। বায়ুমণ্ডলের অস্থিরতা অব্যাহত থাকলে কিউমুলাস মেঘ উল্লম্বভাবে কিউমুলোনিম্বাস মেঘ গঠন করে এবং পরবর্তী সময়ে বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হয়, যা সবার কাছে কালবৈশাখী নামে সুপরিচিত। সাধারণত বর্ষাের সঙ্গে এই ঝড়ের মূল পার্থক্য হচ্ছে, এই ঝড়ের সঙ্গে সব সময়ই বিদ্যুৎ চমকায় ও বজ্রপাত হয়। এটি একটি তাপগতিক (Thermodynamic) প্রক্রিয়া সেখানে ঘনীভবনের সুপ্ত তাপ দ্রুত উর্ধ্বারোহী বায়ুস্রোতের গতিশক্তিতে (Kinetic Energy) রূপান্তরিত হয়।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের তাপমাত্রা পূর্ববর্তী মাসগুলোর (শীতকালের মাসগুলো) তুলনায় দ্রুত বাড়তে থাকে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে সারা দেশে, বিশেষ করে দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে দৈনিক তাপমাত্রা সর্বোচ্চ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুর উপস্থিতি কালবৈশাখী সৃষ্টির পূর্বশর্ত। বাংলাদেশে কালবৈশাখী সৃষ্টির প্রধান কারণ হচ্ছে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আসা উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু, যা উর্ধ্ব ২ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠে থাকে এবং উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম দিক থেকে আসা অপেক্ষাকৃত শীতল ও শুষ্ক বায়ুর সঙ্গে মিলিত বা মুখোমুখি হয়। উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু ছোটনাগপুর মালভূমিতে সৃষ্টি হয়ে পূর্বদিকে ধাবিত হয়ে বাংলাদেশের সীমায় উপস্থিত হয়। বিপরীতধর্মী ও অসম এই দুই বায়ু-প্রবাহের মুখোমুখি হওয়ার ফলে প্রাক-

কালবৈশাখীর সৃষ্টি হয়।

কালবৈশাখীর জীবনচক্রকে তিনটি ধাপ বা পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়, যেগুলি উর্ধ্বগামী অথবা নিম্নগামী বায়ুস্রোতের মাত্রা এবং গতিবিধি দ্বারা নির্ণীত হয়ে থাকে। কালবৈশাখীর পর্যায়গুলো হচ্ছে- কিউমুলাস বা ঘনীপুঞ্জীভবন পর্যায় (Cumulus Stage), পূর্ণতা পর্যায় (Mature Stage), বিচ্ছুরণ পর্যায় (Dissipation Stage)। একটি কালবৈশাখী পূর্ণতা লাভের ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট পর এর তীব্রতাহ্রাস পেতে থাকে এবং বিচ্ছুরণ পর্যায়ে প্রবেশ করে। অতি দ্রুত হারে তাপমাত্রা হ্রাস, মেঘে প্রচুর জলীয়বাষ্পের উপস্থিতি এবং বায়ু পুঞ্জীভূত উর্ধ্বাচলনের দরুন কালবৈশাখীর সঙ্গে শিলাপাত একটি সাধারণ ঘটনা। শিলার আকার নির্ভর করে মেঘের ভেতরে বায়ুর উর্ধ্ব চলাচল হার এবং এর উচ্চ জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতার ওপর। বিদ্যুৎ চমকানো এবং বজ্রপাতও কালবৈশাখীর সাধারণ ঘটনা। মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্নে ভূপৃষ্ঠ সর্বাধিক উত্তপ্ত হয় এবং বায়ুমণ্ডলে পরিচলন স্রোত সৃষ্টিতে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা প্রধান ভূমিকা পালন করায় কালবৈশাখী সাধারণত শেষ বিকেলে শুরু হয়। বাংলাদেশে পশ্চিমাঞ্চলে শেষ বিকেলে এবং সন্ধ্যার পূর্বে কালবৈশাখীর আগমন ঘটে, কিন্তু পূর্বাঞ্চলে সাধারণত সন্ধ্যার পরে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগমন করে থাকে। এই ঋতুতে সকাল বেলাটা মোটামুটি শান্ত থাকে। কালবৈশাখীর বায়ুর গড় গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারের বেশিও হতে পারে।

TSUNAMI সুনামি



Tsunami সুনামি

Tsunami বা সুনামি জাপানি শব্দ। ‘সু’ অর্থ বন্দর এবং ‘নামি’ অর্থ ঢেউ সুতরাং সুনামি অর্থ হলো বন্দরের ঢেউ। এটি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সমুদ্রতলদেশে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস এবং নভোজাগতিক ঘটনা সুনামি সৃষ্টি করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সুনামিকে পৃথিবীর তৃতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সুনামির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মহাসাগর ও সাগরের তলদেশের প্লেট দুমড়ে দেয়া, যার ফলে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড ভূমিকম্প। সমুদ্রের পানি লক্ষ লক্ষ টনের বিশাল ঢেউ তৈরি করে। আর এই ঢেউ যত বেশি তীরভূমির কাছাকাছি যায় আরও দীর্ঘ হয়ে ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসে রূপ নেয়। এই ঢেউয়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০০ থেকে ৮০০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। খোলা সমুদ্রে ঢেউয়ের

উচ্চতা তিন ফুট পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু ঢেউ যতই তীরের দিকে যায় ততই শক্তি সঞ্চয় করে, বাড়ে উচ্চতা। তখন ঢেউয়ের এক মাথা থেকে আরেক মাথার দূরত্ব হতে পারে ১০০ মাইল পর্যন্ত। অগভীর পানিতে সুনামি ধবংসাত্মক জলোচ্ছ্বাসে রূপ নেয়। অগ্রসরমাণ জলরাশি ভয়ঙ্কর স্রোত সৃষ্টি করে নেমে যাবার আগে ১০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। উপকূলের ব্যাপক এলাকা প্লাবিত করতে পারে। উপকূলীয় জনপদ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

সুনামির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো ভূমিকম্পের মতো সুনামি সম্পর্কেও পূর্বাভাস দেয়া যায় না। ফলে সুনামির সৃষ্টি হলেও উপকূলীয় জনপদের লোকজনদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সাম্প্রতিককালের ভয়ঙ্কর সুনামি

২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর স্মরণকালের ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের কাছাকাছি ভারত মহাসাগরের তলদেশে সৃষ্টি হয়েছিল ট্যাক্টনিক ভূমিকম্প। সুমাত্রার ভূমিকম্পটির কেন্দ্র বা ইউরেশিয়ান প্লেট ও অস্ট্রেলিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে সৃষ্টি হয় মারাত্মক ভূকম্পন। রিখটার স্কেলের এই ভূকম্পনের ফলে ভারত মহাসাগরের একাংশ সুমাত্রার অন্য একটি অংশকে সজোরে চাপ দেয়। এই প্রবল চাপে সমুদ্রতলের ৬০০ মাইলব্যাপী। এলাকায় ভাঙনের সৃষ্টি হয়। এই ভাঙনের ফলে স্থানচ্যুতি ঘটে লক্ষ লক্ষ টন জলরাশির। বিশাল জলরাশি ভয়ানক বেগে ধেয়ে আসে সমুদ্রপৃষ্ঠের দিকে এবং বিশাল সব ঢেউয়ের আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঢেউ মহাপ্লাবনে রূপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, থাইল্যান্ড,

মালদ্বীপ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া ছাড়িয়ে কেনিয়া, সোমালিয়াসহ ১২টি আফ্রিকান দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

জলোচ্ছ্বাসে তিন লক্ষের মতো মানুষ নিহত হয়। একমাত্র ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার আচেহ প্রদেশে নিহত হয়েছে এক লক্ষ দশ হাজার মানুষ। তারপর বেশি লোক নিহত হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। সুনামির জলোচ্ছ্বাসে ভারত মহাসাগরের বহু ছোট ছোট দ্বীপ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এসব দ্বীপে বসবাসকারী বহু আদিবাসী গোষ্ঠী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবে সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছে শিশু ও নারী। মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে হাজার হাজার মানুষ।

ভূতত্ত্ববিদ ও সমুদ্র বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই সুনামির তীব্রতা এতটাই প্রবল ছিল যে, পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে কিছুটা নড়ে যায়। এ ছাড়া ভূকম্পনের ফলে যে বিপুল পরিমাণ বিকিরণ হয় তা সাড়ে নয় হাজার পারমাণবিক বোমার সমান ক্ষমতাসম্পন্ন।

সমুদ্র তলদেশে ব্যাপক ভাঙনের ফলে এতদিনকার ভারত মহাসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের দিকনির্দেশনার মানচিত্র এলোমেলো হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, নতুন করে ভারত মহাসাগরের নৌচলাচলের মানচিত্র তৈরি করতে হবে। নইলে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

সুনামি ও বাংলাদেশ

২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সুনামিতে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হয়নি। কারণ অগভীর পানিতে সুনামি তার শক্তি হারায়। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত অগভীর পানি বিস্তৃত। এই অগভীর পানিতে এসে সুনামি শক্তি হারিয়ে ফেলে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর

চেয়ে সুনামিতে বাংলাদেশের ক্ষতি সামান্য। কুয়াকাটার সমুদ্র উপকূলে সে সময় মাছ ধরা ট্রলার ডুবে দুজন জেলে মারা পড়েছিল, এমন খবর শোনা গিয়েছিল।

১৭৬২ সালের ২ এপ্রিল বঙ্গোপসাগরের আরাকান অঞ্চলে সংঘটিত এক ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট সুনামি বাংলাদেশের আঘাত হেনেছিল। কক্সবাজার ও পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। এর প্রভাবে ঢাকার বুড়িগঙ্গায় হঠাৎ পানি বেড়ে যাওয়ায় যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে শত শত নৌকা ডুবে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছিল।

দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শব্দ

Advocacy

অধিপারামর্শ

ল্যাটিন শব্দ ‘Advoca’ থেকে অ্যাডভোকেসি পরিভাষায় উৎপত্তি। যার অর্থ তৃণমূলের কণ্ঠস্বর। বাংলা প্রতিশব্দে এটি ওকালতি, দেন-দরবার, অধিপারামর্শ, সপক্ষতা ইত্যাদি। বৃহত্তর অর্থে আন্দোলন, চাপ প্রয়োগ, ক্যাম্পেইন, উন্নয়ন রাজনীতি, তদবির, লবিং, কাউকে অনুকূলে আনা, কাউকে নিজ মতে নিয়ে আসা, সচেতনতা, সপক্ষ অবলম্বন, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, প্রভৃতি অ্যাডভোকেসি কনসেপ্টের অন্তর্ভুক্ত।

এক কথায় বলা যেতে পারে অ্যাডভোকেসি হচ্ছে কোনো কিছুর পক্ষ গ্রহণ ও সেই পক্ষের অনুকূলে ওকালতি করা। এখানে পক্ষ হিসেবে কোনো বিষয়, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে কথা বলা। এটি একটি যোগাযোগ প্রক্রিয়া। এই যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সহায়তায় নীতি ও কর্মানুশীলনের পক্ষে ওকালতি করা হয়। অ্যাডভোকেসি হচ্ছে কোনো বিদ্যমান আইন বা জননীতি সংস্কার বা নতুন আইন প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা, যাতে প্রণীত নীতিটি অধিকতর গণমুখী হয়। এখানে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অন্য কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান ও সমাজের অংশের সঙ্গে জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে হয়। নীতি প্রণয়নের ফলে যারা সরাসরি সুফল ভোগ করবে অ্যাডভোকেসি প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয়। অ্যাডভোকেসির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে- জননীতি বা আইন প্রণয়ন, সংস্কার ও বাস্তবায়নে চাপ প্রয়োগ, সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রকল্প

ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও মানোন্নয়ন। আধুনিক কল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সমাজের প্রতিটি স্তরের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য উন্নয়ন ভাবনায় নতুনতর সংযোজন হিসেবে অ্যাডভোকেসির গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়-এর অধীনে সিডিএমপি’তে অ্যাডভোকেসি কম্পোনেন্ট রয়েছে যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন।

Agenda 21

এজেন্ডা ২১

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জ্যানিরো শহরে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন-বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত অন্যতম দলিল। সারা বিশ্বের পরিবেশ সমস্যাগুলোকে বিষয়ভিত্তিকভাবে বিন্যস্ত করে সরকারি-বেসরকারি বা ব্যক্তি পর্যায়ে কী কী ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যিক তার বর্ণনা রয়েছে এই দলিলে। বিশাল আকৃতির এ দলিলে আছে ৪ পর্বের ৪০টি অধ্যায়। প্রথম পর্বে প্রস্তাবনা, দ্বিতীয় পর্বে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা, তৃতীয় পর্বে মুখ্য গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা ও চতুর্থ পর্বে বাস্তবায়ন পদ্ধতি। অধিকাংশ অধ্যায়ে এই কর্মসূচিগুলো একাধিক কর্মক্ষেত্রের অধীনে বিন্যস্ত। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে প্রথমত রয়েছে তার যৌক্তিকতা বা ভিত্তি, দ্বিতীয়ত লক্ষ্য, তৃতীয়ত কর্মকাণ্ড এবং সর্বশেষে বাস্তবায়ন পদ্ধতি। এজেন্ডা ২১ বাস্তবায়নের ব্যাপারটি পরিবীক্ষণের জন্য

পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের অধীনে কমিশন অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গঠন করা হয়েছে।

Barrage

বাঁধ

Barrage বা বাঁধ হলো একটি যান্ত্রিক কৌশল বা ব্যবস্থা, যার দ্বারগুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে নদীর পানিপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রবল বন্যার সময় অতিরিক্ত পানি নির্গমনের জন্য বাঁধের দ্বারগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। প্রয়োজনে পানি ধরে রাখা এবং নির্গমনের জন্য বাঁধের সঙ্গে দ্বার-সংযুক্ত নির্গমন পথ থাকে। পানিপ্রবাহকে খালের মাধ্যমে ভিন্ন পথে পরিচালনার জন্যও বাঁধ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। সাধারণত কংক্রিট (চুন, বালি, সুরকির মিশ্রণ) দ্বারা বাঁধ নির্মিত হয়, এর নির্গমনপথের দ্বার বা কপাটগুলো ইম্পাতনির্মিত। বাঁধে বিভিন্ন ধরনের কপাট ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে সাধারণ ধরনের কপাটগুলো উলম্বভাবে একটি নিয়ন্ত্রক কাঠামোর মধ্যে সহজে ওঠানামা করানো যায়। বাঁধগুলো এমনভাবে নির্মিত হয়ে থাকে, যাতে সহজে দ্বারগুলোকে খাড়াভাবে উঠিয়ে বাঁধের তলদেশে পানিপ্রবাহ বাধাহীন রাখা যায়। এ ছাড়াও খালের মধ্যে পানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধের মূল নিয়ন্ত্রক পলি এবং বন্যার পানি খালে প্রবেশও নিয়ন্ত্রণ করে। বাঁধের কাজের মধ্যে এ ছাড়াও প্রবল বন্যার পানি বিকল্প পথে মুক্ত করা, পলি নিয়ন্ত্রণে যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জলাধার হতে পলির স্তর নিষ্কাশন এবং মাছ চলাচলের পথ বাধাহীন রাখা উল্লেখযোগ্য।

Beneficiary

উপকারভোগী

কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচি থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা উপকৃত হয় তাদের উপকারভোগী বলা হয়।

Capacity

সক্ষমতা

সক্ষমতা বলতে আমরা বুঝি বিপদাপন্নতা মোকাবিলার জন্য যে সকল ইতিবাচক দিক থাকে যা কোনো প্রয়োজনে ফলপ্রসূভাবে সাড়া প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ ক্ষমতা হলো একাধিক বিষয়াদি যেমন- প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয় থেকে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোনো সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকূল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে।

Change Agent

চেষ্টা এজেন্ট

সমাজের অগ্রসর ব্যক্তি যারা যে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে জনগণের মাঝে সংযোগ রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করেন, একাত্মতা ঘোষণা করেন তাকে Change Agent হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মী, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, চার্চের ফাদার, প্যাগোডার মঙ্ক (Monk), শিক্ষক-শিক্ষিকা, এনজিও কর্মী ও

দলনেতা, সমাজকর্মী, সাংস্কৃতিককর্মী, সাংবাদিক, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বর, স্বেচ্ছাসেবক, সমাজসেবী প্রমুখ অগ্রসর গণ্যমান্য ব্যক্তিই হচ্ছেন চেঞ্জ এজেন্ট (Change Agent)।

Evaluation

মূল্যায়ন

মূল্যায়ন হলো কোনো উদ্যোগের লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে কি না তা নিরূপণ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত ও রেকর্ডপত্র বিচার বিশ্লেষণ করা এবং লক্ষ্য অর্জনে পিছিয়ে থাকলে তার কারণসমূহ চিহ্নিত করে উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করা। এ ধরনের বিশ্লেষণ যখন নিয়মিতভাবে চলতে থাকে তখন তাকে বলে চলতি মূল্যায়ন। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, একটি নির্দিষ্ট সময় সমাপ্ত হওয়ার পর কোনো কর্মসূচি কিংবা তার বিশেষ কোনো অংশের লক্ষ্যমাত্রা কতটা অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপ করাকে মূল্যায়ন বলে।

El-Nino

এল-নিনো

এল-নিনো প্রকৃতপক্ষে মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটি ঘটনা। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু উপকূল থেকে প্রবাহিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর ঘন আন্তরণ বিস্তার করে আছে। আবহাওয়াবিদগণ একে চিহ্নিত করেছেন ‘এল-নিনো’ নামে। এল-নিনো একটি স্প্যানিশ শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে ‘যিশু শিশু’। সাধারণত ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময়ে এর উৎপত্তি হয়ে থাকে বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এল-নিনোর প্রভাবে মহাসাগরীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা ৪-৫

ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, গড়ে প্রতি ৭ বছর পরপর এল-নিনোর আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু ১৯৯০ সালের পর থেকে এল-নিনো আবির্ভূত হচ্ছে একটার পর একটা। ১৯৯৫-৯৬ সালের পর আবার ১৯৯৭-৯৮ সালে এল-নিনো আবির্ভূত হয়েছে। ১৯৯৭ সাল ছিল এল-নিনো বর্ষ। ১৯৮২ সালের এল-নিনোকে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ এল-নিনো বলা হয়। এই এল-নিনোর প্রভাবে আনুমানিক ২০০০ অমূল্য জীবন ঝরে গেছে এবং তিন বিলিয়ন ডলারের সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহকে এল-নিনোর প্রভাব বলে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন। বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশের ১৯৮৮ সালের বন্যা, ১৯৯৭ সালের নজিরবিহীন শৈত্যপ্রবাহ, ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যাকে এল-নিনো প্রভাবের কারণ বলে অভিহিত করছেন। তবে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা ১৯৫৭, ১৯৭২ ও ১৯৮২ সালকে বাংলাদেশের জন্য এল-নিনো বর্ষ হিসেবে গণ্য করেন।

Embankment

বেড়িবাঁধ

মাটি বা শিলা দ্বারা নির্মিত উঁচু পৃষ্ঠবিশিষ্ট প্রাচীরসদৃশ স্থাপনাকে Embankment (বেড়িবাঁধ) বলে। বন্যার পানি ধারণ ও প্রতিরোধ করা অথবা সড়ক, রেলপথ, খাল ইত্যাদি নির্মাণে এরূপ স্থাপনার প্রয়োজন হয়। প্রচলিত বাংলায় এটিকে বেড়িবাঁধও বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের বেড়িবাঁধের মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ একটি, যা বন্যা নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রতিরোধের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়। নিম্নভূমি অঞ্চলে বন্যা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নদীতীর এবং তীর-ভূমি থেকে কিছুটা দূরে বন্যার পানি

ধরে রাখার জন্য নির্মিত বেড়িবাঁধকে কান্দা বা জলাশ্রোত প্রতিরোধী বাঁধও বলা হয়, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলা হয় লেভি বা ডাইক। এ ধরনের বাঁধের অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ এবং নির্গমনের ব্যবস্থা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে।

গত কয়েক দশক জুড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের আওতায় মোট ৭,৫৫৫ কিমি দীর্ঘ বেড়িবাঁধ নির্মিত হয়েছে (এর মধ্যে সমুদ্র তীরবর্তী বেড়িবাঁধের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,০০০ কিমি)। এ ছাড়া এই কর্মসূচির আওতায় আছে প্রাকৃতিক অববাহিকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নদীর স্রোতধারাকে বেগবান করা, নদীর গতিধারার পরিবর্তন, তীর রক্ষা এবং নদীর ভাঙন প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড।

Empowerment

ক্ষমতায়ন

১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে ক্ষমতায়ন শব্দটি একটি জনপ্রিয় পরিভাষা হয়ে ওঠে এবং তা কল্যাণ, উন্নয়ন, অংশগ্রহণ, দারিদ্র্য বিমোচনের মতো শব্দগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়। ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, একটি প্রক্রিয়া যা দিয়ে মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়। বিশেষভাবে বলা যায়, ক্ষমতায়ন হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং প্রভাবিত করার অধিকার, সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জন। এর জন্য দরকার জ্ঞান, আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস। ক্ষমতায়ন সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করে। ক্ষমতায়ন তাই একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া ও সেই প্রক্রিয়ার ফল।

Ecosystem

প্রতিবেশ

সাধারণত জীবজগৎ এবং তাদের স্বাভাবিক আবাসই হলো Ecosystem। কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসরত জীবসম্প্রদায়ের বিভিন্ন সদস্যের সাথে ঐ স্থানের জড় উপাদানসমূহের সকল সদস্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে অনুকূল বসবাসরীতি গড়ে ওঠে তাকে Ecosystem বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী জীবগোষ্ঠী, তাদের পরিবেশ এবং জীবগোষ্ঠী ও পরিবেশের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন জালিকাকার গঠনকেই Ecosystem বলা হয়। বিজ্ঞানী ট্যানসলে বলেছেন, ‘একটি জীবগোষ্ঠী এবং তাদের ভৌত পরিবেশ যখন আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বাস্তবস্থানগত একক হিসেবে কাজ করে তখন তাকে Ecosystem বলে।’ এ বাস্তবস্থানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বা নির্দিষ্ট এককের মধ্যে উৎপাদক, খাদক এবং বিয়োজকসমূহের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

Famine

দুর্ভিক্ষ

খাদ্য সরবরাহে ঘাটতির কারণে অথবা খাদ্যের অভাবে কোনো এলাকার মানুষের অনাহারজনিত চরম অবস্থাকে দুর্ভিক্ষ বলে। সাধারণত কোনো এলাকায় ফসলহানি ঘটলে এবং সেখানে প্রয়োজন মেটানোর মতো খাদ্য সরবরাহ না থাকলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খরা, বন্যা জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি ভূপ্রাকৃতিক বৈরিতা, গবাদিপশুর মড়ক বা রোপিত ফসলের রোগ, পঙ্গপাল ও অন্যান্য

কীটপতঙ্গ বা ইঁদুরেরাও অনেক সময় দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী হতে পারে। ক্রটিপূর্ণ পরিবহন ও দুর্গম যোগাযোগ-ব্যবস্থা এবং অপরিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থার কারণে অনেক জনপদে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছে।

শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ও পরিবহন ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রভাব দুর্ভিক্ষের প্রকৃতি ও ধারণা উভয়কে আমূল পাল্টে দিয়েছে। অধুনা এ কথা স্বীকার্য যে মানুষকে অল্পের অধিকার প্রদানে ব্যর্থতার মধ্যেই দুর্ভিক্ষের কারণ নিহিত। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, খাদ্য থাকাটাই খাদ্য সরবরাহের একমাত্র পূর্বশর্ত নয়, এ ক্ষেত্রে বহুবিধ মধ্যবর্তী শক্তির প্রভাব ক্রয়ক্ষমতাকে বিপন্ন করে।

Thunderstorms

বজ্রঝড়

বজ্রঝড় এক প্রকার ক্রান্তীয় ঝড়, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানো সহযোগে সংঘটিত ভারি বর্ষণ অথবা শিলাবৃষ্টি। গ্রীষ্মের উষ্ণ ও আর্দ্র দিনে উত্তপ্ত বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠতে থাকে এবং দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের বজ্রমেঘ উৎপন্ন করে। ঝড়োপূর্ণ এই মেঘ সচরাচর উল্লম্বভাবে প্রায় ৮ কিমি দীর্ঘ এবং প্রায় ৫ কিমি পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে থাকে। সাধারণত একেকটি পৃথক বজ্রঝড় নিয়ে একটি সম্মিলিত বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হয়, যা প্রায় ৩০ কিমি পর্যন্ত প্রশস্ত হতে পারে এবং ৫ ঘণ্টার অধিককাল স্থায়ী হয়। এমনকি একটি একক বজ্রঝড়ও ৫০ কিমি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হয়ে একটি অতিকায় বজ্রঝড়ের রূপ নিতে পারে। এ ধরনের বজ্রঝড়ে প্রচুর শিলাবর্ষণ, শক্তিশালী বাতাস, অধিক বজ্রপাত এবং ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানোর

ঘটনা ঘটে থাকে।

বাংলাদেশে মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে এবং বর্ষা মৌসুমের শেষদিকে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সন্ধ্যার দিকে প্রচণ্ড তীব্রতা সহকারে বজ্রঝড় সংঘটিত হয়ে থাকে। গ্রীষ্মেও প্রথমভাগে এ ধরনের বজ্রঝড় ‘কালবৈশাখী’ নামে এবং বর্ষা ঋতুর শেষভাগে ‘আশ্বিনের ঝড়’ নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

Global Warming

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

সাধারণত গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে যে ক্রমশ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন। পৃথিবীপৃষ্ঠে জীবজগতের বেঁচে থাকার জন্য একটি সহনীয় মাত্রার তাপমাত্রা একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রা হচ্ছে ১৫° সে.। যেহেতু সৌরবিকিরণই পৃথিবীর তাপমাত্রার প্রধান এবং একমাত্র উৎস, তাই পৃথিবীর গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় পৃথিবীপৃষ্ঠে সৌরবিকিরণজনিত তাপশক্তির যোগান এবং উৎপাদনের ভারসাম্যের ওপর। সূর্য থেকে নির্গত Infrared Radiation বা অতি বেগুনি রশ্মির ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ এবং তৎসংলগ্ন বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়। পৃথিবীর তাপ বৃহৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যযুক্ত বেগুনি রশ্মি তাপীয় বিকিরণ হিসেবে পুনর্বিকিরণের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে পুনরায় ফিরে যায় এবং বায়ুমণ্ডল থেকে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়। এভাবে পৃথিবী থেকে তাপশক্তির যোগান ও ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কিন্তু বায়ুদূষক হিসেবে কার্বনডাই-অক্সাইড-এর সিএফসি দ্বারা পৃথিবীর ভারসাম্যের পরিবর্তন হতে পারে। সূর্যরশ্মি থেকে নির্গত গড় তাপমাত্রার একটি

নির্দিষ্ট অংশ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল শোষণ করে নেয় এবং বাকি অংশ ভূপৃষ্ঠে ফিরে যায়। কিন্তু যখন তাপমাত্রা শোষণের পর বেশি পরিমাণ ভূপৃষ্ঠে নির্গত হয় তখন পৃথিবী ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা Global Warming নামে পরিচিত।

HIV/AIDS

এইচআইভি/এইডস

এইডস (Acquired Immune Deficiency Syndrome/AIDS) হলো বিশেষ এক রোগ নির্দেশক লক্ষণ যখন এইচআইভি (Human Immuno-deficiency Virus/HIV) নামক ভাইরাস মানুষের শরীরে রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা ধ্বংস করে। ফলে শরীরের রোগ সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা থাকে না। এই রোগের নির্দেশক লক্ষণসমূহের চূড়ান্ত অবস্থার নামই এইডস।

এইডস-এর প্রাথমিক অবস্থায় বেশিরভাগ রোগী লক্ষণশূন্য থাকে। কিন্তু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে প্রায় এক থেকে তিন সপ্তাহ জ্বর থাকে। ওজন হ্রাস, দীর্ঘস্থায়ী উদরাময় এবং লসিকাগ্রন্থির বৃদ্ধি এইডস রোগের প্রধান লক্ষণ। এইচআইভি ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার পর রক্ত পরীক্ষায় ধরা পড়তে ৩ থেকে ৬ মাস সময় নেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগী কোনো রোগ লক্ষণের প্রকাশ ছাড়াই ১৫ বছর পর্যন্ত বাহক পর্যায়ে থেকে যেতে পারে। রোগ একবার বিকশিত হলে আর চিকিৎসা করে নিরাময় করা যায় না। উন্নত দেশগুলোতে এইডস নিয়ে লোকে তিন বছর এবং উন্নয়নশীল দেশে এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে দেখা যায়।

সংক্রামিত রোগীর রক্ত, বীর্য বা জরায়ুরসের সঙ্গে যদি অন্য লোকের রক্ত, শরীর রস বা মিউকাস আবরণের সংস্পর্শ ঘটে, তাহলে এইচআইভি ভাইরাস বিস্তার লাভ করে। রোগ সঞ্চারের পদ্ধতির মধ্যে যৌনসহবাস ও দূষিত রক্ত গ্রহণ অন্যতম। সংক্রামিত মা থেকে শিশুর দেহে গর্ভাবস্থায় বা প্রসবকালে এমনকি জন্মের পর সন্তান পালনকালেও এ রোগ ছড়াতে পারে।

Hot Spring

উষ্ণ প্রস্রবণ

ভূগর্ভস্থ পানি যদি কোনোভাবে ম্যাগমা স্তরে প্রবেশ করে তবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই উত্তপ্ত পানি ভূপৃষ্ঠের কোনো ফাটল বা ছিদ্র পথে নির্গত হলে তাকে উষ্ণ প্রস্রবণ বলে। আন্ডেয়গিরি অঞ্চলে উষ্ণ প্রস্রবণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে।

Lanina

ঠাণ্ডা বাতাস

লানিনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিয়ামক। লানিনা স্পেনিশ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বালিকা। লানিনা হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট ঠাণ্ডা বাতাস। সাধারণত এল-নিনো সৃষ্টির পরবর্তী সময়ে লানিনা সৃষ্টি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাপমাত্রা এল-নিনো অবস্থার চেয়ে সাধারণত গড়ে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যায় এবং সমুদ্রের চেউও তুলনামূলক উত্তাল হয়ে ওঠে। এ সময় সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে। এশিয়া অঞ্চলে বায়ুতে অপেক্ষাকৃত চাপ কম থাকায় জলীয়বাষ্প-সমৃদ্ধ বাতাস উপকূলের দিকে ধাবিত হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়। বায়ুপ্রবাহের এ অবস্থাতে লানিনা বলা হয়ে থাকে।

Lithosphere অশ্বমণ্ডল

ভূগাঠনিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পৃথিবীকে তিনটি সমকেন্দ্রিক মণ্ডলে ভাগ করা হয়। এ তিনটি মণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তরে অশ্বমণ্ডল অবস্থিত। ভূপৃষ্ঠ এবং ভূ-অভ্যন্তরের সামান্য অংশ এর অন্তর্ভুক্ত। এই মণ্ডলটি অপেক্ষাকৃত লঘু উপাদান দ্বারা গঠিত। এর মধ্যে সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়ামই অধিক। এর জন্য এই স্তরকে সিয়াল (Sial) স্তরও বলে। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬০ কি.মি. পর্যন্ত ভূগভীরে এই মণ্ডলটি অবস্থিত।

Latitude অক্ষাংশ

নিরক্ষরেখা হতে উত্তর বা দক্ষিণে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে অক্ষরেখা বলে। কৌণিক দূরত্ব বলা হয় এ কারণে যে, পৃথিবীর কেন্দ্র হতে অক্ষরেখার দূরত্ব পরিমাপ করা হয়। এগুলো বস্তুত কাল্পনিক রেখা। এগুলোকে সমাক্ষরেখাও বলে। অক্ষরেখার মান বা ডিগ্রিকে অক্ষাংশ বলে। যেমন, ৬০ ডিগ্রি অক্ষাংশ। অক্ষাংশকে ডিগ্রি মিনিট এবং সেকেন্ডে ভাগ করা হয়।

Marshland বিল

বিল হচ্ছে বৃহৎ আকৃতির প্রাকৃতিক জলাধার, যেগুলোতে ভূপৃষ্ঠ থেকে অভ্যন্তরীণ ও পৃষ্ঠ নিষ্কাশনের মাধ্যমে বয়ে আসা পানি জমা হয়, তাকে বিল বলা হয়। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এই অবভূমিগুলো দেখতে পাওয়া যায় এবং এগুলোর অধিকাংশই ভূমিক্ষয়ের

মাধ্যমে সৃষ্ট নিচু ভূসংস্থান ধরনের। বিল শব্দটি বৃহত্তর কুমিল্লা, ফরিদপুর, ঢাকা ও পাবনা জেলাতেই বেশি ব্যবহৃত হয়। জলাভূমির বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ক্ষুদ্র পিরিচের মতো অবনমনকে বিল বলা হয়। অনেক বিলই শীতকালে শুকিয়ে যায়, কিন্তু বর্ষার প্রশস্ত, তবে অগভীর জলাধারে পরিণত হয়। এগুলোকে স্বাদু পানির উপহ্রদও বলা যেতে পারে।

কখনো কখনো নদীতে শত শত বছর ধরে পলি জমার কারণে নদীর তলদেশ ও পাড় এত উঁচুতে উঠে যায় যে, নদী আশপাশের এলাকার চেয়ে উঁচু অনুভূমিক তল দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। এ ধরনের এক জোড়া সমান্তরাল নদীর মধ্যবর্তী এলাকাটি এক প্রকারের খাদে পরিণত হয় এবং অবশেষে এটিই বিল নামে অভিহিত হয়।

বাংলাদেশের সুরমা-মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থার সক্রিয় বদ্বীপ এলাকায় বিভিন্ন আকার আকৃতির প্রচুর বিল দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সম্ভবত এক হাজারেরও বেশি বিভিন্ন আকারের বিল রয়েছে। বিগত কয়েক দশকে দেশের বড় বিলগুলো যথেষ্ট পরিমাণে সংকুচিত হয়ে গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে চলন বিলের আয়তন ছিল ১,০৮৫ বর্গ কিমি, কিন্তু ১৯০৯ সালে এর আয়তন হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬৪ বর্গ কিলোমিটারে, যার মধ্যে কেবল ৮৫ বর্গ কিমি এলাকায় সারা বছর পানি থাকত। বর্তমানে তা আরও সংকুচিত হয়ে মাত্র ২৬ বর্গ কিমি হয়েছে।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য আকৃতির বিল হলো- বড় বিল (পীরগঞ্জ), তাগরাই বিল (কুড়িগ্রাম), লুনিপুকুর (রংপুর), বড় মির্জাপুর, নড়াইল ও

কেশপাথার বিল (বগুড়া)। চকচকি, সাবুল, ঘুগলি, কাঞ্চন, মালদা, উত্তরাই, হিলনা, কুমার ও সোনা বিল আত্রাই নদীর পুরাতন প্রবাহপথের ওপর বা আশপাশেই অবস্থিত। দক্ষিণাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বিলগুলো হলো- বয়রা, ডাকাতিয়া, বড় বিল, কোলা, পটলা, চাতাল ও শ্রীরামপুর বিল। কাতলা, চাতাল, নগরকান্দা, চান্দা ইত্যাদি দেশের মধ্যাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বিল। পূর্বাঞ্চলের বিলগুলো আকারে তুলনামূলক ছোট। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু বিল বর্ষা মৌসুমে প্রাবিত হয়ে একটি অন্যটির সঙ্গে একাকার হয়ে যায় এবং তখন এগুলোকে স্থানীয় হাওর বলা হয়। বর্ষার সময় সাধারণত বিলের গভীরতা অনেক বেশি থাকে এবং পাড়ের জমিগুলো প্রধানত বোরো বা অন্য কোনো জলিধান চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিল গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমির কাজ করে এবং এগুলো মূল্যবান মাছ ও অন্যান্য প্রাণিকুলের আবাসস্থল হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

Monsoon মৌসুমি বায়ু

দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ুতে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তারকারী বায়ুপ্রবাহ। গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে সমুদ্র ও ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ এবং শীতলতার তারতম্যের ফলে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের দিকও পরিবর্তিত হয়। শীত মৌসুমে শুষ্ক মৌসুমি বায়ু উত্তর-পূর্ব দিকে (ভূভাগ) থেকে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম (সমুদ্রভাগ) থেকে ভূমি অভিমুখে প্রবাহিত হয়। মৌসুমি বায়ুর ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘মুনসুন’ (Monsoon) মূলত আরবি শব্দ ‘মাওসিম’ (Mawsim) থেকে এসেছে।

আরবিতে ‘মাওসিম’ শব্দের অর্থ কাল বা ঋতু। ধারণা করা হয়, এই মৌসুমি বায়ুচক্রটির সূত্রপাত ঘটে ১ কোটি ২০ লক্ষ বৎসর পূর্বে (মধ্য মায়োসিন) হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টির সময় থেকে।

গ্রীষ্মকালে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রচণ্ড তাপের কারণে নিম্নচাপ কেন্দ্রের উৎপত্তি হয়, কিন্তু একই সময়ে তুলনামূলকভাবে শীতলতর ভারত মহাসাগরের সৃষ্টি হয় উচ্চচাপ কেন্দ্রের। বায়ুচাপের প্রকৃতিগত অভিন্নতাই উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ুকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত করে এবং মৌসুমি বায়ু সমুদ্র থেকে ভূমির দিকে প্রবাহিত হয়। বায়ুপ্রবাহের এই ধরনটি গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু হিসেবে পরিচিত। ভারতীয় উপমহাদেশে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প বহন করে আনে। তাই এ অঞ্চলে সে সময় ভারি বৃষ্টিপাত হয়। বিশেষ করে, বাংলাদেশ ও ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহ এই বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে।

ভারত মহাসাগর অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু দুটি শাখায় বিভক্ত : আবার সাগর এবং বঙ্গোপসাগর প্রবাহ। আরব সাগর বায়ুপ্রবাহটি ভারতের কেন্দ্রভূমি এবং ভারতীয় উপদ্বীপের আবহাওয়ার প্রকৃতির ওপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের মৌসুমি বায়ুপ্রবাহটি মূলত বাংলাদেশ, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল এবং হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণাংশের পাহাড়ি ঢাল ও পাদদেশীয় অঞ্চলের আবহাওয়ার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। জুন মাসের প্রথম দিকে এই বায়ুপ্রবাহ বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং ভারতের কেন্দ্র অঞ্চল জুড়ে অবস্থানরত নিম্নচাপ

কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে।

শীত মৌসুমে ভারত মহাসাগরের পানির তুলনায় এর সংলগ্ন ভারতীয় ভূখণ্ডে দ্রুত শীতল হয়ে আসে। পরিণতিতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ জুড়ে একটি উচ্চচাপ কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর ভারত মহাসাগর অভিমুখে প্রবাহিত হয়, যা শীতকালীন মৌসুমি বায়ু নামে পরিচিত। এই বায়ুপ্রবাহের একটি ধারা মোটামুটি গঙ্গার প্রবাহপথ ধরে গাঙ্গেয় সমভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় বাংলাদেশ অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে ধাবিত হয়। এই মৌসুমে বায়ু-প্রবাহের বৈশিষ্ট্য হলো ভূমি থেকে সমুদ্র অভিমুখী, স্বভাবতই পুরো মৌসুমে গুরু আবহাওয়া বিরাজ করে। এ সময় বৃষ্টিপাতের ঘটনা খুব কম।

Mock or Simulation মহড়া

মহড়া শব্দটির সঙ্গে আমরা কম-বেশি সবাই পরিচিত। মহড়ার প্রচলন অনেক আগে থেকে। প্রয়োজনের তাগিদেই যেকোনো কাজ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য কাজটির সঙ্গে জড়িতরা মহড়ার আয়োজন করতেন এবং এখানে করেন। উদাহরণস্বরূপ আদিম যুগের কথা বলা যেতে পারে, যখন মানুষ পশু শিকার করে নিজেদের আহার নিশ্চিত করত। এই চূড়ান্ত শিকারের আগে তারা বারবার মহড়া চর্চার মাধ্যমে কীভাবে পশু শিকার করবে এবং কে কোন দায়িত্ব পালন করবে সে বিষয়ে কৌশল রণ্ড করত। ফলে হিংস্র পশু শিকার করাটা তাদের পক্ষে অনেক সহজ ছিল। এবার সামরিক বাহিনীর কথায়

আসা যাক, যুদ্ধজয়ের রণকৌশল কী হবে? শত্রুর মোকাবিলায় কে কী ভূমিকা পালন করবে ইত্যাদি বিষয়গুলো পৃথিবীর সব দেশের সেনাবাহিনী মহড়া আয়োজনের মাধ্যমে এখনো চর্চা করে। শিল্প-সাংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সাফল্যের পূর্বশর্ত মহড়া। দেশের বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অনেক আগে থেকেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা সৃষ্টির কার্যকর কৌশল হিসেবে মহড়া আয়োজন করে আসছে। এ দেশে অধিকাংশ অক্ষরজ্ঞানহীন এবং প্রায় নিরক্ষর মানুষকে তথ্যসচেতন করার ক্ষেত্রে মহড়া পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। যদিও ভূমিকম্প সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে অতীতে মহড়া বাস্তবায়নের ঘটনা আমাদের জানা নেই এবং বাস্তবায়নের কোনো প্রতিষ্ঠিত রূপরেখা নেই। তবে আমাদের বিশ্বাস, পরীক্ষামূলকভাবে ভূমিকম্প সম্পর্কে জনগণও সচেতন করতে এই মহড়া বাস্তবায়ন রূপরেখা জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পক্ষকে সঠিক দিকনির্দেশনা দানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

Poverty দারিদ্র্য

Poverty বা দারিদ্র্য হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক অবস্থা, যখন একজন মানুষ জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান অর্জনে এবং স্বল্প আয়ের কারণে জীবনধারণের অপরিহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় করতে অক্ষম হয়। দারিদ্র্যের দৃশ্যমান প্রতীক হচ্ছে অপুষ্টি, ভগ্নস্বাস্থ্য, জীর্ণশীর্ণ বাসস্থান, নিরক্ষরতা এবং বেকারত্ব অথবা আধা বেকারত্বে জর্জরিত রুগ্ন-দুর্বল

মানুষ। স্বচ্ছাচারিতা ও আগ্রাসন, জনসংখ্যার চাপ, অর্থনৈতিক দুর্দশা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দারিদ্র্য সৃষ্টি করে।

দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণ করা হয় সাধারণত ভোগ অভ্যাস এবং ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় করে একটি খাদ্য তালিকা চিহ্নিত করার মাধ্যমে। যা নির্দিষ্ট পরিমাণ পুষ্টি অর্থাৎ একজন ব্যক্তি প্রতিদিন ২,১১২ কিলো ক্যালরি এবং ৫৮ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করবে। পরবর্তী সময়ে উল্লিখিত খাদ্যতালিকার ব্যয় অপেক্ষা ১.২৫ গুণ কম মাথাপিছু আয়সম্পন্ন পরিবারগুলোর মধ্যম শ্রেণীর দরিদ্র এবং নির্ধারিত প্রারম্ভিক আয়ের চেয়ে ৮৫% কম মাথাপিছু আয়সম্পন্ন পরিবারগুলোকে চরম দরিদ্র পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রাক্কলন অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের ৪৭.১% লোক দারিদ্র্যসীমা এবং ২৪.৬% লোক চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। অপরদিকে, শহরাঞ্চলের ৪৯.৭% দারিদ্র্যসীমা এবং ২৭.৩% চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র্যের আপতন ও স্তর পরিমাণের জন্য বিবিএস ১৯৯৫ সালে মৌলিক চাহিদার খরচ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যকে দরিদ্র এবং অনপেক্ষ দরিদ্র- এ দু'ভাগে চিহ্নিত করা হয় এবং দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৫.৬% অনপেক্ষ দরিদ্র ও ৫৩.১% দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত হয়। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক পরিমাপের ক্ষেত্রে অনেকগুলো গুণগত বিষয় বা চলক তথা পুষ্টি স্বাস্থ্য, পয়োনিষ্কাশন, নিরাপত্তা, বাসস্থান সুবিধা, পানীয় জল, শিক্ষা, আয়, সম্পদের অংশীদারিত্ব ও ভোগের অধিকার এবং

সমস্যাবলির সঙ্গে মানিয়ে চলা বা সমস্যা হ্রাস করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও ক্ষমতা, ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। এসব চলক বা জীবনধারণের গুণগত প্রয়োজন এবং সংশ্লিষ্ট মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকের বিবেচনায় বাংলাদেশ ২০০০ সালে বিশ্বের ১৩২তম দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র্য পরিস্থিতির অপর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে। বিগত ৫০, ১০০ বা ১৫০ বৎসর পূর্বে আয় বন্টনের নিম্নসীমার যত সংখ্যক লোক ছিল, বর্তমানে তার সংখ্যা অনেক কম। ১৮৩০-এর দশকে কৃষি মজুরির দৈনিক হার ছিল ৬ কেজি চাউল। ১৮৮০-র দশকে ছিল ৫ কেজি অপেক্ষা সামান্য বেশি। ১৯৩০-এর দশকে একজন কৃষিশ্রমিক তার এক দিনের মজুরি দ্বারা সাড়ে পাঁচ কেজি মোটা চাল কিনতে পারত, বর্তমানে তা একই পর্যায়ে রয়ে গেছে। কিন্তু একজন কৃষক বা কৃষিশ্রমিকের জন্য একই অর্থনীতিতে শিল্প ও কৃষির বাণিজ্য শর্তে ভারসাম্য বহুলাংশে অবনমিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের একজন ব্যক্তি আরও খারাপ অবস্থায় জীবন যাপন করছে।

Region অঞ্চল

এক বা একাধিক সমধর্মী গুণসম্পন্ন পারিসারিক একক। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বা সামাজিক কোনো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে চিহ্নিত পারিসারিক কোনো এলাকা। অন্য অর্থে, পরিসরের শ্রেণী বিভাগ। যেমন; শিল্পাঞ্চল, নগরাঞ্চল ইত্যাদি।

Mainstreaming of Disaster Risk Reduction

মূলধারার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পৃক্তকরণ

বিচ্ছিন্ন পানির প্রবাহকে একটি নদীর মূলধারায় নিয়ে আসা, যেখানে এটা প্রশস্ত হবে এবং হারিয়ে না গিয়ে বা বিচ্ছিন্ন না হয়ে সহজে প্রবাহিত হতে পারবে। সে রকম সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ‘মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ’ বর্ণনা করে একটি প্রক্রিয়া যা ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমকে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন নীতি ও বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত করে একে সম্পূর্ণভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে। এর ফলে বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনায় রাখা হবে এবং প্রশাসন কাঠামোর উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই তার প্রতিফলন পড়বে। ২০০৭ সালের ৮ অক্টোবর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় উন্নয়ন পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত হয়েছে যা Mainstreaming Risk Reduction-এর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ।

Benefit of Mainstreaming Risk Reduction

ঝুঁকি হ্রাসকে মূলধারার উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করার সুবিধাসমূহ

আমরা দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে পারলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা সহজতর হবে :

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন
- জাতীয় দারিদ্র্য কমানোর উদ্দেশ্যসমূহ ও ফলাফল অর্জন
- অবকাঠামো, জীবন, অর্থনীতি, বিনিয়োগ, পরিবেশ ইত্যাদির ক্ষতি প্রতিরোধ
- টেকসই উন্নয়ন
- জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন
- বিপদাপন্ন অবস্থা কমানো
- দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমানো।

Mist

কুজ্জটিকা

গভীর ও ঘন কুয়াশা। অনেক সময় এ ধরনের কুয়াশা হতে ইলশেঙড়ির মতো বর্ষণ হয়। সাধারণ কুয়াশার চেয়ে কুজ্জটিকায় দৃশ্যমানতা বেশি হ্রাস পায়।

Micro-climate

ক্ষুদ্রাঞ্চলীয় জলবায়ু

ভূপৃষ্ঠের বৃহৎ এলাকাব্যাপী অভিন্ন জলবায়ু দেখা যায়। কিন্তু স্থানীয় ভূপ্রকৃতি বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের কারণে জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য স্থানীয়ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং বিশেষ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে। এরূপ স্থানীয় জলবায়ুকে ক্ষুদ্রাঞ্চলীয় জলবায়ু বলে। যেমন— পার্বত্য জলবায়ু, সমুদ্র উপকূলবর্তী জলবায়ু, শহুরে জলবায়ু।

North Hemisphere

উত্তর গোলার্ধ

নিরক্ষরেখার উত্তর অংশকে উত্তর গোলার্ধ বলে।

Negative Land

অনস্থিতিমূলক ভূমি

পৃথিবীর এমন কতগুলো স্থান রয়েছে, যা মানববসতির জন্য অনুপযোগী। যেমন; বঙ্গুর পর্বত এলাকা, শীতল মেরু এবং শুষ্ক মরু অঞ্চল ইত্যাদি। এসব অঞ্চলকে অনস্থিতিমূলক বা নেতিবাচক অঞ্চল বলে।

Ozone Layer

ওজোন স্তর

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর। ৮/১০ মাইল গভীরতাসম্পন্ন এই স্তরে ওজোন গ্যাস রয়েছে। ওজোন গ্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি জীবজগতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর অতি বেগুনি রশ্মি শোষণ করে নেয়। ফলে পৃথিবীর প্রাণিকূল রক্ষা পাচ্ছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, মানুষ কর্তৃক নিঃসারিত সিএফসি গ্যাসের কারণে ওজোন স্তরের ক্ষতি সাধন হচ্ছে। একে ওজোন হোল বলে।

Public Awareness

জনসচেতনতা

সাধারণ জনগণকে সংবাদ দেয়ার পদ্ধতি, বৃদ্ধিরত বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা এবং কীভাবে মানুষ বিপদ কমানোর জন্য কাজ করবে সেই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভকে জনসচেতনতা বা Public Awareness বলে। এটা বিশেষভাবে জরুরি সরকারি কর্মকর্তা ও জনসাধারণের জন্য, যারা দায়িত্ব যথাযথভাবে পূরণ করার মাধ্যমে জীবন এবং দুর্যোগপূর্ণ ঘটনা থেকে সম্পদকে বাঁচায়।

জনসচেতনতা কার্যক্রম ঝুঁকি বা বিপদ কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এটা প্রধানত জনগণের তথ্য, তথ্য প্রচার করা, শিক্ষা, বেতার অথবা টেলিভিশন এ সম্প্রচার করা, ছাপা মাধ্যমের ব্যবহার, যথাসময়ে তথ্যকেন্দ্র ও নেটওয়ার্ক এবং কমিউনিটি ও অংশগ্রহণকারী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকে।

Emergency Response

জরুরি সাড়া

দুর্যোগের সময় বা তার ঠিক পরমুহূর্তে দুর্গত জনগোষ্ঠীর জীবনরক্ষা এবং জীবন নির্বাহ করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত ত্রাণ কর্মকাণ্ডের উদ্যোগকে জরুরি সাড়া বলে।

ত্রাণ কাজের আচরণ বিধি

আন্তর্জাতিক রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রণীত ‘Code of Conduct’ ত্রাণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা। এ আচরণবিধির ধারাগুলো নিম্নরূপ:

১. মানবাধিকার বিবেচনা সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাবে।
২. বর্ণ, ধর্ম ও গ্রাহকদের জাতীয়তা নির্বিশেষে এবং কোনোরূপ সুস্পষ্ট বৈষম্য ছাড়াই ত্রাণ বণ্টন করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন/চাহিদাকেই প্রাধান্য দিতে হবে।
৩. ত্রাণ কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হবে না।
৪. ত্রাণ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি দ্বারা প্রভাবিত হবে না বা আঁজাবহ হবে না।
৫. ত্রাণ বিতরণে স্থানীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ/প্রথার স্বাভাবিক্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে।
৬. দুর্যোগে সাড়াদানের প্রক্রিয়া গড়ে উঠবে স্থানীয় সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে।

৭. ত্রাণসামগ্রী বণ্টন ব্যবস্থাপনায় উপকারভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া বের করতে হবে।
৮. ত্রাণ সাহায্যের লক্ষ্য হবে একদিকে মৌলিক প্রয়োজন মেটানো, অন্যদিকে ভবিষ্যৎ বিপর্যয় হ্রাস করা।
৯. যাদের সহযোগিতা ও সাহায্য আমরা গ্রহণ করব, তাদের প্রতি আমাদের থাকবে জবাবদিহিতার মনোভাব।
১০. আমাদের তথ্য, প্রচার-প্রচারণা এবং বিজ্ঞাপনী কর্মকাণ্ডে দুর্যোগ-কবলিতদের মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখব, কোনোক্রমেই তারা অপদার্থ/নৈরাশ্যজনক বলে বিবেচিত হবে না।

Sustainable Development টেকসই উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়ন হলো এমন একটি উন্নয়ন পদ্ধতি, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণের সুযোগ ব্যাহত না করে বর্তমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এর মূল বৈশিষ্ট্য দুটি। প্রথমত, মানুষের চাহিদা সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য— যেখানে বিশ্বের দরিদ্র মানুষের চাহিদার ওপরই মূল গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন পূরণের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশের ওপর প্রযুক্তি ও সামাজিক সংগঠন আরোপিত প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য। টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া প্রচলন ও অব্যাহত রাখার জন্য পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে একটি পদ্ধতি নিশ্চিত করা আবশ্যিক। অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোগত এমন

একটা বিবর্তন ধারা যা ভবিষ্যৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগের সম্ভাবনা নস্যাৎ না করে বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগের সর্বাধিক সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে। টেকসই উন্নয়নের একটি মূল লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি সুবিশিষ্ট অর্থনৈতিক অগ্রগতি-ধারা যা প্রজন্ম পরম্পরায় অব্যাহত থাকবে।

Salinity লবণাক্ততা

জমিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা সকল প্রকার ভূমি অবনয়নকে লবণাক্ততা বলে। সীমিত অর্থে, জমিতে মুক্ত লবণ সঞ্চয়ন ও সডিফিকেশনকে (যাকে ক্ষারীয়করণও বলা হয়ে থাকে) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সডিফিকেশন হলো বিনিময় কমপ্লেক্সে সোডিয়ামের প্রাধান্য ঘটা। অত্যধিক পরিমাণে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে সমুদ্রের লবণাক্ত পানির উপকূলীয় মৃত্তিকাতে অনুপ্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলেও লবণাক্ততার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের লবণাক্ততার ফলে সৃষ্ট ভূমি অবনয়ন অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মৃত্তিকার লবণাক্তকরণে যেসব নিয়ামক উল্লেখযোগ্যভাবে দায়ী, সেগুলো হচ্ছে :

- বর্ষা ঋতুতে (জুন থেকে অক্টোবর) জোয়ারের সৃষ্ট প্লাবন
- লবণাক্ত অথবা লবণাক্ত-স্বাদু পানির দ্বারা জলমগ্ন হওয়া
- শুষ্ক ঋতুতে (নভেম্বর থেকে মে) ভূগর্ভস্থ লবণাক্ত পানির উর্ধ্বমুখী ও পার্শ্বীয় বিস্তৃতি ঘটা।

Tides

জোয়ার-ভাটা

চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের প্রভাবে প্রতিদিন দুবার সমুদ্রের পানি নিয়মিত ও পর্যায়ক্রমে ওঠানামা করে। সমুদ্রের পানির নিয়মিত ফুলে ওঠাকে জোয়ার বলে এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে। গভীর সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার মধ্যবর্তী উচ্চতার ব্যবধান ২ ফুটের বেশি নয়। কিন্তু অগভীর এলাকায় এই উচ্চতা ২০ ফুটেরও বেশি হতে পারে।

Volcanic Bomb

আগ্নেয় গোলক

কোনো আগ্নেয়গিরি হতে বায়ুমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত তরল ম্যাগমা বৃহদাকৃতিতে জমাট বেঁধে ভূপৃষ্ঠে পড়লে তাকে আগ্নেয় গোলক বা বোমা বলে। সাধারণভাবে এগুলোর আকৃতি গোল হয়ে থাকে এবং এর পরিধি কয়েক ইঞ্চি থেকে কয়েক ফুট পর্যন্ত হতে পারে।

Volcanic Neek

আগ্নেয় গ্রীবা

আগ্নেয়গিরির যে সুড়ঙ্গপথে উত্তপ্ত গলিত ম্যাগমা নির্গত হয়, তা আগ্নেয়গিরির গ্রীবা নামে পরিচিত।

Great Firey Ring

আগ্নেয় মেখলা

প্রশান্ত মহাসাগরের উভয় উপকূল আগ্নেয়গিরির অবস্থানের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর মোট ৫২৯ জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মধ্যে ৪২১টির অবস্থান এই অঞ্চলে। এসব আগ্নেয়গিরি প্রশান্ত মহাসাগরকে মালার মতো ঘিরে আছে বলে একে আগ্নেয় মেখলা বলে।

Igneous Rock

আগ্নেয় শিলা

পৃথিবীর উত্তপ্ত ও তরল অবস্থা হতে ক্রমে শীতল হয়ে যেসব শিলার সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো আগ্নেয় শিলার অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ আগ্নেয় শিলাই পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্য একে প্রাথমিক শিলাও বলা হয়। বর্তমানে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত লাভাস্রোত হতে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। যেকোনো আগ্নেয় শিলার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এতে কোনো প্রকার স্তর বা জীবাশ্ম থাকে না। এ কারণে এই শিলাকে অন্তরীভূত শিলা নামেও অভিহিত করা হয়। ব্যাসল্ট, গ্রানাইট প্রভৃতি আগ্নেয় শিলার উদাহরণ।

Vulnerability

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা বলতে বুঝি বস্তুগত, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা, যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কার ইঙ্গিত দেয় এবং যা কোনো ঘটনাকে মোকাবিলা করার জন্য এর সক্ষমতাকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ বিপদাপন্নতা হচ্ছে জনগোষ্ঠীর জন্য কতগুলো আশঙ্কাজনক উপাদান বা পরিস্থিতি যা হতে পারে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা ভৌগোলিক। আবার একই সঙ্গে এগুলোকে প্রতিরোধ করা বা মোকাবিলা করায় জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে। সুতরাং বিপদাপন্নতার দুটি দিক রয়েছে। একদিকে তা বিরাজমান আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি, অন্যদিকে বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, অদক্ষতা ও সীমাবদ্ধতা।

Vulnerable Group Development (VGD) ভিজিডি

Vulnerable Group Development বা ভিজিডি হলো বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি খাদ্য সাহায্যদাতা সংস্থা এবং দেশের সমর্থনে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সহায়তায় বাস্তবায়নধীন একটি কর্মসূচি। উন্নয়নকাজে অংশগ্রহণের বিনিময়ে গ্রামবাংলার দরিদ্র নারীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে ভালনারেবল গ্রুপস ফিডিং (ভিজিএফ) নামে একটি ত্রাণ কর্মসূচি হিসেবে দুই বছর সময়কালের জন্য দুস্থ মহিলাদের খাদ্য সাহায্য দেওয়ার প্রাথমিক লক্ষ্যে আরম্ভ হয়েছিল। এই কর্মসূচির অধীনে ৭,৮০,০০০ দুঃস্থ মহিলাকে সম্পূর্ণরূপে খাদ্যরূপে গম ও অন্যান্য সামগ্রী দেয়া হয়। চরম দরিদ্রাবস্থায় নিপতিত মহিলাদের মৌল প্রয়োজন মেটাতে ভিজিএফ-এর মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ প্রবর্তন করা হয়।

কর্মসূচিটি পরবর্তী পর্যায়ে উন্নয়নে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে পুনর্গঠিত হয় এবং আশির দশকে মাঝামাঝি থেকে এর নতুন নাম হয় ভালনারেবল গ্রুপস ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি)। এর নতুন লক্ষ্য হয় সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাদের আত্মনির্ভরতা বাড়ানো। সরকার ১৯৯৬-এর জুলাই মাসে স্ট্রেনদেনিং ইনস্টিটিউশনস ফর ফুড অ্যাসিস্টেড ডেভেলপমেন্ট (সিফাড) নামক নতুন এক প্রকল্পের আওতায় ভিজিডি-ও প্রশাসনিক কাজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করেছে।

ভিজিডি প্রকল্প সম্পাদনের তিনটি প্রধান মাধ্যম হলো—

১. ইউনিয়নসমূহ
২. ইনস্টিটিউশনাল ফিডিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (Institutional Feeding and Development) এবং
৩. নারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Womens Training Center)।

ইউনিয়ন ভিজিডি কর্মসূচির অধীনে দুস্থ, তালুকপ্রাপ্ত ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলা, সন্তানাদিসহ পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত ও স্তন্যদায়িনী মা এবং প্রতিবন্ধী স্বামীসহ মহিলাদের খাদ্য সাহায্য দেয়া হয়। স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বাড়াতে এবং আত্মনির্ভরশীল করতে দরিদ্র মহিলাদের সেলাই, সূচিকর্ম, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, পুতুল তৈরি ও বুটিক শিল্পকর্ম ইত্যাদি কাজকর্মে দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ভিজিডির দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র ও দুস্থ গ্রামীণ মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও নিম্নতর সামাজিক অবস্থা অতিক্রমণে সাহায্য করা।

Water Balance জলস্থিতি

কোনো এলাকার মোট বৃষ্টিপাত এবং বাষ্পীভবনের পরিমাণের ভারসাম্যকে জলস্থিতি বলে। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের ফলে যেটুকু পানি জমা হয় তা আবার বাষ্পীভবনের ফলে ব্যয় হয়। অর্থনৈতিক নিয়মের মতো কোনো এলাকার পানির আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য তথা জলস্থিতি দেখা যেতে পারে। জলস্থিতির মাধ্যমে কোনো স্থানের পানির উৎস বা ঘাটতি পরিমাণ করা হয়।

Waterfall জলপ্রপাত

খাড়া বা লম্বাভাবে নিপতিত জলরাশিকে জলপ্রপাত বলে। সহজে ক্ষয়শীল নরম শিলাতে অধিশায়িত কঠিন শিলার প্রায় আনুভূমিক স্তর নদীর প্রবাহকে যেখানে বাধাগ্রস্ত করেছে সে স্থানে জলপ্রপাত সংঘটিত হয়। আবার এই প্রবাহ যেখানে অধিত্যকার খাড়া মোড়, কোনো ঝুলন্ত উপত্যকার আকস্মিক প্রান্ত বা চ্যুতি-রেখার খাড়া ঢাল বা কোনো উপকূলীয় খাড়া পাহাড়ের প্রান্তে বাধাগ্রস্ত হয় সেখানেও জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের অধিকাংশ পর্বতমালার পশ্চিমে উঁচু শৃঙ্গ ও জলপ্রপাতসহ খাড়া ঢাল রয়েছে দোহাজারী রেঞ্জের পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশ কটি উঁচু জলপ্রপাত রয়েছে— একটি ৬০ মিটার ও অন্যটি ৪০ মিটার উঁচু। চিম্বুক রেঞ্জের শুরু সাঙ্গু নদীর দক্ষিণে এবং মায়ানমারের ভেতরে তা ঢুকে গেছে। এর অন্যতম প্রধান শৃঙ্গ হচ্ছে লুলাইং (৭০২ মিটার)। লুলাইং শৃঙ্গের কাছে লুলাইং খালের শাখায় একটি জলপ্রপাত আছে, যার উচ্চতা ১০৭ মিটার। আরও দক্ষিণে উপরামপারার কাছে আরেকটি জলপ্রপাত আছে যার উচ্চতা ৪৫.৭৫ মিটার। দক্ষিণাঞ্চলীয় রেঞ্জের বেশ কিছু জলপ্রপাত রয়েছে যেগুলো ২১ মিটার পর্যন্ত উঁচু। সীতা পাহাড়ে শিলছড়ি নদীর মুখ থেকে প্রায় ৩০৫ মিটার উজানে ভুবন স্তরসমষ্টির শিলায় গঠিত একটি অনন্য ক্ষুদ্র জলপ্রপাত রয়েছে। উলম্ব জলপ্রপাতটি প্রায় ১৫.২৪ মিটার। এখানে নদীর ঢাল খাড়া হয়ে গেছে এবং ক্ষয়ের লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট, যা কাণ্ডাই থেকে ৮ কিমি পশ্চিমে অবস্থিত। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পর্বতমালায়ও কয়েকটি জলপ্রপাত আছে।

এর মধ্যে উঁচু দুটির নাম সহস্রধারা। একটি লবণাক্ষছড়া অংশে এবং অন্যটি মাইক্রোওয়েভ স্টেশন রাস্তার ইকোপার্ক। এই জলপ্রপাতসমূহ বোকাবিল স্তরসমষ্টির বেলেপাথর ও কদম শিলা দ্বারা গঠিত। লবণাক্ষছড়া অংশের সহস্রধারার উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার। এটি হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। সীতাকুণ্ড পাহাড়শ্রেণীর মিরসরাই উপজেলা অংশে ও টেকনাফ-নীলা পাহাড় শ্রেণীর দক্ষিণ নীলা ভূগঠনে কয়েকটি অপূর্ব জলপ্রপাত পাথারিয়া ভূগঠনে অবস্থিত এবং ভবন স্তরসমষ্টির শিলায় গঠিত। বাংলাদেশ সরকার মাধবকুণ্ড ও সীতাকুণ্ডের ইকোপার্কের সহস্রধারা জলপ্রপাতের কাছে পিকনিক স্পট, রেষ্টোরাঁ ও পার্কিং সুবিধা গড়ে তুলেছে। সিলেটের মৌলভীবাজারের হারারগল ভূগঠন এলাকাতেও চিত্তাকর্ষক জলপ্রপাত রয়েছে।

Weather আবহাওয়া

কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের জন্য বায়ুর তাপ, চাপ, প্রবাহ, আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির সমষ্টিক অবস্থাকে আবহাওয়া বলে।

Wild Fire দাবানল

দাবানল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অন্যতম ভয়াবহ অবস্থা। সাধারণত বায়ুতে যখন কার্বনডাই-অক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন পরিবেশে গুরুত্ব বিরাজ করে। আর এই গ্যাসগুলো বনভূমিতে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করে। ফলে বনভূমি উজাড় হয়ে যায়। যেমন, ২০০৪ সালে ইন্দোনেশিয়াতে ভয়াবহ দাবানলের প্রভাবে বিভিন্ন জাতের বৃক্ষ ও জীবের বিলুপ্তি হয়েছে।

Work Plan কর্মপরিকল্পনা

কর্মপরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার রূপরেখা বা বিবরণ। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের ব্যাপারে অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এবং ভবিষ্যতের পূর্বাভাস ঠিক করে কর্মপন্থা স্থির করার প্রক্রিয়ার ফল হচ্ছে কর্মপরিকল্পনা। কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের পথে সমস্যা সম্পর্কে আগেই ধারণা করা ও তা এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চিন্তা করে কর্মপন্থা স্থির করা, যাতে লক্ষ্য অর্জন সুগম ও সহজ হয়।

হাওর

হাওর হলো পিরিচ আকৃতির বৃহৎ ভূগাঠনিক অবনমন। বর্ষাকালে হাওরের পানিরশির ব্যাপ্তি থাকে অনেক বেশি, আর শীতকালে সংকুচিত হয়ে পড়ে। প্রধানত বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে হাওর দেখা যায়। এই হাওরগুলো নদী ও খালের মাধ্যমে জলপ্রবাহ পেয়ে থাকে। শীতকালে হাওরগুলো বিশাল, দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল প্রান্তরের রূপ নেয়, আবার বর্ষাকালে কুলহীন সমুদ্রের আকার ধারণ করে। হাওর শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'সাগর'-এর বিকৃত রূপ বলে ধারণা করা হয়।

ভূগাঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাওরের উৎপত্তি এবং মধুপুর সোপান গঠনের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। বিল অবনমিত হয় না, কিন্তু হাওর অবনমিত হয়। একসময় মেঘনা ও এর শাখানদীসমূহ দ্বারা গঠিত প্রাচীনভূমির স্থায়ী ও মৌসুমি হ্রদ নিয়েই গঠিত হয়েছিল হাওর অববাহিকা, যেখানে প্রচুর বৈচিত্র্যপূর্ণ জলজ উদ্ভিদ থাকত। কিন্তু ক্রমান্বয়িক অবক্ষিপণের কারণে অববাহিকাগুলোর

গভীরতা কমে গিয়ে চরা জেগে সেখানে হোগলা, নলখাগড়ার ঝোঁপ গজিয়ে ওঠে।

পার্ব্বর্তী ভারতের অসংখ্য পাহাড়ি নদী এই পলিভূমিতে প্রচুর পানি সরবরাহ করে। বর্ষাকালে ৬ মিটার পর্যন্ত গভীর বিস্তীর্ণ বন্যার পানিতে তলিয়ে থাকে এই অঞ্চল। শুষ্ক মৌসুমে অধিকাংশ পানি সরে যায়। দু-একটি বিলের অগভীর পানিতে গজিয়ে ওঠে প্রচুর পরিমাণে বৈচিত্র্যময় জলজ উদ্ভিদ। টানা খরা মৌসুমের শেষের দিকে পানি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে অতি উর্বর পলি মাটির বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ধানের ব্যাপক ফলনের তোড়জোড় চলে। এই অববাহিকায় রয়েছে প্রায় ৪৭টি বড় হাওর এবং বিভিন্ন মাপের প্রায় ৬,৩০০ বিল। এগুলোর মধ্যে প্রায় ৩,৫০০ স্থায়ী ও ২,৮০০ অস্থায়ী বা ঋতুভিত্তিক বিল।

হাওরগুলোকে বাংলাদেশের সবচেয়ে উৎপাদনশীল জলাভূমি হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্যাপক জীববৈচিত্র্য ধারণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে হাওরের গুরুত্ব অপরিসীম। স্থায়ী ও আভিগমনকারী পাখিদের আবাসস্থল হিসেবে হাওরগুলো সুপরিচিত। বন্যার পানি চলে যাওয়ার পর হাওরে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার ছোট মাছ, শামুক, বিনুক ইত্যাদি পাওয়া যায় এবং সেইসঙ্গে পশুচারণভূমি জেগে ওঠে। হাওর এলাকা অতিথি পাখিদের সাময়িক বিশ্রামক্ষেত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। বৈচিত্র্যময় আবাসিক ও যাবাবর জাতীয় জলজ পাখিসহ অসংখ্য হাঁসের আবাসস্থল ছাড়াও বহু বন্য প্রাণীর নিরাপদ আশ্রয় ছিল এইসব হাওর। এই জলাভূমির বনাঞ্চলে একসময় জলসহিষ্ণু হিজল (Barringtonia acutangula) ও কবোচ (Pongamia pin-nata) প্রচুর পরিমাণে জন্মাতে।

MAJOR DISASTER EVENTS IN BANGLADESH

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য দুর্যোগ তথ্যাবলী

CYCLONE

ঘূর্ণিঝড়

১৫৮৪ : বাকেরগঞ্জ এবং পটুয়াখালী জেলায় আঘাত হানে। বজ্রবিদ্যুৎসহ হারিকেনের বৈশিষ্ট্য সংবলিত এই ঝড় পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী হয়, কেবল উঁচু স্থানে স্থাপিত মন্দিরগুলো ছাড়া সমস্ত ঘরবাড়ি নিমজ্জিত হয় এবং বহু নৌযান ডুবে যায়। মানুষ ও গৃহপালিত জীব মিলিয়ে প্রায় ২০,০০,০০০ প্রাণহানি ঘটে।

১৫৮৫ : মেঘনা মোহনায় আঘাত হানে। প্রচণ্ড ঝড়ো প্লাবনের ফলে বাকেরগঞ্জের পূর্বাঞ্চল সম্পূর্ণ প্লাবিত হয়। প্রাণহানি এবং ফসলের ক্ষতি ছিল সামান্য।

১৭৯৭ (নভেম্বর) : তীব্র ঘূর্ণিঝড় চট্টগ্রাম অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। সাধারণ ঘরবাড়ি মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং চট্টগ্রাম বন্দরে দুটি জাহাজ নিমজ্জিত হয়।

১৮২২ (মে) : বরিশাল, হাতিয়া দ্বীপ এবং নোয়াখালী জেলায় তীব্র ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। সরকারি নথিপত্রাদি পানিতে ভেসে যায়, ৪০,০০০ মানুষের মৃত্যু এবং ১,০০,০০০ গবাদিপশুর জীবনহানি ঘটে।

১৮৩১ (অক্টোবর) : জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবনে বরিশাল অঞ্চল আক্রান্ত হয়। মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে (ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না)।

১৮৭২ (অক্টোবর) : কক্সবাজারের ওপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও বহু মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।

১৮৭৬ (৩১ অক্টোবর) : মেঘনা মোহনা এবং চট্টগ্রাম, বরিশাল ও নোয়াখালী উপকূলে তীব্র ঝড় জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবন সংঘটিত হয়। এই ঝড়ের সঙ্গে সংঘটিত ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল ১২.২ মিটার (৪০ ফুট)। এ সময় বিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের জলস্রোত মেঘনার মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়। এতে প্রায় ২,০০,০০০ মানুষ মারা যায়। আরও অধিক মানুষ মারা যায় দুর্যোগ-পরবর্তী মহামারী ও দুর্ভিক্ষে।

১৮৯৭ (২৪ অক্টোবর) : হারিকেনের তীব্রতাসহ প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস চট্টগ্রাম ও কুতুবদিয়া দ্বীপে আঘাত হানে। সমুদ্রতীরবর্তী মূলভূমির গ্রামসমূহ ভেসে যায়। দুর্যোগে প্রাথমিকভাবে মৃত্যু হয় ১৪,০০০ মানুষের এবং পরবর্তী সময়ে মহামারীর (কলেরা) কারণে আরো ১৮,০০০ জনের মৃত্যু হয়।

১৮৯৮ (মে) : ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবন টেকনাফে আঘাত হানে। ক্ষয়ক্ষতির সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৯০৪ (নভেম্বর) : সোনাদিয়ার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়া ঘূর্ণিঝড়ে ১৪৩ জনের মৃত্যু এবং বহু মাছ ধরার নৌকা ধ্বংস হয়।

১৯০৯ (১৬ অক্টোবর) : খুলনা অঞ্চলে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবনে ৬৯৮ জন মানুষ ও ৭০,৬৫৪টি গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।

১৯১৩ (অক্টোবর) : ঘূর্ণিঝড়ে মুক্তাগাছা উপজেলার (ময়মনসিংহ) ৫০০ মানুষের মৃত্যুসহ বহু গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়।

১৯১৭ (২৪ সেপ্টেম্বর) : হারিকেনের তীব্রতা সম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়ে খুলনায় ৪৩২ ব্যক্তি নিহত এবং ২৮,০২৯ গবাদিপশু মারা যায়।

১৯৪১ (মে) : মেঘনা মোহনার পূর্ব অংশে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বহু মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।

১৯৪২ (অক্টোবর) : তীব্র ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সুন্দরবনের প্রচুর বন্য প্রাণী মারা যায় এবং নৌযানের ক্ষয়ক্ষতি হয় (সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না)।

১৯৪৮ (১৭-১৯ মে) : চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর মধ্যবর্তী এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১,২০০ মানুষ ও ২০,০০০ গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।

১৯৫৮ সালে : মোঘনা মোহনার পূর্ব ও পশ্চিমাংশ এবং বরিশালের পূর্বাঞ্চল ও নোয়াখালীতে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ৮৭০ জন মানুষ ও ১৪,৫০০ গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।

১৯৫৮ (২১-২৪ অক্টোবর) : চট্টগ্রামের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়। এতে অসংখ্য মানুষ নিহত হয়, প্রায় এক লক্ষ পরিবার গৃহহীন হয় এবং সরকার গৃহনির্মাণ ঋণ বিতরণ করে।

১৯৬০ (৯-১০ অক্টোবর) : মেঘনার মোহনার পূর্বাঞ্চলে (নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং পটুয়াখালী) ঘন্টায় ২০১ কিমি বেগে বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সর্বোচ্চ ৩.০৫ মিটার জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয় চর জব্বার, চর আমিনা, চর ভাটা, রামগতি, হাতিয়া এবং নোয়াখালীতে। প্রায় ৩,০০০ মানুষের মৃত্যু, ৬২,৭২৫টি বাড়িঘর ধ্বংস এবং প্রায় ৯৪,০০০ একর জমির ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট ও হাজার হাজার গবাদিপশু মারা যায়।

১৯৬০ (৩০-৩১ অক্টোবর) : চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর, পটুয়াখালী এবং মেঘনা মোহনার পূর্বাঞ্চলে ঘন্টায় ২১০ কিমি বায়ুপ্রবাহ ও ৪.৬ মিটার থেকে ৬.১ মিটার জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এতে ৫,৬৮,১৬১টি বাড়িঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, বিশেষত হাতিয়া দ্বীপের ৭০% ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। দুটি বৃহৎ সমুদ্রগামী জাহাজ তীরে আছড়ে পড়ে, কর্ণফুলী নদীতে ৫-৭টি জাহাজ নিমজ্জিত হয় এবং মোট প্রায় ১০,০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটে।

১৯৬১ (৯ মে) : ঘন্টায় ১৬১ কিমি বায়ুপ্রবাহ ও ২.৪৪-৩.০৫ মিটার জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় বাগেরহাট ও খুলনা সদরের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। নোয়াখালী-হরিনারায়ণপুরের রেলযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং চর আলেকজান্ডারে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে। মোট ১১,৪৬৮ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ২৫,০০০ গবাদিপশু ধ্বংস হয়।

১৯৬২ (২৬-৩০ অক্টোবর) : ঘন্টায় ১৬১ কিমি বায়ুপ্রবাহ ও ২.৪৪-৩.০৫ মিটার জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় ফেনীতে আঘাত হানে। প্রায় ১,০০০ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ২৫,০০০ গবাদিপশু ধ্বংস হয়।

১৯৬৩ (২৮-২৯ মে) : তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কক্সবাজারসহ উপকূলবর্তী দ্বীপ কুতুবদিয়া, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, মহেশখালী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চট্টগ্রামে ৪.৩-৫.২ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়। সর্বোচ্চ বায়ুপ্রবাহ ছিল ঘন্টায় ২০৩ কিমি এবং কক্সবাজারে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ১৬৪কিমি। এই দুর্যোগে বিপুল সম্পদ বিনষ্ট হয়, কমপক্ষে ১১,৫২০ জন মানুষের মৃত্যু ঘটে, ৩২,৬১৭ গবাদিপশু মারা যায়, বাড়িঘর ধ্বংস হয়,

৩,৭৬,৩৩২টি, ৪,৭৮৭টি নৌযান নিমজ্জিত হয় এবং বহু ফসল বিনষ্ট হয়।

১৯৬৫ (১১-১২ মে) : ঘন্টায় সর্বোচ্চ ১৬২ কিমি বেগে ৩.৭ মিটার উঁচু ঝড়ো জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় বরিশাল ও বাকেরগঞ্জে আঘাত হানে। জীবনহানি ছিল প্রায় ১৯,২৭৯, বরিশালেই মৃতের সংখ্যা ছিল ১৬,৪৫৬।

১৯৬৫ (১৪-১৫ ডিসেম্বর) : কক্সবাজার ও সংলগ্ন সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা, পটুয়াখালী ৪.৭ থেকে ৬ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয় কক্সবাজার। সর্বোচ্চ বায়ুপ্রবাহ ছিল ঘন্টায় ১০ কিমি; কক্সবাজার, পটুয়াখালী এবং সোনাদিয়া, রাঙ্গাদিয়া ও হামিদিয়া দ্বীপের উপকূল এলাকায় ১০ নম্বর বিপদ-সংকেত প্রদর্শন করা হয়। কক্সবাজারের ৪০,০০০ লবণক্ষেত প্রাণিত এবং মোট ৮৭৩ জন মানুষ নিহত হয়।

১৯৬৬ (১ অক্টোবর) : সন্দ্বীপ, বাকেরগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লায় ঘন্টায় ১৪৬ কিমি বায়ুপ্রবাহসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে এবং ৪.৭ থেকে ৯.১ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়। এই দুর্যোগে মোট ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ১৫,০০,০০০ নোয়াখালী ও বাকেরগঞ্জ এলাকায় মানুষ ও গবাদিপশুর মৃত্যু যথাক্রমে ৮৫০ ও ৬৫,০০০।

১৯৬৯ (১৪ এপ্রিল) : ঢাকা জেলার ডেমরায় টর্নেডো আঘাত হানে। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৬৪৩ কিমি, মৃতের সংখ্যা ৯২২ এবং ১৬,৫১১ জন আহত, উপদ্রুত অঞ্চলে আর্থিক ক্ষতি হয় ৪ থেকে ৫ কোটি টাকা।

১৯৭০ (১২-১৩ নভেম্বর) : বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাণ ও সম্পদ বিনষ্টকারী ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়।

হারিকেনের তীব্রতা নিয়ে প্রচণ্ড বাতাস দু'দিন ধরে বারবার আঘাত হানে চট্টগ্রাম এবং সেই সঙ্গে বরগুনা, খেপুপাড়া, পটুয়াখালী, চর বোরহানউদ্দিনের উত্তরাঞ্চল, চর তজিমুদ্দিন, মাইজদির দক্ষিণাঞ্চল ও হরিণঘাটায়। স্মরককালের সর্বাপেক্ষা বেশি জীবন, সম্পদ ও ফসলের ধ্বংস সাধন হয় এই দুর্যোগে। সরকারি হিসাব মোতাবেক ৫,০০,০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল এবং ৩৮,০০০ সমুদ্রনির্ভর মৎস্যজীবী ও ৭৭,০০০ অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক হিসেবে দেখা যায় যে, ৪৬,০০০ জন অভ্যন্তরীণ মৎস্যজীবী ঘূর্ণিঝড় চলাকালে মাছ ধরার সময় মৃত্যুবরণ করে। মোট ২০,০০০-এর অধিক মাছ ধরার নৌকা ধ্বংস হয়। সম্পদ ও ফসলের ক্ষতির প্রমাণ বিশাল, দশ লাখেরও অধিক গবাদিপশুর মৃত্যু হয়, ৪,০০,০০০ ঘরবাড়ি এবং ৩,৫০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৭০ সালের এই ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘন্টায় প্রায় ২২২ কিমি এবং জলোচ্ছ্বাসের সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল প্রায় ১০.৬ মিটার। সমুদ্রে ভরা জোয়ারের সময় ঘূর্ণিঝড়টি সংঘটিত হওয়ায় এমন প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৭১ (৫-৬ নভেম্বর) : চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী অঞ্চলে তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে (ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ পাওয়া যায়নি)।

১৯৭১ (২৮-৩০ নভেম্বর) : সুন্দরবনের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘন্টায় ৯৭-১১৩ কিমি বায়ুপ্রবাহ ও এক মিটারের কম উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসসহ ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। সমগ্র খুলনা অঞ্চলে ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করে এবং খুলনা শহরের নিম্নাঞ্চল প্রাণিত হয়।

১৯৭৩ (৬-৯ ডিসেম্বর) : সুন্দরবনের উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। পটুয়াখালীর উপকূলবর্তী নিম্নাঞ্চল এবং সমুদ্র তীরবর্তী দ্বীপসমূহ প্লাবিত হয়।

১৯৭৪ (১৩-১৫ আগস্ট) : ঘন্টায় ৮০.৫ কিমি বায়ুপ্রবাহসহ ঘূর্ণিঝড় খুলনার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। প্রায় ৬০০ মানুষের মৃত্যু ও প্রচুর গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।

১৯৭৪ (২৪-২৮ নভেম্বর) : কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমুদ্র তীরবর্তী দ্বীপসমূহে ঘন্টায় ১৬১ কিমি বেগে বায়ুপ্রবাহসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় ও ২.৮-৫.২ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। প্রায় ২০০ মানুষ ও ১,০০০ গবাদিপশু নিহত হয় এবং ২,৩০০ ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়।

১৯৭৫ (৯-১২ মে) : ভোলা, কক্সবাজার এবং খুলনায় ঘন্টায় ৯৬.৫ থেকে ১১২.৬ কিমি বায়ুপ্রবাহসহ ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। ৫ ব্যক্তির মৃত্যু এবং কিছুসংখ্যক মৎস্যজীবী নিখোঁজ হয়।

১৯৭৭ (৯-১২ মে) : খুলনা, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, বরিশাল, চট্টগ্রাম এবং উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহে ঘন্টায় ১১২.৬৩ কিমি বেগে ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়। মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাণহানি এবং বেশ কিছু নৌযান নিখোঁজ (ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি) হয়।

১৯৮৩ (১৪-১৫ অক্টোবর) : উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর চরাঞ্চলে ঘন্টায় ১২২ কিমি বায়ুপ্রবাহসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। ৪৩ ব্যক্তি নিহত, ৬টি মাছ ধরার ট্রলার ও ১টি যন্ত্রচালিত নৌকা নিমজ্জিত হয়। ১৫০ জন মৎস্যজীবী ও ১০০ মাছ ধরার নৌকা নিখোঁজ

হয় এবং ২০% আমন ফসল বিনষ্ট হয়।

১৯৮৩ (৫-৯ নভেম্বর) : ঘন্টায় ১৩৬ কিমি বেগে বায়ুপ্রবাহ ও ১.৫২ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় চট্টগ্রাম, কুতুবদিয়ার সন্নিকটস্থ কক্সবাজার উপকূল ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের নিম্নাঞ্চল, টেকনাফ, উখিয়া, ময়িগং, সোনাদিয়া, বরিশাল, পটুয়াখালীর ওপর দিয়ে বয়ে যায়। ৫০টি নৌকাসহ ৩০০ মৎস্যজীবী নিখোঁজ হয় এবং ২,০০০ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়।

১৯৮৫ (২৪-২৫ মে) : তীব্র ঘূর্ণিঝড় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী এবং উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহে (সন্দ্বীপ, হাতিয়া এবং উড়িরচর) আঘাত হানে। বাতাসের গতিবেগ ছিল চট্টগ্রামে ১৫৪ কিমি/ঘন্টা, সন্দ্বীপে ১৪০ কিমি/ঘন্টা, কক্সবাজারে ১০০ কিমি/ঘন্টা এবং সেই সঙ্গে ৩.০-৪.০৬ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়। এতে ১১,০৬৯ ব্যক্তি নিহত হয় এবং ৯৪,৩৭৯টি ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত ও মোট ১,৩৫,০৩৩ পশুসম্পদ বিনষ্ট হয়। মোট ৭৪ কিমি সড়ক ও বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৮৬ (৮-৯ নভেম্বর) : উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং চট্টগ্রাম, বরিশাল, পটুয়াখালী ও নোয়াখালীর চরাঞ্চল ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়। বাতাসের গতিবেগ ছিল প্রতি ঘন্টায় চট্টগ্রামে ১১০ কিমি এবং খুলনায় ৯০ কিমি। এতে ১৪ ব্যক্তি নিহত হয় এবং ৯৭,২০০ হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয়।

১৯৮৮ (২৪-৩০ নভেম্বর) : যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং খুলনা-বরিশালের চরাঞ্চলের ওপর দিয়ে ঘন্টায় ১৬২ কিমি বেগে বায়ুপ্রবাহসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। মংলায় ৪.৫ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস হয়। এতে ৫,৭০৮ ব্যক্তি নিহত হয় এবং ৬৫,০০০ গবাদিপশু মারা

যায়। বহুসংখ্যক বন্য পশু মারা যায়- তার মধ্যে হরিণ ১৫,০০০ ও রয়েল বেঙ্গল টাইগার ৯, এবং ফসল বিনষ্ট হয় প্রায় ৯৪১ কোটি টাকার।

১৯৯১ (২৯ এপ্রিল) : এই ঝড়টিকে ‘১৯৯১-এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়’ নামে চিহ্নিত করা হয়। এটি ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল রাতে বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম করে। ঝড়টির উৎপত্তি হয় প্রশান্ত মহাসাগর, বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে ৬,০০০ কিমি দূরে। বাংলাদেশের উপকূলে পৌঁছাতে ঝড়টির সময় লেগেছিল ২০ দিন। আকারের দিক থেকে ঘূর্ণিঝড়টির বিস্তার ছিল বাংলাদেশের আকৃতির চেয়েও বড়। কেন্দ্রীভূত মেঘপুঞ্জের ব্যাস ছিল ৬০০ কিমি। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল সন্দ্বীপে ঘন্টায় ২২৫ কিমি। এ ছাড়া অন্যান্য ঝড়কবলিত অঞ্চলে বাতাসের গতিবেগ ছিল- চট্টগ্রামে ঘন্টায় ১৬০ কিমি, খেপুপাড়া (কলাপাড়া) ১৮০ কিমি, কুতুবদিয়া ১৮০ কিমি, কক্সবাজার ১৮৫ কিমি এবং ভোলা ১৭৮ কিমি। নোয়া-১১ (Noaa-11) উপগ্রহের ২৯ এপ্রিল ১৩:৩৯ ঘন্টায় তোলা দূর অনুধাবন চিত্র অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়টির বাতাসের প্রাক্কলিত সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘন্টায় প্রায় ২৫০ কিমি। স্পারসো (Sparro) সর্বপ্রথম ২৩ এপ্রিল তারিখে নোয়া-১১ এবং জিএমএস-৪ (GMS-4) উপগ্রহগুলো গৃহীত চিত্র বিশ্লেষণ করে ঘূর্ণিঝড়টিকে একটি নিম্নচাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল (যার বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৬২ কিমি-এর নিচে) নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয় ২৫ এপ্রিল। প্রাথমিক অবস্থায় ঘূর্ণিঝড়টি কিছুটা উত্তর-পশ্চিম দিকে পরে উত্তর দিকে সরে যায়। ২৮ এপ্রিল থেকে এটি উত্তর-পূর্ব দিকে সরে যাওয়া শুরু

করে এবং ২৯ এপ্রিল রাতে চট্টগ্রাম বন্দরের উত্তর দিয়ে বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম করে। ঘূর্ণিঝড়টি ৩ই দিন সন্ধ্যা থেকেই উপকূলীয় দ্বীপসমূহে (যেমন নিঝাম দ্বীপ, মনপুরা, ভোলা, সন্দ্বীপ) আঘাত হানতে শুরু করেছিল। ঘূর্ণিঝড়কালীন ঝড়ো জলোচ্ছ্বাসের প্রাক্কলিত উচ্চতা ছিল ৫ থেকে ৮ মিটার। এই দুর্যোগে জীবন ও সম্পদ ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিশাল। সম্পদের প্রাক্কলিত আর্থিক ক্ষতি ৬,০০০ কোটি টাকা। মোট ১,৫০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, গবাদিপশু মারা যায় ৭০,০০০।

১৯৯১ (৩১ মে-২ জুন) : উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং পটুয়াখালী, বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের চরাঞ্চলে ঘন্টায় ১১০ কিমি বায়ুপ্রবাহ ও ১.৯ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাণহানিসহ বেশ কিছু নৌযান নিখোঁজ হয় এবং ফসল নষ্ট হয়।

১৯৯৪ (২৯ এপ্রিল-৩ মে) : উপকূলবর্তী দ্বীপ এবং কক্সবাজারের চরাঞ্চল ঘন্টায় ২১০ কিমি বায়ুপ্রবাহসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়। প্রায় ৪০০ মানুষের মৃত্যু এবং ৮,০০০ গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।

১৯৯৫ (২১২-২৫ নভেম্বর) : উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং কক্সবাজারের চরাঞ্চলে ঘন্টায় ২১০ কিমি বেগে বায়ুপ্রবাহসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। প্রায় ৬৫০ জনের মৃত্যু ও ১৭,০০০ গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে।

১৯৯৭ (১৬-১৯ মে) : উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী এবং ভোলার বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল ঘন্টায় ২২৫ কিমি বায়ুপ্রবাহ ও ৩.০৫ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের (হারিকেন) শিকার হয়। সরকার ও

জনসাধারণের যথাযথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এই মহাদুর্যোগে ১২৬ জন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।

১৯৯৭ (২৫-২৭ সেপ্টেম্বর) : হারিকেনের তীব্রতাসম্পন্ন প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও ১.৮৩ থেকে ৩.০৫ মিটার উঁচু জলোচ্ছাস উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী এবং ভোলা চরাঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যায়।

১৯৯৮ (১৬-২০ মে) : উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও নোয়াখালীর চরাঞ্চল ঘণ্টায় ১৫০ কিমি বায়ু-প্রবাহ ও ১.৮৩ থেকে ২.৪৪ মিটার উঁচু জলোচ্ছাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়।

১৯৮৮ (১৯-২২ নভেম্বর) : উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ এবং খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালীর চরাঞ্চল ঘণ্টায় ৯০ কিমি বায়ু-প্রবাহ ও ১.২২ থেকে ২.৪৪ মিটার উঁচু জলোচ্ছাসসহ ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়।

২০০৭ (১৫ নভেম্বর) : বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সুপার সাইক্লোন সিড'র আঘাত হানে। বরগুনা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট ও পিরোজপুর জেলা এ সাইক্লোনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য জেলাগুলো হচ্ছে ঝালকাঠি, সাতক্ষীরা, খুলনা, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, বরিশাল ও ভোলা। সরকারি হিসেবে সাইক্লোন সিড'র এর কারণে ৩,৪০৬ জন লোক নিহত হয়, নিখোঁজ হয় ১,০০৩ জন। মারাত্মক আহত হয় ৫৫,০০০।

২০০৯ (২৫ মে)

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষত খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় সাইক্লোন আইলা আঘাত হানে। সরকারি হিসেবে

আইলার কারণে ১৯০ জনের প্রাণহানি ঘটে এবং পশুসম্পদ ও কৃষিজ ফসলসহ ব্যাপক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা।

FLOOD বন্যা

১৮৭১ : ব্যাপক বন্যা বিশেষ করে সিলেটের পশ্চিমাঞ্চলে। খাদ্যের অভাবে গবাদিপশুর ভোগান্তি ঘটে।

১৭৮৬ : মেঘনার বানে তীরবর্তী গ্রামের ফসল ও জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। এর প্রকোপে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে বাকেরগঞ্জে ব্যাপক প্রাণহানি হয়। ত্রিপুরায় গোমতী নদীর বাঁধ ভেঙে যায়। সিলেট পরগনা সম্পূর্ণ পানিতে তলিয়ে যায়। গবাদিপশু প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

১৭৯৪ : গোমতী বাঁধে আবার ভাঙন ও ত্রিপুরার চারপাশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি।

১৮২২ : বাকেরগঞ্জ পটুয়াখালী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত; ৩৯,৯৪০ ব্যক্তি ও ১৯,০০০ গবাদিপশু মারা যায় এবং ১৩ কোটি টাকা মূল্যের সহায়সম্পদ ধ্বংস হয়। বরিশাল, ভোলা ও মনপুরা বন্যায় দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

১৮২৫ : বাকেরগঞ্জ ও এর আশপাশে বিধ্বংসী বন্যা। জেলাটিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ বা অন্য কোনো ধরনের বন্যা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ছিল না।

১৮৩৮ : ভারি বর্ষণে রাজশাহী ও আরো কিছু জেলা ব্যাপকভাবে প্লাবিত। গোসম্পদ খাদ্যের অভাবে বিপর্যস্ত, নিমজ্জিত অঞ্চল ছেড়ে উঁচু স্থানের খোঁজে জনগণের ব্যাপক দুর্যোগ। পানি নেমে যাবার পর মহামারী আকারে কলেরার বিস্তার।

১৮৫৩ : ভারী বর্ষণ ও মেঘনা নদীর তীর ছাপানোর কারণে সিলেটের পশ্চিম অংশে প্রতিবছরের চেয়ে বেশি প্লাবন।

১৮৬৪ : বাঁধ ভেঙে গঙ্গার পানিতে রাজশাহী শহরের বৃহত্তর অংশ গভীর পানিতে তলিয়ে যায়। বহু লোকের দুর্যোগ ও গোসম্পদের ক্ষতি।

১৮৬৫ : ব্যাপক প্লাবনে রাজশাহী শহর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে রাজশাহী শহর বিপর্যস্ত।

১৮৬৭ : বিধ্বংসী বন্যার কবলে বাকেরগঞ্জ। শস্যের ব্যাপক ক্ষতি।

১৮৭১ : রাজশাহী ও আরও কিছু জেলায় ব্যাপক বন্যা। শস্য, গবাদিপশু ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্রের ক্ষতি। রাজশাহীতে রেকর্ডকৃত এযাবৎকালের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বন্যা।

১৮৭৬ : বরিশাল ও পটুয়াখালী দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। মেঘনা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬.৭১ মিটার ক্ষীত হয়ে গলাপিচা ও বাউফল ব্যাপক ক্ষতির মুখে। ২,১৫,০০০ লোকের জীবনহানি। বন্যার অব্যবহিত পরে কলেরার প্রাদুর্ভাব।

১৮৭৯ : ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবর্তন শুরুসঙ্গে সঙ্গে তিস্তায় বান।

১৮৮৫ : ভাগীরথী নদী বরাবর বাঁধ ভেঙে আবার সাতক্ষীরা মহকুমা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৮৯০ : সাতক্ষীরায় মহকুমায় আবার গুরুতর বন্যা এবং মানুষ ও গবাদিপশুর ব্যাপক ক্ষতি।

১৯০০ : ভাগীরথী নদীর বাঁধ ভেঙে আবার সাতক্ষীরা মহকুমা ক্ষতিগ্রস্ত।

১৯০২ : সিলেটে নদীপৃষ্ঠ ক্ষীত হয়ে প্রলয়ংকরী বন্যা। শস্য এবং মূল্যবান

সম্পদের ক্ষতি।

১৯০৪ : অস্বাভাবিক উঁচু জোয়ারে কক্সবাজার মহকুমা ও কুতুবদিয়া দ্বীপের কিছু অংশে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত।

১৯১৫ : ময়মনসিংহে তীব্র বন্যা। ১৮৫৯ সালে ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ পরিবর্তন হেতু তিস্তা নদীর যে বন্যা হয়েছিল তার সঙ্গে এ বছরের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি তুলনা চলে।

১৯৫৪ : ২ আগস্ট ঢাকা শহর পানির তলে নিমজ্জিত। ১ আগস্ট সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীর পানির উচ্চতা ছিল ১৪.২২ মি. এবং ৩০ আগস্ট হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে গঙ্গা নদীর পানির উচ্চতা ছিল ১৪.৯১ মি.।

১৯৫৫ : ঢাকা জেলার ৩০% এলাকা প্লাবিত। বড়িগঙ্গা ১৯৫৪ সালের সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যায়।

১৯৬২ : দুবার বন্যার পদধ্বনি। একবার জুলাই ও আরেকবার আগস্ট-সেপ্টেম্বর। বহু লোক আক্রান্ত ও মূল্যবান সম্পত্তি বিনষ্ট।

১৯৬৬ : ঢাকা জেলার অন্যতম প্রলয়ংকরী বন্যাটি হয় ৮ জুন ১৯৬৬। এ বছর সিলেট জেলাতেও বড় ধরনের বন্যা দেখা দেয়। বন্যা ছাড়াও ১৯৬৬ সালের ১২ জুন সকালে এক প্রচণ্ড ঝড়ে জেলার পরিস্থিতি আরো মারাত্মক হয়ে ওঠে। এতে প্রায় ২৫% ঘরবাড়ি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ৩৯ ব্যক্তি ও ১০,০০০ গবাদিপশু মারা যায় এবং প্রায় ১২ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ৫২ ঘণ্টা একনাগাড়ে বৃষ্টির ফলে ঢাকা শহর প্রায় ১২ ঘণ্টা ১.৮৩ মিটার পানির তলে নিমজ্জিত ছিল।

১৯৬৮ : সিলেটে ভয়াবহ বন্যা এবং প্রায় ৭ লক্ষ লোক দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

১৯৬৯ : চট্টগ্রাম জেলা বন্যার কবলে। শস্য এবং মূল্যবান সম্পদের ক্ষতি।

১৯৭৪ : ময়মনসিংহে প্রায় ১০,৩৬০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল বন্যাকবলিত। মানুষ ও গবাদি সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি ও লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত।

জুলাই-আগস্ট মাসে বন্যায় বড় ধরনের বিপর্যয়। প্রায় ৫৭,৩০০ বর্গ কি.মি. এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত (সমগ্র দেশের ৪০%-এরও অধিক এলাকা)। এ ধরনের বন্যা ৩০ থেকে ৭০ বছরে একবার ঘটে।

১৯৮৭ : দেশের ভেতরে ও বাইরে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতই বন্যার প্রধান কারণ ছিল। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাঞ্চল, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র একীভূত হওয়ার নিচের অঞ্চল, খুলনার উত্তরাংশ এবং মেঘালয় পাহাড়ের সংলগ্ন অঞ্চল বন্যাকবলিত হয়।

১৯৮৮ : আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বন্যায় ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। প্রায় ৮২,০০০ বর্গ কিমি এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত (সমগ্র দেশের ৬০%-এরও অধিক এলাকা)। এ ধরনের বন্যা ৫০ থেকে ১০০ বছরে একবার ঘটে। বৃষ্টিপাত এবং একই সময়ে (তিন দিনের মধ্যে) দেশের তিনটি প্রধান নদীর প্রবাহ একই সময় ঘটায় ফলে আরও ব্যাপ্তি ঘটে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরও প্লাবিত হয়। বন্যার স্থায়িত্ব ছিল ১৫ থেকে ২০ দিন।

১৯৮৯ : সিলেট, সিরাজগঞ্জ ও মৌলভীবাজার এলাকায় বন্যায় ৬ লাখ লোক পানিবন্দী হয়।

১৯৯৩ : সারা দেশে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে হাজার হাজার হেক্টর জমির শস্য পানিতে তলিয়ে যায়। মোট ২৮ জেলা বন্যাকবলিত হয়।

১৯৯৮ : সমগ্র দেশের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি এলাকা দুই মাসের অধিক সময় বন্যাকবলিত হয়। বন্যার ব্যাপ্তি অনুযায়ী এটি ১৯৮৮ সালের বন্যার বন্যার সঙ্গে

তুলনীয়। ব্যাপক বৃষ্টিপাত, একই সময়ে দেশের তিনটি প্রধান নদীর প্রবাহ ঘটায় ফলে ও ব্যাক ওয়াটার অ্যাফেক্টের কারণে এই বন্যা ঘটে।

২০০০ : ভারতের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের পাঁচটি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা বন্যায় বিধ্বস্ত। প্রায় ৩০ লক্ষ লোক গৃহহীন। বন্যাটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মাটির বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণে ঘটে।

DROUGHT খরা

১৭৯১ : যশোর জেলায় খরা হয় এবং বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম স্বাভাবিকের চেয়ে দুই/তিন গুণ বেড়ে পায়।

১৮৬৫ : ঢাকায় খরার কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

১৮৬৬ : বগুড়া অঞ্চলে খরার দরুন ধান উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং মূল্য স্বাভাবিকের চেয়ে তিন গুণ বেড়ে পায়।

১৮৭২ : সুন্দরবন অঞ্চলে খরার কারণে শস্য উৎপাদন কয়েক দফা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৮৭৪ : বগুড়ায় খরার জন্য শস্য বিপর্যয় ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

১৯৫১ : বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তীব্র খরার জন্য চাল উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যাহত হয়।

১৯৭৩ : বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম ব্যাপক খরা হয়, যা উত্তরবঙ্গে ১৯৭৪ সালের স্থানীয় দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী।

১৯৭৪ : এই খরায় দেশের ৪৭% অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দেশের ৫৩% লোক দুর্ভোগের শিকার হয়।

১৯৭৮-৭৯ : মোট আবাদি জমির প্রায়

৪২% ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ব্যাপক শস্যহানি ঘটে, চালের উৎপাদন প্রায় ২০ লক্ষ টন হ্রাস পায় এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৪% ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

১৯৮২ : খরার কারণে ধানের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫৩,০০০ টন। একই বছর বন্যায় ধানের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩৬,০০০।

১৯৮৯ : এই খরায় উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশের অধিকাংশ নদী শুকিয়ে যায় এবং নওগাঁ, নবাবগঞ্জ, নীলফামারী ও ঠাকুরগাঁওসহ বেশ কয়েকটি জেলার মাটি শুকিয়ে যাওয়ায় দীর্ঘসময় ধরে ধূলিধূসর পরিবেশ বিরাজ করে।

১৯৯৪-৯৫ : বাংলাদেশে সমসাময়িক কালের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী খরা, এতে ব্যাপক শস্যহানি ঘটে।

LANDSLIDES ভূমিধস

১৯৬৮ : কাপ্তাই-চন্দ্রঘোনা সড়কে গাছপালা প্রতিনিয়ত কাটার ফলে সেখানকার মাটি বর্ষাকালে বৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রকোপে পড়ে দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এর ফলে ভূমিধস ঘটে এবং আলগা মাটি ঢাল বেয়ে নিচে নেমে আসে, যা নদীবাহিত হয়ে কাপ্তাই লেকে প্রবেশ করে। এর ফলে লেক পলিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। কর্তৃপক্ষীয় হিসাবে লেকটি সৃষ্টির পর গত ৩০ বছরে পলি জমে এর প্রায় ২৫% আয়তন হ্রাস পেয়েছে।

১৯৭০ : রাউজান-ঘাগড়া-রাঙ্গামাটি সড়ক বরাবরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

১৯৯০ : ভূমিধসের ফলে রাঙ্গামাটি জেলার বাগারবিল অঞ্চলে সংযোগ সড়ক বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৯৭ : জুলাই মাসে বান্দরবানের ছড়াইপাড়ায় বড় ভূমিধস সংঘটিত হয়, মোট ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা প্রায় ৯০,০০০ বর্গমিটার। বান্দরবান শহর বা অন্য কোনো জেলা শহরে এটা ঘটলে ধ্বংসের পরিমাণ আরও ভয়াবহ হতো।

১৯৯৯ : ১১ ও ১৩ আগস্ট যথাক্রমে বান্দরবান পার্বত্য জেলা ও চট্টগ্রামে দুটি বড় ভূমিধসে ১৭ ব্যক্তি নিহত হয়। এর মধ্যে ১০ জন চট্টগ্রামে এবং বাকিরা বান্দরবানে প্রাণ হারায়। সে সময়ের অবিরাম ভারি বর্ষণ এই বিপর্যয়ের প্রধান কারণ ছিল। বান্দরবানের লামা ও আজিজনগর এই ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভূমিধসের ফলে চিত্তাপুটি, মোনারগিরি, মুন্ডা, মুসলিমপাড়া, সোলাইসারি, বাজাপাড়া, কালারগিরি, মাইশকাটা, অউজাতলী, চিওনিপাড়া ও কারিউংপাড়া গ্রাম ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২৮৩.৫০ হেক্টর কৃষিজমি, ৮১০ হেক্টর বাগান এবং ৫০ কিমি কাঁচা রাস্তা বিধ্বস্ত হয়। বান্দরবান সদর ও দূরবর্তী থানাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে, পঁচিশটি স্থানে সড়কের ওপর বিপুল পরিমাণে মাটি জমে যাওয়ায় আজিজনগর-বাজালিয়া সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। চট্টগ্রামে কোতোয়ালি থানার গোপাইপুর অঞ্চলে ১৩ আগস্ট ভূমিধস সংঘটিত হয়। ধসের চাপে পাহাড়ের পাদদেশে দুটি পর্ণকুটির বিধ্বস্ত হয়ে সেখানে ঘুমন্ত লোকজন প্রাণ হারায়।

২০০৭ : ১১ জুন শনিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ও চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়ধসের ঘটনায় ১২৭ জন নিহত হয়। অবিরাম বৃষ্টির ফলে বিভিন্ন অঞ্চল পানি ও কাদায় সয়লাব হয়ে যাওয়ায় এই দুর্যোগ সংঘটিত হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট

Organization	Website
Ministry of Food and Disaster Management	www.mofdm.gov.bd
Disaster Management Bureau	www.dmb.gov.bd
Directorate of Relief and Rehabilitation	www.drr.gov.bd
Comprehensive Disaster Management Program (CDMP)	www.cdmp.org.bd
African Center for Disaster Studies	www.acds.co.za
Africa Regional Strategy for Disaster Risk Reduction	www.unisdr.org/africa
Action Aid Bangladesh	www.actionaid.org/bangladesh
Asian Disaster Reduction Center	www.adrc.asia
Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC)	www.adpc.net
Asia-Pacific network for Global Change Research (APN)	www.apn.gr.jp
Bangladesh Disaster Preparedness Centre (BDPC)	www.bdpc.org.bd
BRAC University (Postgraduate Programs in DM)	www.bracu.ac.bd
Aon Benfield UCL Hazard Research Centre (ABUHC)	www.benfieldhrc.org
Center the Coordination for the Prevention of Natural Disasters in Central America	www.cepredenac.org
Natural Hazards Center, University of Colorado at Boulder	www.colorado.edu/hazards
Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)	www.cred.be
The Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA)	www.cdera.org
CRID- Centro Regional the Information for Disaster	www.crid.or.cr
Duryog Nivaran, South Asian Network for Disaster Risk Reduction	www.duryognivaran.org
World Institute for Disaster Risk Management	www.drmonline.net
Department for International Development (DFID)	www.dfid.gov.uk
National Drought Mitigation Center, University of Nebraska-Lincoln	www.drought.unl.edu

Organization	Website
USGS- Earthquake Hazards Program	www.earthquake.usgs.gov
Earth Summit 2002- Building Partnerships for Sustainable Development	www.earthsummit2002.org
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)	www.eclac.org
Earth quake Hazard Centre New Zealand	www.ehc.arch.vuw.ac.nz
EM-DAT: Emergency Events Database	www.emdat.be
Food and Agriculture Organization of the United Nations	www.fao.org
FEMA-get Disaster Information	www.fema.gov/hazard
United Nations Environment Programme (UNEP)	freshwater.unep.net
Geo Hazards International	www.geic.or.jp
Glide Number- a Global Referencing System for Disaster Events	www.glide-number.net
Centre for Hazards and Risk Research, Columbia University, USA	www.deo.columbia.edu/chrr
International Development Research Centre Canada	www.idrc.ca
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies	www.ifrc.org
Indian Association of Social Science Institutions	iassi.nic.in
Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)	ico.uncscu.org
IRI- The International Research Institute for Climate and Society	www.iri.columbia.edu
Integrated Regional Information Networks (IRIN)	www.irinnews.org
The Centre for Disaster Studies at JCU- James Cook University, AUS	www.jcu.edu.au
Centre for Ecology and Hydrology in U.K	www.ceh.ac.uk
NOAA's National Weather Service	www.noaa.gov
Network for Information, Response and Preparedness Activities on Disaster (NIRAPAD), Bangladesh	www.nirapad.org
Gender and Disaster Network	www.gdnonline.org
Global Fire Monitoring Center (GFMC)	www.fire.uni-firebrig.de
Pacific Disaster Centre (PDC)	www.pdc.org

Organization	Website
Relief Web	www.reliefweb.int
Rising Tide UK: Taking Action on Root Causes of Climate Change	www.risingtide.org.uk
South Asia Co-operative Environment Programme	www.sacep.org
The South-African Research and Documentation Centre	www.sardc.net
The Disaster Mitigation Institute, India	www.southasiadisasters.net
Pacific Regional Environmental Programme	www.sprep.org
Start-Global Change System for Analysis, Research & Training	www.start.org
Tyndall Centre- for Climate Change Research	www.tyndall.ac.uk
Tropical Storm Risk	www.tropicalstormrisk.com
International Tsunami Information Centre (ITIC)	www.tsunamiwave.info
Disaster Risk Science University of Cape Town, South Africa	www.uct.ac.za
International Research Committee on Disaster	www.udel.edu/drc/ircd.html
United Nations Division for the Advancement of Women	www.un.org/womenwatch/daw
United Nations Environment Programme	www.unep.org
UN-HABITAT- United Nations Human Settlements programme	www.unhabitat.org
United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)	www.unccd.int
UNESCO Earth Sciences	www.unesco.org/science/earth
International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)	www.unisdr.org
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)	www.unfccc.int
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization	www.unesco.org
United Nations Development Programme	www.undp.org
World Meteorological Organization	www.wmo.int
World Neighbors	www.wn.org

দুর্যোগ কোষ REFERENCE তথ্যসূত্র

পরিবেশ কোষ, মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
ভূবনকোষ, আব্দুল বাকী; জামাল খান
দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, অক্সফাম
সমাজবিজ্ঞান, বাংলাদেশ পরিবেশ ও সমাজ, অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ
সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণার্থীদের হ্যান্ডবুক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহায়িকা, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট, কেয়ার- বাংলাদেশ
বন্যা মোকাবেলায় পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতি, মুহম্মদ সাইদুর রহমান, মলয় চাকী
তুফান মোকাবেলায় পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতি, মুহম্মদ সাইদুর রহমান, মলয় চাকী
বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহায়িকা, প্রথম পর্ব, প্রাক-দুর্যোগ পর্যায়, মোঃ সাইদুর রহমান
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধিতা অক্টোবর ২০০৬
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল, বাংলাদেশ ডিজাস্টার
প্রিপেয়ারডনেস সেন্টার
বিদেশে গমনোচ্ছুক অভিবাসী মহিলা শ্রমিকদের জন্য ওরিয়েন্টাল মডিউল, বাংলাদেশ অভিবাসী মহিলা শ্রমিক
অ্যাসোসিয়েশন, BOMSA
প্রাকৃতিক দুর্যোগ-জনিত ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও
ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর
Asian Disaster Management News Vol. 12, No. 3, Asian Disaster preparedness Centre (ADPC)
A Primer, Disaster Risk Management in Asia, Asian Disaster preparedness Centre
A Global Report, Reducing Disaster Risk A Challenge for Development, UNDP
At Risk : Natural Hazards, people's Vulnerability and Disasters, by Ben Wisner, Piers Blaikie, Ian Davis and
Terry Camon

Bangladesh e-journal of Sociology, Bangladesh Sociological Society

At Risk : Natural Hazards, people's Vulnerability, and Disasters, by Ben Wisner, piers Blaikie, Ian Davis and Terry Camon

Bangladesh : Disasters and Public Finance, by Charlotte Benson and Edward Clay, World Bank

Building Safer Cities- The Future of Disaster Risk, Disaster Risk Management Working Paper Series No. 3, by Alcira Kreimer, Margaret Arnold and Anne Carlin

CPP, At a glance, Bangladesh Red Crescent Society

Community-based Disaster Risk Management and the Media, by Vicky Puzon-Diopenes and Zubair Murshed

Coping with Natural Hazards : Indian Context, by K. S. Valdiya

Community Based Disaster Management; empowering communities to cope with disaster risk, by hnu Pandey and Kenji Okazaki

Climate and land Degradation, by the world Meteorology Organization (WMO), 2005

Coastal Zone Management Handbook, by John R. Clark

Comprehensive Risk Assessment for Natural Hazards, by the world Meteorological Organization (WMO), 1999, reprinted 2006

Climate, drought and Desertification, by the world Meteorological Organization

Components of Risk : A Comparative Glossary, by Katharina Thywissen

Catastrophe Modeling : A new Approach to Managing Risk, by Patricia Grossi and Howard, C. Kunreuther

Disaster Management in Southeast Asia, Asian Disaster preparedness Center (ADPC), by Ms. Lolita Bildan

Disaster Management Handbook for Bangladesh Volume (I-IV), by Mohammed Saidur Rahman

Disaster Risk Management Profile, Dhaka, Bangladesh, Bangladesh Disaster preparedness Centre (BDPC)

Disaster Reduction : Living in harmony with nature, by Julio Kuroiwa

Disaster Planning and Recovery : A guide for Facility Professionals, by Alan M. Levitt

Disaster Mitigation in Health Facilities-Wind Effects, by the Pan American Health Organization (PAHO/WHO)

Doing More for those Made Homeless, by Natural Disasters, by Roy Gilbert

Disaster risk reduction : a development concern, A scoping study on links between disaster risk reduction, poverty and development, by the United Kingdom's Department for International Development (DFID), Overseas Development Group, 2004

Drought, A Global Assessment Volume I and Volume II, by Donald A. Wilhite

Dictionary of Geography, Oxford University Press

Disaster Risk Reduction begins at school : 2006-2007 World Disaster Reduction Campaign, by the UN Inter-Agency Secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR), 2006

Emergencies Impact Review, by Bruce Bolt

Earthquakes, by Bruce Bolt

Earthquake Risk Reduction, by David J. Dowrick Willey, 2003

Early warning system, by the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) Ad. Hoc Panel: Committee on Science and Technology (CST)

Early Warning Systems for drought and desertification: Role of national Meteorological and Hydrological Services, by the World Meteorological Organization (WMO), 1999

Early warning system for drought Preparedness and Drought Management: Proceedings of a Expert Group Meeting Held September 5-7, 2000, in Lisbon, Portugal, by Donald A. Wilhite, M.V.K. Sivakumar and Deborah A. Wood

Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disasters, by Keith Smith Routledge, an imprint of Taylor & Francis Books Ltd. 2004

Earthquake Hazard and Seismic Risk, by Mikeal Melkumyan and Serguel Balassamian

Floods Volume I and II, by D. J. Parker

Guidebook On Advocacy Integrating CBDRM into government policy and programming, Asian Disaster preparedness Center (ADPC)

Grand Challenges for Disaster Reduction, National Science and technology Council, Committee on Environment and natural resources, A report of the Subcommittee on disaster Reduction, June 2005

Guidelines and Tools for Sustainability in Community Based Disaster Management, United Nations Centre for Regional Development (UNCRD)

Guidelines for emergency assessment, by the international Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), 2005

Gender and Natural Disasters: Working Paper I, by Elaine Enarson

Guideline for Risk Analysis: A Basis for Disaster Risk Management, by A. Kohler, S. Julich and L. Bloemertz

Grand Challenges for Disaster Reduction, by the US Subcommittee on Disaster Reduction (SDR), 2005

Geological Hazards: Their Assessment, Avoidance and Mitigation, by Fred Bell

Good Practice Review 9: Disaster Risk Reduction, Mitigation and Preparedness in development and emergency programming, by John Twigg; Humanitarian Practice Network

Handbook for estimating the socio-economic and environmental effects of disasters (volume 1,2,3 and 4), by the economic Commission for latin America and the Caribbean (ECLAC)

Incentives For Reducing Risk: A reflection of Key themes, issues and ideas on risk reduction raised at the 2006 Pro Vention Forum, by Mark Pelling

Integrated Flood Management, by the Associated Programme on Flood Management (APFM), 2004

Integrating disaster reduction into development: recommendations for policymakers, by Charlotte Benson and John Twigg

International Perspectives on Natural Disasters, Occurrence, Mitigation and Consequences, by Joseph P. Stoltman, John Lidstone and Lisa M. DeChano

Know Risk, United Nations 2005

Living with risk, A global review of disaster reduction initiatives 2004 version; volume 1, United Nation

Living with risk, A global review of disaster reduction initiatives, by the UN inter-Agency secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR), 2004

Living with risk, Turning the tide on disasters towards sustainable development: 2003 world Disaster Reduction Campaign, by the UN Inter-Agency Secretariat of the International Strategy for disaster Reduction (UNISDR), 2003

Learning lessons from disaster recovery: the case of Bangladesh, Disaster Risk Management Series, no.11, by Tony Beck

Managing Disaster Risk in Emerging Economics Disaster risk management series no. 2, by Alcira Kreimer and Margaret Arnold

Mapping Vulnerability: Disasters, Development and People, by Greg Bankoff, George Frerks and Dorothea Hilhorst

Mitigation of Natural Hazards and Disasters: International Perspectives, by C. mdad Haque

Mainstreaming disaster risk reduction: a tool for development organization, by Sarah La Trobe and Professor Ian Davis; Tearfund

Managing Crisis, Threats, Dilemmas, Opportunities, by Uriel Rosenthal, R. Arjen Boin and Louise K. Comfort

Natural hazards and disasters, Drawing on the international experiences from disaster reduction in developing countries, Report 16, January 2006, by Jan Sorensen; Trond Vedeld; Marit Haug

Natural Hazards and Disasters, by Donald W. Hyndman and David Hyndman

Natinal Sensitization Seminar on Response to Earthquake, Disaster Management Bureau (DMB); BDPC; OXFAM

Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis, by Maxx Dilley, Robert S.Chen, Uwe Deichmann, Arthur L.Lerner-Lam and Margaret Arnold

Natural Disasters Mitigation in Drinking Water and Sewerage Systems: Guidelines for Vulnerability Analysis, by the Pan American Health Organization (PAHO/WHO)

Natural Processes as Hazards and Disasters, by Robert Blodgett and Edward A. Keller

Preventing and Mitigating natural disasters, by the World Meteorological Organization (WMO)

Preventing and Mitigating natural disasters: Working together for a safer world, by the World Meteorological Organization (WMO)

Reduce Communities Vulnerability by Empowering Them to Cope with Floods and Possible Earthquake in Bangladesh, Mainstreaming Person With Disabilities, 02 April 2006, Handicap International

Reducing Disaster Risk, A challenge for Development: A Global Report, by the Bureau for Crisis Prevention and Recovery

Reducing the Risk of Disasters - Helping to Achieve Sustainable Poverty Reduction in a Vulnerable World: A DFID Policy paper, by the United Kingdom's Department for International Development (DFID), Overseas Development Group, 2006

Sustainable Community Based Disaster Management (CBDM) Practices in Asia A User's Guide, by Rajib Shaw and Kenji Okazaki

Sustainability in grass-Roots Initiatives, Focus on, Community Based Disaster Management, UNCRD

Surviving Disasters and Supporting Recovery: A guidebook for Microfinance Institutions, by Eileen Miamidian, Margaret Arnold, Kiendel Burritt and March Jacquand World Bank/UNCDF, 2005

Training Modules for Climate & Flood Forecast Applications in Agriculture, Asiam Disaster preparedness Center (ADPC)

The Bangladesh Integrated Nutrition Project Effectiveness and Lessons Bangladesh Development Series, Paper No. 8, Document of the World Bank.

Threats Challenges, Vulnerabilities and Risks in Environmental and Human Security, by Hans Gunter Brauch UNU institute for environmental and Human Security (UNU-EHS), 2005

Training Manuals, CDMP

Training Manuals, BDPC

Total Disaster Risk Management: Good Practices 2006 Supplement, by the Asian Disaster Reduction Center

Thirty years of Natural Disasters 1974-2003: The Numbers, by Debarati Guha-Sapir, David Hargitt and Philippe Hoyois

World Environment Day, 5 June 2006: Desert and Desertification, Don't Desert Drylands, by the United Nations Environment Programme (UNEP), 2006

What do you know about fire hazards?, by the UN Inter-Agency secretariat of the International Strategy for disaster Reduction (UN/ISDR) with the assistance of the Global Fire Monitoring Center, 2000

World Disasters Report 2005: Focus on information in disasters, by the International Federation of Red Cross and Red Crescent societies (IFRC)

WMO at a glance, by the world Meteorological Organization (WMO)

Waves, Tides and Shallow-Water Processes, by Evelyn Brown

Windstorm Impact Reduction Implementation Plan, by the National Science and Technology Council

WMO Statement on the Status of the Global Climate in 2005, by the world Meteorological Organization (WMO)

Banglapedia, by Asiatic Society of Bangladesh

Standing Order on Disaster, by DMB, MOFDM



সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি)

৯২-৯৩ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২

ফোন +৮৮০ ২ ৯৮৯০৯৩৭, ৮৮২১২৫৫, ৮৮২১৪৫৯

www.cdmp.org.bd

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd